ভারতের নৃত্যকলা

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

ভারতের নৃত্যকলা । গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন । ৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলি-৯

প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক
প্রসূন বসু
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রক
নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ বিচিত্রন ও স্কেচ
সুবোধ দাশগুপ্ত

বারো টাকা

ভূমিকা

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে নৃত্যকে একটি বিশেষ গৌরবের আসনে স্থাপন করা হয়েছে। তা কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন নয়, তা ভাবের বাহন, তা কেবল ভাবের বাহন নয়, তা একটি পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের মাধ্যম হিসাবেও ব্যবহার যোগ্য। নৃত্যের প্রয়োগ ক্ষেত্রের এই ব্যাপকতা সূচিত করতে ভরতনাট্যে তাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—নৃত্ত, নৃত্য ও অভিনয়। নৃত্তের প্রয়োগ ক্ষেত্র সবথেকে সীমাবদ্ধ, তা নানা অঙ্গভঙ্গির সুষম সমাবেশ মাত্র, তা কোনো ভাবের বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। যখন তা নৃত্যের পর্যায়ে পড়ে তখন তা ভাবের বাহন রূপে দেখা দেয়। একটি ছোট সঙ্গীত বা সঙ্গীতের পদ যে ভাবের আধার তাকে প্রকাশ দেবার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ যেন নৃত্যে গীতিকবিতা। তার ক্ষেত্র আরও ব্যাপক হয়ে যখন একটি সমগ্র কাহিনী বলবার ভার নেয় তখন তা অভিনয়। তখন তা একটি সমগ্র নাট্যের বাহন হয়।

নৃত্যশিল্পী যার অভিব্যক্তি দেন তা হল শিল্পকর্মের স্থানীয়। রূপকার হিসাবে তিনি অন্তরের অবস্থার চিত্র অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন। তিনি যা ফুটিয়ে তোলেন তা নির্জন স্থানে বা অরণ্যে করবার কোনো সার্থকতা নেই। তাকে সার্থক করতে দর্শক চাই। একজন সেই শিল্পকর্ম দেখে নন্দিত হবেন তবেই ত তা সম্পূর্ণতা পাবে। সুতরাং নৃত্যের দুটি বিভিন্ন দিক আছে। একদিকে নর্তক অপর দিকে দর্শক, এক দিকে শিল্পী অপর দিকে সমঝদার। শিল্পী যা দেন সমঝদার ও তা গ্রহণ করেন। নৃত্যকে তাই অভিনয় ও বলা হয়। অভিনয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই নির্দেশ করে। এখানে শিল্পী যা সৃষ্টি করেন তা দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। শিল্পী পৌঁছে দেন বলেই তা অভিনয় এবং দ্রষ্টা তাকে গ্রহণ করেন বলেই আমাদের দেশে নাটক দৃশ্যকাব্য। নৃত্যনাট্যে শিল্পী যা দর্শকের নিকট পৌঁছে দেন তার বাহন ততটা মুখের ভাষা নয় যতটা দেহের অঙ্গভঙ্গির ভাষা। তাই

এখানে শিল্পী ও সমঝদারের মধ্যে সংযোগ সূত্র ততখানি শ্রবনোন্দ্রিয় নয় যতখানি দর্শনেন্দ্রিয়।

নৃত্যে তথা সকল প্রকার অভিনয়ে শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের যে নিবিড় সংযোগ আছে তাকে সূচিত করতে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে দুটি পারিভাষিক কথার ব্যবহার করা হয়। তা হল 'ভাব' ও 'রস'। 'ভাব' ও 'রসের' পারস্পরিক সম্বন্ধ হৃদয়ংগম করতে হলে আমাদের প্রথম মনে রাখতে হবে যে অভিনয় হল সেই ধরণের রূপকর্ম, অনুকরণ হল যার প্রধান অঙ্গ। এখানে অভিনেতা সংলাপ, অঙ্গভঙ্গি এবং ঘটনার সংঘাতের মধ্য দিয়ে যার রূপ দেন তা হল মনের এক একটি বিশেষ অবস্থার। শিল্পী হিসাবে তিনি যা সৃষ্টি করেন তাকে বলা হয় 'ভাব'। মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা হল তার বিষয় বস্তু। মানুষ কখনো ভালবাসে, কখনো ক্রুদ্ধ হয়, কখনো ভয় পায়, কখনো শোকগ্রস্ত হয়। এদের দুটি দিক আছে। একটি মনের অবস্থা, অপরটি আচরণে, দেহভঙ্গিতে, কথায় তার প্রকাশ, একটি-অন্তরের দিক, অপরটি বাহিরের। বাক্যের সহিত অর্থের যে সম্বন্ধ এখানে আচরণের সহিত মনের অবস্থার সেই সম্পর্ক।

রূপকার হিসাবে নৃত্যশিল্পীর কাজ হল মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে বাহিরের আচরণের দ্বারা ফুটিয়ে তোলা। এরিস্টটল এই কারণেই প্রধানত অভিনয়কে অনুকরণ-ভিত্তিক বলেছেন। মনের অবস্থাটিকে আচরণে ফুটাতে নৃত্যশিল্পী প্রধানত নির্ভর করেন তাঁর বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির উপর। আনুষঙ্গিক হিসাবে তিনি সাহায্য নেন বচন ও যন্ত্র সঙ্গীতের। সাজসজ্জা ও ভূষণ ও তাঁকে সাহায্য করে। নৃত্যশিল্পের এই বিভিন্ন উপাদানকে সূচনা করতে তাদের যথাক্রমে আঙ্গিক, বাচিক এবং আভিচারিক উপাদান বলা হয়ে থাকে। একটি ক্রোধান্ধ ভাবের চিত্রণে শিল্পীর চোখ হয় বিস্ফারিত এবং রক্তাক্ত, গলার স্বর হয় উত্তেজনাপূর্ণ, অঙ্গ হয় কম্পমান, বেশ হয় বিস্রস্ত। এইভাবে নানা উপাদানকে জড়িয়ে যে সমগ্র চিত্রটি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তাকেই শাস্ত্রের পরিভাষায় 'ভাব' বলা হয়।

শিল্পীর অভিনয় দর্শন ক'রে দর্শক যা উপভোগ করেন তাই হল 'রস'। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আটটি 'ভাবের' সহিত আটটি 'রস' সংযুক্ত করা হয়েছে। যেমন রতি ভাবের সঙ্গে শৃঙ্গার রসের, শোক ভাবের সঙ্গে করুণ রসের, ক্রোধ ভাবের সঙ্গে রৌদ্ররসের ইত্যাদি। পরে উদ্ভট নামে আর এক শাস্ত্রকার আর

এক জোড়া ভাব ও রস সংযুক্ত ক'রে দিয়েছেন। ফলে আমরা মোট পাই নয়টি ভাব ও নয়টি রস। প্রত্যেকটি ভাবের সঙ্গে এক একটি বিশেষ রস সংযুক্ত থাকায় তাদের সম্বন্ধটি ঠিক রকম বুঝতে অসুবিধা হয়। মনে হয় যেন বিভিন্ন 'ভাব' সম্পর্কে দর্শকের মনে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক 'রসের' উপলব্ধি হয়। যখন ক্রোধ ভাবের অভিনয় হয় আমাদের মধ্যে ও ক্রোধ সংক্রামিত হয়ে আমরাও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। কিন্তু ঠিক তা নয়। 'ভাবের' আবেদন মনের বুদ্ধিবৃত্তির নিকট নয়, অনুভূতিবৃত্তির নিকট। ঠিক বলতে আবেদনটি আমাদের মনের মধ্যে যে সৌন্দর্যবোধ গ্রথিত আছে তার প্রতি। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। শিল্পী যখন শোকের ছবি আঁকেন তখন তিনি যা অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলেন তা হল শোকের 'ভাব'। নাট্যশাস্ত্র বলে তা দেখে দর্শকের মনে যে প্রতিঘাত ফুটে ওঠে তা হল করুণ রস। তার অর্থ এই নয় যে দর্শকের মনেও শোক সংক্রামিত হয়। তার অর্থ হল শিল্পীর চিত্রণকে দর্শক তাঁর সৌন্দর্যবোধ বৃত্তি দিয়ে উপভোগ করেন। করুণার ছবি তাঁর কাছে প্রকট হয় এবং দর্শকের মনে অবশ্য শিল্পী বিভিন্ন 'ভাবের' রূপ দিয়ে বিভিন্ন 'রস' পরিস্ফুট করেন, কিন্তু পরিণতিতে সকল ক্ষেত্রেই ফল এক। দর্শকের সৌন্দর্যবোধ সাড়া দিয়ে বলে, আমি নন্দিত হলাম।

আমি একটি বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল প্রজাপতি দেখি, আমার সৌন্দর্যবোধ উল্লসিত হয়ে বলে ওঠে, সুন্দর। যখন চাঁপা ফুলের গন্ধ বায়ু সঞ্চালিত হয়ে আমার নাকে যায়, আমি তার সুগন্ধ পাই, এবং আমার মন বলে ওঠে, সুন্দর। আমি কালবৈশাখীর ঝড়ের উন্মাদনার তাণ্ডব দেখি। মাথায় তার কালো মেঘের উষ্ণীষ। তাতে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে। ঝড়ের অশ্ব তার বাহন। পথে যা পায় সব ভেঙেচুরে দিয়ে, ধূলায় চোখ অন্ধকার করে দিয়ে তারা ছুটে চলে। তা দেখেও আমি বলি সুন্দর। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের ইন্দ্রিয় বিভিন্ন সুন্দর বস্তুর সংবাদ আমাদের মনকে এনে দেয়। রূপ তাদের বিভিন্ন। আমাদের মনের মধ্যে যে সৌন্দর্যবোধ তা যে রস পায় তা বিভিন্ন, কিন্তু তাতে সাড়া দেয় সর্বক্ষেত্রেই একইভাবে। সর্বক্ষেত্রেই তা নন্দিত হয়।

আমাদের দেশের নাট্যশাস্ত্র এইভাবে একটি গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। তাই তা কঠিন এবং দীর্ঘ সাধনার বস্তু। শুধু তাই নয়, তার আঙ্গিক উপাদানটিকেও 'ভাবের' উপযুক্ত বাহন করবার জন্য

বিশেষভাবে পরিবর্ধিত করা হয়েছে। তার 'চারি' আছে, 'করণ' আছে, 'হস্তমুদ্রা' আছে। বিভিন্ন অঙ্গের সহিত মিলিত হয়ে এক পায়ের ভঙ্গি হল 'চারি'। দুই পায়ের মিলিত ভঙ্গি হল 'করণ'। এক বা দুই হস্তের বিভিন্ন সংকেতে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের যে রীতি তাই হল 'মুদ্রা'। ভাল নৃত্যশিল্পী হতে হলে কত বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি যে আয়ত্ত করতে হয় তা ভাবা যায় না। সুতরাং একনিষ্ঠ সাধনা ও অভ্যাস ভিন্ন ভারতীয় নৃত্যশিল্প আয়ত্ত করা যায় না।

এই কারণে বাংলা ভাষায় ভারতীয় নৃত্য শিল্প সম্বন্ধে একটি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শ্রীমতী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নৃত্যশিল্প শিক্ষার্থীর সে অভাব মোচন হতে চলেছে দেখে আনন্দিত হয়েছি। আনন্দিত হবার আর একটি বিশেষ কারণ হল তিনি রবীন্দ্র ভারতীতেই শিক্ষার্থী হয়ে এখানকার অধ্যাপকদের নিকট এই কঠিন শিল্পটি আয়ত্ত করেছেন।

বর্তমান গ্রন্থখানির আলোচনার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক। নৃত্যশিল্পের ইতিহাস, প্রয়োগ রীতি ও উপাদান ত স্থান পেয়েছেই। সেই সঙ্গে সকল ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যগুলি আলোচিত হয়েছে। বর্তমান কালের নূতন নৃত্য রীতিও বাদ পড়েনি। দক্ষিণের ভরতনাট্যম, কথাকলি, উত্তরের কথক, পূর্ব প্রান্তের মণিপুরী নৃত্য যেমন গৌরবের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তেমন তুলনায় কম প্রচলিত দক্ষিণের মোহিনী আট্যম বা উৎকল দেশের ওড়িষী নৃত্য বাদ পড়ে নি। একটি সমগ্র অধ্যায় জুড়ে লোক নৃত্যের ও আলোচনা আছে। রবীন্দ্র নাথের নৃত্যনাট্য এবং উদয়শঙ্কর প্রচারিত নৃত্য ও যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্য সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন মুদ্রা সম্বন্ধে ধারণাকে সুস্পষ্ট করবার জন্য প্রচুর আর্টপ্লেট ও রেখাচিত্র গ্রন্থখানিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। গ্রন্থকারের রচনা সরল ও স্বচ্ছ। বিভিন্ন পারিভাষিক কথার ব্যাখ্যার প্রয়োজন মত বিভিন্ন নাট্যশাস্ত্র হতে প্রামাণ্য বচন সংগ্রহ ক'রে যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে। এইসব কারণে আমার মনে হয় গ্রন্থখানি শিক্ষার্থীদের বিশেষ কাজে লাগবে। যিনি ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে তার পরিচয় লাভ করতে চাইবেন তিনিও এই গ্রন্থের মধ্যে প্রথম পরিচয়ের জন্য একটি সামগ্রিক আলোচনা পাবেন।

এক্ষেত্রে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ও প্রয়োগশিল্প পরিচয় পুস্তক হিসাবে বিশেষ সমাদর লাভ করবে। নবীন গ্রন্থকারের এই আয়াসসাধ্য প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্র ভারতী
১লা বৈশাখ, ১৩৭১।

প্রস্তুতি প্রসঙ্গ

"Dance is the mother of all arts. Music and poetry exist in time; painting and architecture in space. But the dance lives at once in time and space. The creator and the thing created, the artist and the work are still one and the same thing. Rhythmical patterns of movement, the plastic sense of space, the vivid representation of a world seen and imagined-these things man creates in his own body in the dance before he uses substance and stone and word to give expression to his inner experience."

(Mr. Curt Sachs in his "World History of Dance.")

সকল শিল্পকলার জননী, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা বিশ্ব-সংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। নৃত্যলোকে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে; দেহভঙ্গির বিচিত্র সঙ্গীতে ছন্দিত হয় সিন্ধুতরঙ্গের হিল্লোল; গ্রীবা-বিভঙ্গে মূর্ত হয় লীলাবিলাস, গর্ব ও আত্মনিবেদন; আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত হয় প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয়; ললিতছন্দে শরীরী হয়ে ওঠে চিত্রকলা ও স্থাপত্যের সচল সুষমব্যঞ্জনা। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত একটি অনন্য রূপভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধিত করে। এতগুলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে শরীরী করে তুলে দর্শক মনে আস্বাদ্য করার ক্ষমতা অন্য কোন শিল্পধারায় বিরল। "ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি তদেব রূপং রমণীয়তায়া" :—অনন্তকাল ধরে নব নব তরঙ্গে বিশ্বব্যাপী এই ছন্দোলীলা অমৃতসঞ্চার করে মানবমনকে সংস্কৃত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের নৃত্যকলা সম্পর্কে কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। শ্রদ্ধেয়া প্রতিমা দেবী রচিত 'নৃত্য' ও আরো দু'একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার অস্তিত্ব উপেক্ষা না করেও বলা যায় নৃত্যকলার পূর্ণাঙ্গ আলোচনারূপে 'ভারতের নৃত্য-কলা' বংলা সাহিত্যে প্রথম প্রয়াস।

নৃত্যকলার শিক্ষার্থীরূপে ও গীতবিতান, কমলা গার্লস স্কুল, রাগিনী প্রভৃতি শিক্ষায়তনে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর বাংলা ভাষায় নৃত্যকলা সম্পর্কে একটি গ্রন্থের অভাব আমাকে অহরহ পীড়িত করতে থাকে। এই বোধ থেকেই গত তিনবৎসর ধরে এই গ্রন্থরচনার প্রস্তুতিপর্বের সূচনা। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও পাঠকসমাজের ঔৎসুক্যের সীমার দিকে দৃষ্টি রেখে, ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক আলোচনার মাধ্যমে নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তররূপের একটি সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফূট করার প্রয়াস করেছি। অবশ্য এই গ্রন্থের অপূর্ণতা সম্পর্কেও আমি সম্পূর্ণ সচেতন। নৃত্যছন্দ প্রকরণ ও বিভিন্ন আঙ্গিকের ব্যবহারিক প্রয়োগ প্রসঙ্গে আরো বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। কিন্তু একটিমাত্র গ্রন্থের মধ্যে ভারতের নৃত্যকলার একটি সামগ্রিক পরিচিতি দিতে চেয়েছি, সেজন্য বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়কে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিসরে আবদ্ধ রাখতে হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ পাঠকসমাজে সমাদৃত হলে ভবিষ্যতে শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা সম্পর্কে কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের আশা রাখি।

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে জাতির সংস্কার, আচার, সমাজজীবন ও শিল্প-সংস্কৃতির পারস্পরিক সাহচর্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বর্তমান গ্রন্থে নৃত্য-কলার বিকাশ ও বিস্তৃতি আলোচিত হয়েছে। অপার ও অনন্ত নৃত্যশাস্ত্রের সব তত্ত্বগুলি একটিমাত্র গ্রন্থের পরিসরে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব নয়। তবে মূল তত্ত্বগুলি বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থের মূল শ্লোক ও ব্যাখ্যাসহ আলোচিত হয়েছে। সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করে গ্রন্থটিকে পূর্ণাঙ্গ করার ঐকান্তিক চেষ্টা করেছি, অনভিজ্ঞতার জন্য কিছু ত্রুটি থাকাও সম্ভব। লেখিকার প্রথম প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে পাঠকসমাজ ও সমালোচকগণ ত্রুটিগুলিকে ক্ষমার চক্ষে দেখবেন—এ ভরসা আমার আছে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পরে বাংলা দেশের যে নবজাগৃতি কাল—সেই উনবিংশ শতকে যখন বিভিন্ন সামাজিক প্রগতি সূচিত হল ; নাট্য-শালা ও নাটকের পথ উন্মুক্ত হল, তখনও নৃত্যকলা রইল অবহেলিত। পরবর্তী-কালে রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রয়াসে শিক্ষিত সমাজে নৃত্যকলার স্বীকৃতি সূচিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এদেশে নৃত্যচর্চা গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে। ভারতের নৃত্যকলার ইতিহাসে ধর্মের প্রভাব ও রক্ষণশীলতা যতখানি দুর্মরতা দেখিয়েছে তা অন্য শিল্পধারায় বিরল। শিল্পী ও আচার্যেরা

বিভিন্ন আঙ্গিকে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন একথা সত্য ; কিন্তু ইতিহাসের ধারা, নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তররূপের বিশ্লেষণ বা এর নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নি। এজন্য বিংশশতাব্দীর এই দশকেও বিদগ্ধ সমাজের একটি বৃহৎ অংশ সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রায় নৃত্যকলার পুরোযায়ী ভূমিকার স্বীকৃতি দিতে দোলাচল চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেন। সাম্প্রতিক কালে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে নৃত্যকে যুক্ত করে বুদ্ধিবৃত্তির ভাষার সাথে হৃদয়বৃত্তির ভাষাকেও সম্মানের বিশিষ্ট আসন দেওয়া হয়েছে। নৃত্যকলার বুদ্ধিগত চর্চার এই শুভসূচনায় আমার এই গ্রন্থ শিক্ষার্থীদের পথ সুগম করুক, এবং নৃত্যশিল্পী ও বিদগ্ধসমাজের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করুক—এই আমার ঐকান্তিক কামনা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি আচার্যদের যাঁদের কাজে আমি শিক্ষালাভ করেছি। প্রথমেই স্বীকৃতি জানাই আমার শিল্পীজীবনের প্রেরণা ও প্রথম গুরু শ্রীঅসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর নিরলস প্রয়াস ও উৎসাহেই আমি শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁর সংকলিত বহু তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। গুরু টি. কে. মরুথাপ্পা পিল্লাই, গুরু নদীয়া সিং, কৃষ্ণাণ নাম্বূদ্রি, কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন, এন. কে. শিবশঙ্করণ প্রভৃতি আচার্যদের প্রণতি জানাই।

স্মরণ করি নৃত্যলোকের অনন্য প্রতিভা শ্রীউদয়শঙ্করকে। উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের শিল্পীরূপে তাঁর শিক্ষণ ও প্রয়োগপদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি। আমার শিল্পীজীবনের উৎকর্ষ ও অভিজ্ঞতার এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমি মনে করি।

এই গ্রন্থের প্রস্তুতি পরিকল্পনায় অনেকের সাহায্য পেয়েছি। প্রথমেই মনে পড়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের নাম। তাঁর স্নেহ, আন্তরিকতা ও নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছি। শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমার পরিকল্পনা শুনে আমাকে উৎসাহ ও উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত অসংখ্য তথ্য এই বইয়ে অসঙ্কোচে ব্যবহার করেছি। আমার এই গ্রন্থের জন্য কয়েকটি মূল্যবান ছবির ব্লকও তিনি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের স্নেহেও আমি ধন্য। লোকসংস্কৃতি ও লোকনৃত্য

সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা আমার আলোচনার পথ সুগম করেছে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও আশীর্বাদ আমাকে উৎসাহিত করেছে। তিনি এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। শ্রীকালীনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় বিভিন্ন সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্পর্কে উপদেশ ও নির্দেশদানে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সঙ্গীতাচার্য শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার, প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী লক্ষ্মীশঙ্কর, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীকেলুনায়ার,শ্রীমতী কনক বিশ্বাস, শ্রীনীহারবিন্দু সেন, শ্রীনেপাল নাগ,—এঁদের শুভেচ্ছা ও প্রেরণার কথাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

কবি মনীন্দ্র রায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর উৎসাহ না পেলে এই গ্রন্থরচনায় হয়তো সাহসী হতাম না। তিনি 'অমৃত' পত্রিকায় নৃত্যকলা সম্পর্কে আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে লেখিকার আত্মবিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে "The Illustrated weekly of India" পত্রিকার সম্পাদক শ্রী এ.এস, রমণ ও 'কালান্তর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মণিপুরে অবস্থানকালে গুরু আমুবি সিং, গুরু আতম্বা সিং, গুরু বিপিন সিং ও শ্রীহরিচরণ সিং মণিপুরী নৃত্য সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করে আমায় সাহায্য করেছেন। তাঁদেরও আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীবিরজু মহারাজ, কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি ও শ্রীমতী থাঙ্কমণি কুট্টি এই গ্রন্থের জন্য ছবি তুলে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত নৃত্যছন্দের ছবি এই গ্রন্থে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য ও শ্রীঅসীমকুমার ঘোষের শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার কথা স্মরণ করি।

ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস, ডাঃ অরুণ সেন, শ্রীমতী ভক্তি বিশ্বাস, শ্রীমতী

আভা গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দু মজুমদার, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা মজুমদার, অরবিন্দ বসু, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, হীরেন্দ্রলাল কুণ্ডু, অনন্ত দাস, মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী—এদের শুভেচ্ছা ও উৎসাহ প্রীতিমুগ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

আমার মাষ্টারমহাশয় রতন চট্টোপাধ্যায়ের অদম্য উৎসাহ ও অবিরাম তাড়না আমার শিক্ষার্থী জীবনে গতির সঞ্চার করেছে। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

প্রণাম জানাই আমার মা শ্রীমতী স্বর্ণলতা চট্টোপাধ্যায় ও দিদি শ্রীমতী কণক মুখোপাধ্যায়কে। সাংসারিক জীবনে আমার দায়িত্ব হাসিমুখে বহন করে তাঁরা আমার শিল্পচর্চার পথ সুগম করেছেন।

প্রকাশক প্রসূন বসু বাংলা সাহিত্যে নৃত্যকলা সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশ করে শুধুমাত্র লেখিকার নয়, নৃত্যশিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিব্রতী পাঠকসমাজের ও কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্ত বিশেষ যত্নসহকারে এই গ্রন্থের বিভিন্ন রেখাচিত্র ও প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন। তাঁকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। পরিশেষে স্মরণ করি শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে। শিল্পকলা ও সমাজে শিল্পীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর কাছে পাঠ গ্রহণ করেই আমার শিল্পীমানস জীবনবোধে সম্বদ্ধ হয়েছে। তাঁর প্রেরণা ও নিরলস সহায়তা না পেলে এই গ্রন্থরচনা আমার পক্ষে সম্ভবপর হতনা। বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তিনি আমায় সংগ্রহ করে দিয়েছেন। পাণ্ডুলিপির রচনাশৈলীর প্রয়োজনীয় পরিমার্জনা করে দিয়েছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সমাপ্তিতে সব গ্রন্থকারের যা বক্তব্য আমারও তাই—এই গ্রন্থ সহৃদয় পাঠক সমাজের প্রীতিলাভ করলে আমার প্রয়াস ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

৪৯ পঞ্চাননতলা লেন।
কলকাতা-৩৩
১লা বৈশাখ ১৩৭৯

গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়

শিল্পীজীবনের প্রেরণা
প্রথম নৃত্যগুরু
রবীন্দ্রনৃত্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকল্পক
রূপকার
প্রিয়তম সাথী
অসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়কে

BHARATER NRITYAKALA
BY GAYATRI CHATTERJEE

। সূচীপত্র ।

১

ইতিহাসের ছন্দ ও নৃত্যধারা

ভারতের নৃত্যকলা বিশ্বসংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা, উৎকর্ষে, রূপ পরিকল্পনায় ও ভাবরসের ঐশ্বর্যে বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও দর্শনের স্বভাব-সুন্দর পরম অভিব্যক্তি।

সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল এবং যুগে যুগে তার রূপান্তর ঘটে। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের যেমন ইতিহাস আছে, তেমনই সংস্কৃতি ও দর্শনেরও ইতিহাস আছে। নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তর-রূপও বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন স্তরে, সংস্কারের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়েছে। যেহেতু মানব-সংস্কৃতি প্রাচীন সংস্কৃতির শুধুমাত্র অনুবর্তন নয় রূপান্তরও বটে, সেজন্য ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে, নৃত্যকলার ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভবপর নয়। আদিমকাল থেকে প্রাগৈতিহাসিক, বৈদিক, ক্লাসিকাল, মধ্য ও বর্তমান—ইতিহাসের এই সব স্তরই মানব প্রগতির অভিযাত্রায় ঐতিহাসিক কারণেই প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রত্যেকটি স্তরের ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে সতর্ক ভাবে, কারণ এই সকল স্তরেই শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার চলমান অভিযাত্রায় নৃত্যকলার রূপান্তর

ঘটেছে। জাতির ইতিহাস, তার সংস্কার, আচার, সমাজ-জীবন ও শিল্প-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। তাই এই সবগুলিরই পারম্পরিক সাহচর্যের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই নৃত্যকলার ইতিহাস বিচার করতে হবে। সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রার বিভিন্ন ক্রান্তি-কালে সংঘাতগুলিকে লক্ষ্য করতে হবে যা সংস্কৃতিকে এগিয়ে দিয়েছে; তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ঃ "মানুষের ইতিহাসটাই এই রকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।"

সংস্কৃতিকে যদি সভ্যতার নির্যাসরূপে কল্পনা করা যায় তাহলে এই সংস্কৃতির চতুরঙ্গ হচ্ছে সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলা-নৃত্যকলা। এর মধ্যে আবার প্রাচীনতম ধারা নৃত্য। বিশ্বপ্রকৃতির চাঞ্চল্যে যে সৌন্দর্য-নৃত্য—তারই অনুকরণে পশুপক্ষী ও মানুষের দেহে এল নৃত্য; তাই ভাষা, সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠার আগেই নৃত্য হল মানুষের আবেগ প্রকাশের প্রাচীনতম বাহন। মানুষের সেই প্রকৃতির অনুকরণের নৃত্যের ছন্দোবদ্ধ মূর্তি চিত্রকর ও ভাস্করের মনে আনলো সৃষ্টির আকাঙ্খা—পরে ভাষার আবিস্কারে ঝঙ্কৃত হল কবির নির্মানক্ষম প্রজ্ঞা—এল কাব্য। সভ্যতা হল উজ্জ্বল। কারণ রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ "যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণমূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা প্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।"

সংস্কৃতি স্থাবর নয়, গতিশীলতা তার ধর্ম। সংস্কৃতির ধর্মই হচ্ছে গ্রহণ করা ও বর্জন করা, আর এই গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়েই তার অভিযাত্রা। সংস্কৃতির রূপান্তর ও পরিবর্তনে ইতিহাসের ভূমিকা

যেমন প্রধান, তেমনি ভৌগলিক অবস্থান ও পরিবেশও মানুষের সংস্কৃতি রচনায় অন্যতম সহযোগী। মানুষের আসল পরিচয়ই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, পুরান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম এবং সামাজিক আচার আচরণ সবই সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এই সংস্কৃতির উৎস ও মূল প্রেরণা, প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম ও তাকে আয়ত্ত করার মধ্য দিয়েই সূচিত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই ও দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন গড়ে উঠেছে। মানুষ তার প্রাথমিক শক্তি পেয়েছে প্রকৃতির কাছে আবার সেই ক্ষমতাকে সে প্রয়োগ করেছে প্রকৃতিকে জয় করার জন্য। পরিবর্তিত হয়েছে শুধু বহিঃপ্রকৃতিই নয় অন্তঃপ্রকৃতিও। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই শ্রমের বন্ধনের মধ্যেই মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আদিমযুগের মানুষের সংস্কৃতি ও নৃত্যকলার মূল্যায়ন করতে গেলে, প্রথমেই সে-যুগের মানুষের চেতনা, জীবনযাত্রার উপকরণ ও সামাজিক রূপকে বুঝতে হবে। আদিম মানুষ বাঁচতো তার সমগ্র সত্তায়। তার কাছে তখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য শ্রম ও সুকুমার কলার কোন প্রভেদ ছিল না। আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপই ছিল নৃত্য। নৃত্য ছিল তাদের জীবনযাত্রা ও জীবিকা প্রণালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আদিম নৃত্য রচিত হয়েছে জীবিকা প্রচেষ্টার সহায়ক হিসাবে এবং এর ফলে তাদের জীবিকা প্রয়াসও সবল ও সমৃদ্ধ হয়েছে। এইভাবে জীবিকার জন্য বিভিন্ন উপাদানের-সৃষ্টি ও মানস-সৃষ্টি একই খাতে পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক হিসাবে প্রেরণা দিয়েছে। তখন এই আত্মপ্রকাশের সামগ্রিক রূপ হিসাবে নৃত্য ছিল স্বতস্ফূর্ত, বলিষ্ঠ ও উৎপ্লাবনপূর্ণ। প্রাণীজগত থেকে এর ভঙ্গী অনুসরণ করা হত। অপদেবতাকে তুষ্ট করতে, মড়ক নিবারণে, বৃষ্টি আবাহনে, রোগ নিরাময়ে, শিকারে যাবার উন্মাদনা জাগাতে, নৃত্য ছিল আদিম মানুষের গোষ্ঠীজীবনের প্রধান

উপকরণ। ভারত সরকার প্রকাশিত 'The Dance in India' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : "For Them Dance is more than an expression of physical or emotional exulburance, something more than a form of entertainment. They dance their religion. On the accurate and proper performance of the dance depend their success in chase and victory in war, firtility in woman and yield from the land, pacification of the elements and elimination of pestilence, protection from evil and fruition of love. Dance is the creator, preserver, steward and guardian."

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আদিম মানুষের নৃত্য, গীত ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য দেখা যায়। একই ধাঁচের বিশ্বাস, প্রথা, সংস্কার ও রীতিনীতির প্রচলন ছিল। তার কারণ এই যে প্রত্যেক দেশের মানব সমাজই আদিম কালে সভ্যতা বিকাশের একই স্তরগুলির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এমন কি এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যে সব জনসমষ্টি অনুন্নত স্তরে পড়ে রয়েছে তাদের মধ্যেও আদিম মনের এই ধারা লক্ষ্য করা যায়।

আদিম যুগে মানুষের জীবনে, চিন্তায় ও কর্মে যাদু (magic) ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের প্রাধান্য ছিল। তারা মানুষের একাধিক আত্মায় বিশ্বাস করত এবং মৃত্যুর পরে সেই আত্মা অপদেবতারূপে গাছে, পাহাড়ে বা অন্য জীবজন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এই ধারণা প্রবল ছিল। প্রাচীনকালের মানুষ, অজ্ঞতা, ভয় ও বিস্ময় থেকে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতা, অপদেবতা মনে করত। এবং তাদের তুষ্ট করার জন্যই এইসব প্রাচীন কৌশল যাদু ও মন্ত্র তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করত। জীবনধারণের প্রয়োজনে নিজের চাহিদা অনুযায়ী মানুষ নাচে-গানে, নানা অনুকৃতিমূলক মাধ্যম গ্রহণ করে অভীষ্ট ফল লাভ করতে চাইত। এই অনুকৃতি-

মূলক প্রক্রিয়া ও যাদুর নিয়ম নীতি ও সংযমের মধ্য দিয়েই, সে-যুগের মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উৎকর্ষতা ও পরিপূর্ণতা আসতো ও তারা জীবনযুদ্ধে অধিকতর কুশলী ও বিচক্ষণ হয়ে উঠতো। এই যাদুকে আশ্রয় করেই জীবনচর্চার অন্যতম অঙ্গরূপে নৃত্যকলা গড়ে ওঠে। অতিপ্রাকৃত শক্তি, অপদেবতা তাড়ানো, অসুখ সারানো প্রভৃতির জন্য নৃত্যগীতের মাধ্যমে আদিম মানুষ তাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করত। নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীতে, ভয়ে, ভক্তিতে আদিম মানুষ যাদু ও অতি-প্রাকৃতের গূঢ় শক্তিকে বন্দনা করেছে।

এই প্রসঙ্গে জর্জ টমসন বলেছেন: "A magical act is one in which savages strive to impose their will on their environment by mimicking the natural process that they desire to bring about. If they want rain, they perform a dance in which they imitate the gathering clouds, the clap of thunder, the falling shower." একথা অনস্বীকার্য যে আজকের উন্নত সংস্কৃতির বিকাশের মূল উৎস হচ্ছে ঐ প্রাচীন অসংস্কৃত নৃত্য-পদ্ধতি। সেই সময়েই তার মধ্যে শিল্প-বোধের লক্ষণ সুপ্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে সিনাইডার বলেছেন: "Nevertheless, even in the oldest cultures we find the preconditions of art ; the mastery and more or less conscious shaping of the medium of expression. Where the singer, who is at the sametime dancing, tries to achieve a certain regularity of his movements, his singing takes on regular musical forms."

আদিম যুগের নৃত্যকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সামাজিক ও ভৌতিক বা ধর্মমূলক। সামাজিক নৃত্যের মধ্যে জন্ম, বিবাহ-উৎসব, যুদ্ধ, সংস্কার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের নৃত্য এবং ভৌতিক বা অন্যান্য ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের মধ্যে দেবতা-অপদেবতা পূজা,

সম্মোহন, শিকার, শস্য উৎপাদন, বৃষ্টি আমন্ত্রণ, রোগ নিরাময়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মৃত আত্মার আবাহন প্রভৃতি প্রধান। চামড়ার বাজনার সঙ্গে করতালি দিয়ে, মাথা ও অঙ্গ চালনা করে তারা নাচতো। ভাব-ভঙ্গীতে বন্য পশুদের অনুকরণ করা হ'ত। সে যুগের অনুন্নত আদিম নৃত্য প্রসঙ্গে হাম্বলি বলেছেন :

"Dances were also performed for sex-attraction, selection of bride or bridegroom, along with songs, which were mostly sung gutterally at first, and then in much higher key. Their dances were mostly in imitation of the movements of the wild animals, and songs were reproduced in imitation of the notes of the brids and animals." বর্তমানেও বিন্ধ্য হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী ও উপজাতিদের নৃত্য-গীতের মধ্যে এই আদিম অনুন্নত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

আদিম মানুষ ছিল প্রকৃতির অন্ধ অঙ্গ। তার নিম্নতম স্তর পশু অবস্থা সে অতিক্রম করল সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে। সভ্যতার অগ্রগতির সূচনা হ'ল সেদিন, যেদিন মানুষ হাতিয়ার তৈরী করতে শিখল—এল তার শিকার জীবন। তখন মানুষের শিল্পকলার বস্তু ছিল শিকার। এরপর এল কৃষি ও পশুপালন পদ্ধতি এবং তার পর থেকে উন্নততর সভ্যতার জয়যাত্রা। আদিমকালের নৃত্যই, বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতি সম্পদে সমৃদ্ধ হল।

সিন্ধু সভ্যতার আবিস্কারে, হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় ভারতের সুপ্রাচীন কালের সংস্কৃতির লুপ্ত অধ্যায় আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। কিছু বিতর্ক থাকলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাল সম্পর্কে অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করেন যে মোটামুটিভাবে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার থেকে

খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বছরের মধ্যে ঐ সময় নির্দিষ্ট করা যায় ভৌগলিক সীমার দিক থেকে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের এই সমগ্র অঞ্চলকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বালুচি-স্তানের উষর পার্বত্য প্রদেশ ও অপর ভাগে সিন্ধুনদ বিধৌত পাঞ্জাব-সিন্ধুর সমতল ভূমি। হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর ধ্বংসস্তুপ থেকে তৎকালীন ভারতের সমৃদ্ধ নগর-জীবন ও পৌর-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নানা প্রকার অলংকৃত পাত্র, সীলমোহর, বিভিন্ন মুর্তি, পোড়া ইটের ঘরবাড়ী, কূপ, স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী, বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি তখনকার উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন পৌর জীবনযাত্রার নিদর্শন। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা কোন বিশেষ জাতির সৃষ্টি নয়; বিভিন্ন জাতির অবদানে সমৃদ্ধ। সিন্ধু সভ্যতাই ভারত সংস্কৃতির প্রাচীনতম রূপ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন অঙ্কিত পাত্রে ও চিত্রিত অনুষ্ঠানে হিন্দু দেবদেবী ও সামাজিক অনুষ্ঠানের উৎস পাওয়া যায়।

হরপ্পা ও মোহেন-জো-দড়োর ভগ্নাবশেষ থেকে সে যুগের সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নানা উপকরণ পাওয়া গিয়েছে। এগুলি থেকে তৎকালীন সমাজের নৃত্যের রূপ পাওয়া যায়। কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে ডঃ লক্ষণস্বরূপ বলেছেন ঃ

One seal has presented a dancing scene. One man is beating a drum and others are dancing to the tune. On one seal from Harappa, a man is playing on a drum before a tiger. On another a woman is dancing. In one case, a male figure has a drum hung round his neck." এই উপকরণগুলি থেকে তৎকালীন সময়ে গীত ও বাদ্য সহযোগে নৃত্যের অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ "A short sketch of Indian dance" প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

"In the pre-historic cities a broze dancing girl was

excavated by Roy Bahadur Dayaram Sahani, and its exhumation has proved that culture of dancing was prevalent even in that remote past, in all its artistic display and grace. Some ingrediants of music like crude type of lute (Veena), pipe (Venu), and drum(Mridanga) were also excavated, that speaks of culture of music in that pre-historic time." এই নারী মূর্তির সাজসজ্জা ও কেশবিন্যাস বালুচিস্তানের অধিবাসীদের অনুরূপ। আবিস্কৃত আর একটি প্রস্তর মূর্তিতে, শিব-নটরাজ মূর্তির সাদৃশ্য প্রথম দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন: "There are two remarkable statuettes found at Harappa, * * * and the other of drak gray slate, the figure of a male dancer, standing on his right leg, with the left leg raised high, the ancestor of Siva-Nataraja."

সিন্ধু উপত্যকার এই সব আবিস্কার নিঃসন্দেহে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নৃত্যকলার প্রসারের কথা প্রমাণ করে এবং এইসব উপাদানের মধ্যেই পরবর্তীকালের রূপসমৃদ্ধির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পরিতাপের বিষয় এই যে, নৃত্যের ইতিহাস রচনার বহু উপাদান এখনও দেশের বিভিন্ন প্রত্নতাত্বিক সংগ্রহ-কেন্দ্র ও লুপ্তপ্রায় পুঁথিপত্রের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, যা নিয়ে প্রকৃত গবেষণা এখনো আরম্ভ হয়নি।

মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পায় যে উন্নত সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় রূপের নিদর্শন। সিন্ধু সভ্যতায় আর্য্যদের অবদান ছিল কি-না, তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে বৈদিক-যুগের নৃত্যকলা নিঃসন্দেহে সিন্ধু সভ্যতার ধারাতেই সমৃদ্ধতর হয়েছে। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনে এবং আর্য ও আর্যপূর্ব সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগেই নৃত্যকলা

মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়েছে। মোটামুটি ভাবে খৃষ্টপূর্ব তিনহাজার থেকে খৃষ্টপূর্ব ছয়শত বছর পর্য্যন্ত সময়কেই বৈদিক-যুগের কাল হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

বৈদিক-যুগে দর্শন ও ধর্মের অনুশীলনের প্রাধান্য দেখে অনেকে মনে করেন, সে যুগে নৃত্য, গীত প্রভৃতি শিল্পকলার বিশেষ সমাদর ছিল না। কিন্তু এই ধারনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নৃত্য, গীত, বাদ্য আর্যরা অনার্যদের কাছ থেকে পেয়েছেন এবং তার অনুশীলনও করেছেন। শুষ্ক আধ্যাত্মবাদ প্রচারই বৈদিক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। শিল্পকলা ও জীবন-দর্শন সম্পর্কে সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "সেই সঙ্গে এই কথাও দেখবার আছে, সেদিনকার ভারতবর্ষের বাণী শুষ্কতা প্রচার করেনি। মানুষের ভিতরকার ঐশ্বর্যকে সকল দিকে উদ্বোধিত করেছিল—স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রে সঙ্গীতে সাহিত্যে। তারই চিহ্ন মরুভূমে অরণ্যে পর্বতে দ্বীপে দ্বীপান্তরে, দুর্গম স্থানে, দুঃসাধ্য কল্পনায়। সন্ন্যাসীর যে মন্ত্র মানুষকে রিক্ত করে, নগ্ন করে, মানুষের যৌবনকে পঙ্গু করে, মানবচিত্তবৃত্তিকে নানা দিকে খর্ব করে, এ সে মন্ত্র নয়। এ জরাজীর্ণ কৃশপ্রাণ বৃদ্ধের বাণী নয়। এর মধ্যে পরিপূর্ণপ্রাণ বীর্যবান যৌবনের প্রভাব।" বৈদিক সংস্কৃতিতে আভ্যুদয়িক ও আভিচারিক প্রয়োগ অনুযায়ী নৃত্যগীতি অনুষ্ঠিত হত। ঋক্ সংহিতায় "পপৃক্ষেণ্যমিন্দ্রত্বেহ্যোজোনৃন্নানিচন্বতমানো অমর্তঃ" প্রভৃতি বিভিন্ন শ্লোকে নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন সূত্র ও ভাষ্য থেকে সামগানেও নৃত্যের অংশের কথা জানা যায়। অথর্ব বেদে "কো বাণম্ কো নৃত্যো দধৌ" এই উদ্ধৃতি বীণা সহযোগে নৃত্যের কথা প্রমাণ করে। সামসংহিতা, শুক্লযজুর্বেদ, কৃষ্ণযজুর্বেদ প্রভৃতিতেও নৃত্য-গীত-বাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। শুক্লযজুর্বেদ ভাষ্যে আচার্য সায়ন গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের কথা উল্লেখ করেছেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সাথে সঙ্গীত ও নৃত্যকলার নিবিড় সম্পর্ক। সংস্কৃতির বিকাশ ও ক্রমোন্নতির অভিযাত্রায়

বৈদিক যুগকে শিল্প, সৌন্দর্য ও দর্শনের সুমহান যুগ বলা যায়।

ভারতীয় শিল্প ও ললিতকলার সমৃদ্ধিতে সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদ সাহিত্যের অবদান অসামান্য। ইহলোকের জন্য সংস্কৃতি সাধনা ও অনন্তলোকের জন্য ধর্মসাধনা—এই উভয় সাধনার সমন্বয়ে মহাতপস্যার কাল বৈদিক-যুগ। শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন: "শিল্প সম্বন্ধেও ঐতরেয়ের বাণীগুলি অপূর্ব। ঐতরেয় বলেন, শিল্পীরা তাদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করেছেন। সৃষ্টিতে যে দেব-শিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প, তাই বুঝতে হবে। যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন, তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্পসাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে, শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলেন।" শিল্প সম্পর্কে সে যুগের চিন্তা কত মহৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই অংশ থেকে তা জানতে পারা যায়। জীবন-দর্শন সম্পর্কে সুস্থ, স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই বৈদিক-যুগে শিল্পের পরমতত্ত্ব সংস্কৃতিলোককে আলোকিত করেছে।

ক্ষিতিমোহন সেন 'ভারতের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন: "মহর্ষি ঐতরেয় ছিলেন আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির একটি অপরূপ ও মহনীয় সমন্বয়। ঐতরেয় বলেন, অনার্যেরা পৃথিবীর সন্তান। ইতরা তাই মাতা পৃথিবীকে স্মরণ করেছিলেন। আর্য-অনার্য মিলনে তাই যে সব বিদ্যার সম্ভাবনা হল, তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ যে যোগ আছে, তা এই চৌষট্টি কলার তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।"

চৌষট্টি কলার তালিকা:—১) নৃত্য, ২) গীত, ৩) বাদ্য, ৪) উদক বাদ্য, ৫) নাট্য, ৬) সাজসজ্জা ও কুরূপকে সুরূপ করার বিদ্যা বা কৌচুমার যোগ, ৭) নেপথ্য বা বেশরচনা, ৮) বিশেষক ছেদ্য বা তিলকাদি রচনা, ৯) দশন-বসন-রঞ্জন, ১০) কেশে পুষ্পবিন্যাস, ১১) কেশ বিন্যাস, ১২) পুষ্পাস্তরণ, ১৩) মাল্য

রচনার বিদ্যা, ১৪) গন্ধযুক্তি, সুগন্ধপ্রস্তুত বিদ্যা, ১৫) আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, ১৬) প্রতিকৃতি নির্মাণ, ১৭) যুদ্ধবিজয় বিদ্যা, ১৮) বৃক্ষায়ুর্বেদ, ১৯) নানাবিধ পাকবিদ্যা, ২০) পানীয় রচনা, ২১) তক্ষণ বা ছুতরের বিদ্যা, ২২) চরকা কাটা, ২৩) বেত ও তৃণদির দ্বারা ডালা কুলো প্রভৃতি রচনা, ২৪) শয্যা রচনা, ২৫) সূচীকর্ম, ২৬) খেলনা রচনা, ২৭) ভূষণ অর্থাৎ অলঙ্কার রচনা, ২৮) কর্ণপত্র, কর্ণালঙ্কার প্রস্তুতবিধি, ২৯) তণ্ডুল কুসুমাদি দ্বারা নৈবেদ্য রচনা, ৩০) সম্পাট্য অর্থাৎ হীরা-মণি-রত্নাদি কাটা, ৩১) মণিরত্ন বসানো, ৩২) বাস্তুবিদ্যা, ৩৩) মণিরত্নজ্ঞান, ৩৪) ধাতুরত্নাদি বিচার, ৩৫) খনিবিদ্যা, ৩৬) ধাতুবিদ্যা, ৩৭) ইন্দ্রজাল, ৩৮) বস্ত্রগোপন, ৩৯) হস্তলাঘব, ৪০) চিত্রযোগ, ৪১) সূত্রক্রিয়া, পুতুল নাচ, ৪২) পশুপক্ষী লড়ানো, ৪৩) পাখী পড়ানো, ৪৪) দ্যূতবিদ্যা, ৪৫) আকর্ষণ ক্রীড়া, ৪৬) অভিধান বিদ্যা, ৪৭) বৈনয়কী বিদ্যা, ৪৮) দেশ ভাষাজ্ঞান, ৪৯) কাব্যসমস্যা পূরণ, ৫০) ম্লেচ্ছিতক বিকল্প, ম্লেচ্ছ ভাষাজ্ঞান, ৫১) অক্ষর মুষ্টিকা, অঙ্গুলি দ্বারা অক্ষর রচনা, ৫২) উত্তমরূপে পড়িবার বিদ্যা, ৫৩) নাটকা-খ্যানাদি দর্শন, ৫৪) মানসী কাব্য-ক্রিয়া, ৫৫) প্রহেলিকা, (৫৬) যন্ত্রমাতৃকা, ৫৭) উদকঘাত, ৫৮) উৎসাদন, ৫৯) দুর্বাচক যোগ, ৬০) পুষ্পশকটিকা, নিমিত্ত জ্ঞান, ৬১) ধারণ-মাতৃকা, ৬২) ক্রিয়া-বিকল্প, ৬৩) ছলিতক যোগ, ৬৪) বেতালিকী বিদ্যা।

উপরোক্ত তালিকা থেকে শিল্পকলা সম্পর্কে বৈদিকযুগে বাস্তব-বোধ ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল বলেই পরবর্তীকালে নাট্যশাস্ত্রকে পঞ্চম বেদ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি, কয়েক শত ও সহস্র বৎসরের সাধনা ও অনুশীলনে গড়ে উঠেছে। নৃত্য, গীত, সাহিত্য, শিল্পকলা ও দর্শনের চরম উৎকর্ষের লক্ষণ এই যুগেই স্পষ্ট হয়েছে। হ্যাভেল বলেছেন: "The Vedic period is all important for the

historian, because, except for a very brief period of its history, the Vedic impulse is behind all Indian art."

বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডগুলিকে কেন্দ্র করে ভারতের সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ললিতকলা, কাব্য-সৌন্দর্য অযুতধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এই যজ্ঞকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে নৃত্যগীতেরও ভূমিকা ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছেঃ "তে হ যথৈবেদং বহিস্পবমানেন স্তোষ্যমানাঃ সংরব্ধাঃ সর্পন্তি, ইত্যেবমাসস্পুঃ তে হ সমুপবিশ্য হিং চক্রুঃ।" অর্থাৎ আরব্ধ যজ্ঞকর্মে বহিস্পবমান স্তবের দ্বারা স্তুতি করতে উদ্যত উদ্‌গাত্রীরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে মণ্ডলাকারে যজ্ঞবেদী প্রদক্ষিণ করতেন। গানের সঙ্গে সমবেত নৃত্যের এটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেনঃ "আবার কর্মফলের বর্ণনা প্রসঙ্গে নৃত্য ও গীতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা ছান্দোগ্যের অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ অথ যদি গীতবাদিত্রলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য গীতবাদিত্রে সমুত্তিষ্ঠতস্তেন গীতবাদিত্রলোকেন সংপন্নো মহীয়তে,—অর্থাৎ সাধক যদি গীত ও বাদ্যরূপ লোক (world) কামনা করেন তবে তাঁর সংকল্পমাত্রেই গীত ও বাদ্য নিকটে উপস্থিত হয়। তিনি সেই গীত ও বাদ্য উপভোগ করে সমৃদ্ধ ও জগতে পূজিত হন এবং নিজেরও মাহাত্ম্য অনুভব করেন। এখানে গন্ধর্বলোকেরও কল্পনা করা হয়েছে। পুরাণে এ ধারণা আরও প্রবল, কিন্তু ছান্দোগ্যের মত প্রাচীন উপনিষদে লোকের কল্পনা স্থান পেয়েছে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি লোকের মতো, উপনিষদে গন্ধর্বলোকের বর্ণনা পাওয়া যায় এবং মানুষ গীতবাদ্যের অনুরাগী হলে মৃত্যুর পর গীতবাদিত্রলোকে অর্থাৎ গন্ধর্বলোকে গমন করে।" কঠ উপনিষদে যম-নচিকেতা সংবাদে নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ উপনিষদের যুগে নৃত্যগীতের প্রসার ও অনুশীলনের কথা প্রমাণ করে। বাদ্যের সাথে তাল রেখে যে সামগেরা গান করতেন এবং পুরনারীরা করতালি দিয়ে যজ্ঞবেদী পরিক্রমণ করে নৃত্য করতেন

এর বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে "অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরি বা,"—অর্থাৎ ঊষা নর্তকীর মত রূপ প্রকাশ করছে, এই নর্তকী শব্দ থেকে নৃত্যকলার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক সিলভঁ্যা লেভি এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে বলেছেন: "Moreover the Rigveda (1.92.4.) already knows maidens who decked in splendid raiment, dance and attract lovers and the Atharvaveda (XII.1.41) tells how men dance and sing to music." শস্যোৎপাদন ও বৃষ্টি আমন্ত্রণের জন্য মহাব্রত উৎসবে এবং বিবাহ উৎসবে বাদ্যের সাথে পুরনারীরা যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণ করে নৃত্য করতেন। অধ্যাপক কিথ বলেছেন: "Thus at the Mahavrata, maidens dance round the fire as a spell to bring down rain for the crops and to secure the prosperity of the herds. Before the marriage ceremony is completed (Shankhyayana-grihyasutra, 1.II.5), there is dance of matrons whose husbands are still alive, * * * and dancers are present who dance to the sound of the lute and flute, dance music and song fill the whole day of moving." অনেকে বলেন সামগানের যুগে গানের সাথে নৃত্য ও বাদ্যের সমাবেশ ছিল না, কাজেই সামগানকে সঙ্গীত (নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়) আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। এছাড়াও বিবাহ উৎসব, সীমান্তোন্নয়ন উৎসব, যজ্ঞসমাপ্তিতে অবভৃথস্নান উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য অনুষ্ঠিত হত।

বৈদিক যুগেই সামগানের হস্ত ও অঙ্গুলিসঙ্কেত থেকে মুদ্রার প্রচলন হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে, উপাসনায়, মাঙ্গলিক আচরণের অপরিহার্য অঙ্গরূপে, করণ অনুসারে মুদ্রার প্রয়োগ করা হত। অবশ্য উপাসনা মুদ্রা ও নর্তনমুদ্রার মধ্যে ব্যবহারিক রূপভেদ আছে, কিন্তু মূলে কোন প্রভেদ নাই। বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ও অধ্যাত্মভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য

আছে বলে মুদ্রাগুলি সেইযুগেই সাধনার রস ও ভাবের অভিব্যক্তির বাহনরূপে সমাদৃত হয়েছিল।

বৈদিক যুগের শেষভাগে গোষ্ঠীবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধির সাথে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বিকাশ লাভ করল। পাঞ্চাল দেশ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ অব্দে অবন্তি, বৎস, কোশল, মগধ প্রভৃতি রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পরের শিল্পকলা, নৃত্যগীতের কথা বৌদ্ধজাতক ও কাহিনী-সাহিত্যে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, যদিও শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি বৈদিক সংস্কৃতি নিয়েই সীমাবদ্ধ তবুও তাদের অধিকাংশই বৌদ্ধযুগের প্রভাবে পরিবর্ধিত হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনী রচিত অষ্টাধ্যায়ীতে "পারাশর্য-শিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটস্‌ত্রয়োঃ" প্রভৃতি সূত্র থেকে তৎকালীন সমাজে নৃত্যগীতের সমাদরের প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে নৃত্য ও নর্তকীর উল্লেখ এবং অবাধ অনুশীলনের কথা আছে। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকে দক্ষিণ ভারতের "শিলপ্পদিকারম্" গ্রন্থে নৃত্যকলার আলোচনা পাওয়া যায়। "শিলপ্পদিকারম" একটি সুপ্রাচীন তামিল নাট্যগ্রন্থ,—রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল।

নন্দরাজাদের পূর্বে শিশুনাগবংশীয় বিম্বিসার ও অজাতশত্রু প্রভৃতির রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ৫৪৪ থেকে ৫৬৪ অব্দ পর্যন্ত নৃত্যকলার অনুশীলন ও বিকাশের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। গান্ধার ও পুরুষপুরের (পেশোয়ার) অধিবাসীদের কলানৈপুণ্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও মিলনের যোগসূত্র গ্রথিত হল। গ্রীক ঐতিহাসিকদের তথ্য থেকে জানা যায় অজাতশত্রুর রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ ভারতের বাহিরেও সম্প্রসারিত হয়। চম্পা, রাজগৃহ, বৈশালী, পাটলিপুত্র, কোশল, কৌশাম্বী প্রভৃতি

অঞ্চলে শিল্পচর্চার বিশেষ সমাদর ছিল। অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও নৃত্যগীতের অবাধ অনুশীলনের সুযোগ ছিল। রাজদরবারের সহানুভূতি ও অর্থব্যয়ে ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধির জন্য নাট্যমন্দির ও নৃত্যগৃহ পরিচালিত হত। শাস্ত্রীয় নৃত্যকলায় নিপুনা দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব ৬০০-৫০০ শতকে ভগবান ব্রহ্মা তথা ব্রহ্মা-ভরত আদি নাট্যবেদ প্রণয়ন করেন। ভরতমুনি রচিত নাট্যশাস্ত্রের কাল নির্ণীত হয়েছে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে। ভরভমুনি অবশ্য তাঁর নাট্য-শাস্ত্রকে সংগ্রহ বলে স্বীকার করেছেন। তিনি প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছেন ঃ নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্" অর্থাৎ ব্রহ্মা রচিত নাট্যশাস্ত্র আলোচনাকে অনুসরণ করেই ভরত পঞ্চমবেদরূপ নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন।

"ব্রহ্মা-ভরতম্" এর পরে "সদাশিব-ভরতম' নামে আর একটি প্রাচীন নাট্যগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক ভাষ্যকার সদাশিবকেই আদি ভরত বলে থাকেন। ব্রহ্মা-ভরত, সদাশিব। ভরত ও অন্যান্য আচার্যদের যথার্থ সময় ও অস্তিত্ব নিয়ে প্রচুর মতানৈক্য আছে। এই সব গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হওয়ায় যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি। সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের ভাষ্যকারদের তথ্যের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে।

ক্লাসিকাল যুগের সূচনা থেকে নৃত্যকলার বিকাশের ধারা বেগবতী হতে দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাদি মহাকাব্যের কালকে মোটামুটি ভাবে খৃষ্টপূর্ব ৪০০-২০০ অব্দের মধ্যে গণ্য করা হয়। সন তারিখের ক্রমিকতা রক্ষা করে ইতিহাস রচনার প্রথা সে সময় ছিল না, কিন্তু এই মহাকাব্যগুলির কথা ও কাহিনীর মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রায় ঐতিহাসিক চিত্র পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে কোনটি বেশী প্রাচীন তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

ঋষি বাল্মিকী নৃত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ।

*   *   *   *   *

উপনৃত্যস্তং ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥"

এখানে ভরত প্রসঙ্গে সম্ভবত আদি ভরতের কথাই বলা হয়েছে। ঋষি ভরদ্বাজ ও নাট্য ও নৃত্যশাস্ত্রের রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু তার গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নি। ভরত নাট্যশাস্ত্রের আচার্য তালিকায় অন্যান্য ঋষিদের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

"আত্রেয়োহথ বশিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্য পুলহঃ ক্রতুঃ।
অঙ্গিরা গৌতমোহগস্ত্যো মনুরায়ুস্তথাত্নবান্॥
বিশ্বামিত্রঃ স্থূলশিরাঃ সংবর্তঃ প্রতিমর্দনঃ।
উশনা বৃহস্পতির্বৎসশ্চ্যবনঃ কাশ্যপো ধ্রুবঃ॥
দুর্বাসা জমদগ্নিশ্চ মার্কণ্ডেয়োথ গালবঃ।
ভরদ্বাজোহথ রৈভ্যশ্চ বাল্মীকি ভর্গবাংস্তথা॥"

এই তালিকা থেকে রামায়ণ মহাভারতের যুগে নাট্য ও নৃত্যকলার উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার রামচন্দ্র আয়োজিত অশ্বমেধযজ্ঞে অন্যান্য গুণীদের সঙ্গে নৃত্যগীতবিশারদদেরও আমন্ত্রণের কথাও উত্তরকাণ্ডে আছে।

"চিত্রজ্ঞানং বৃত্তসূত্রজ্ঞান্ গীতনৃত্যবিশারদান্।
এতান্ সর্বান্ সমানীয় গাতারৌ সমবেশয়ৎ॥"

এমন কি নৃপতি নির্বাচনে রাজকীয় গুণের মধ্যে সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তিকে বিশেষ গুণ হিসাবে গণ্য করা হত। রাজা দশরথের মৃত্যুর পর যখন অমাত্য ও পারিষদরা ঋষি বশিষ্ঠকে একজন প্রজাবৎসল নৃপতি নির্বাচনের জন্য অনুরোধ জানান, সেই প্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে উল্লেখ আছে ঃ

"নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনটনর্তকাঃ।
উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ॥"
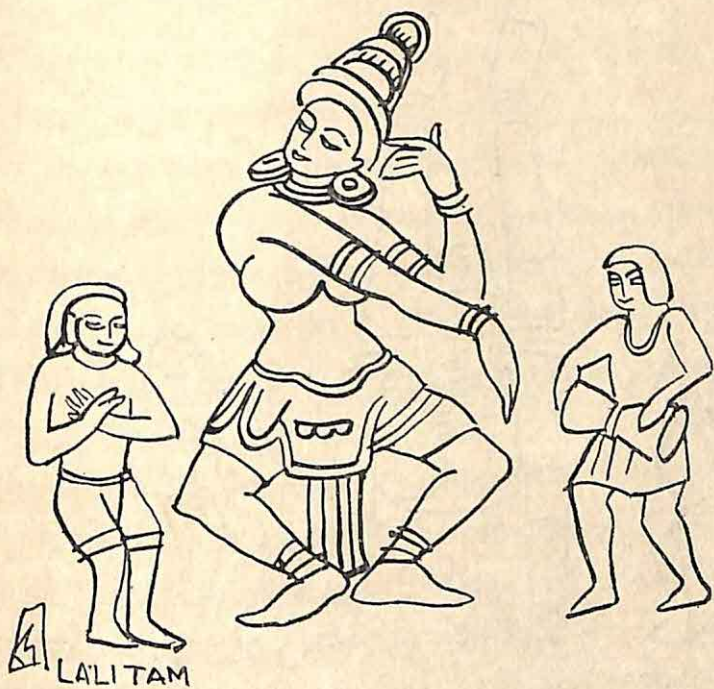
ললিতকরণম্
(নাট্যশাস্ত্র)

শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সৌজন্যে
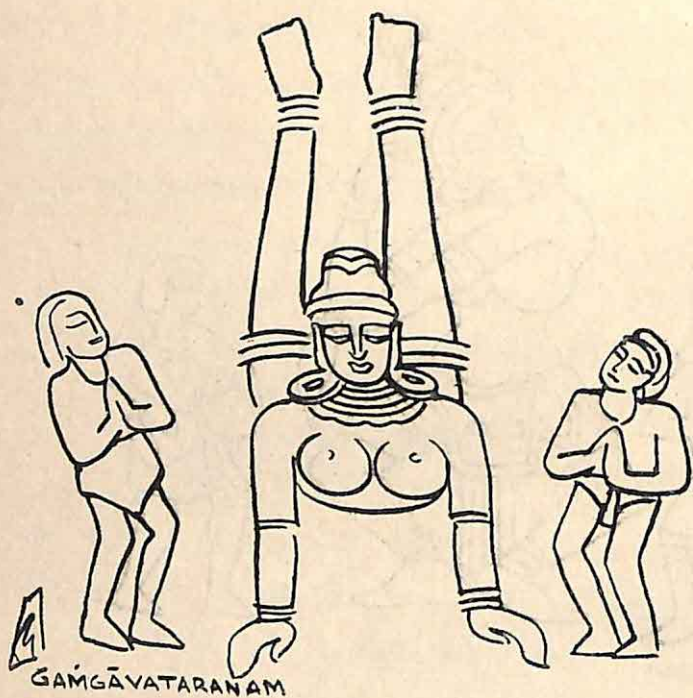
গঙ্গাবতরণম্
(নাট্যশাস্ত্র)

শিল্পী : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সৌজন্যে

মহাভারতেরও সভাপর্বে উল্লেখ আছে ঃ

"নৃত্যবাদিত্রগীতৈশ্চ ভাবৈশ্চ বিবিধৈরপি।
রময়ন্তি মহাত্মানং দেবরাজং শতক্রতুম্॥"

তখন যে নৃত্যগীতিবাদ্যচর্চাহীন কোন সমৃদ্ধিশালী রাজ্য গণ্য হত না এবং নৃত্যকলার তৎকালীন সমাজে শ্রদ্ধা ও সমাদরের আসন ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

নৃত্যের কথা বহুবার বহু প্রসঙ্গে মহাভারতে পাওয়া গেলেও তার বিশেষ রূপ, পদ্ধতি বা শ্রেণীবিভাগ এর বিষয় কিছু জানা যায় না। অবশ্য "নৃত্তগীতং চ হাস্যং লাস্যং" এই উদ্ধৃতি থেকে নৃত্যের উপাদানের কিছু অনুমান করা যেতে পারে। বিভিন্ন কাহিনী অংশে ও চরিত্রে নৃত্যকলার উল্লেখ আছে। কচ ও দেবযানী উভয়েই নৃত্যগীতে কুশলী ছিলেন। যমুনা তীরে খাণ্ডববনে পরিজন ও পুরনারীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নৃত্যগীতের কথা পাওয়া যায়। অর্জ্জুন যখন অমরাবতীতে যান তখন তার অভ্যর্থনায় উর্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদের নৃত্যের বর্ণনা আছে। এই অমরাবতীতে অবস্থানের সময়েই অর্জ্জুন বিশ্ববসুর পুত্র চিত্রসেন এর কাছে নৃত্যগীতবাদ্য শিক্ষা গ্রহণ করেন।
বিরাট রাজপ্রাসাদে বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন নৃত্যগীত শিক্ষা দিতেন।

"স তত্র রাজানমমিত্রহাহবব্রীদ্।
বৃহন্নলাহহং নরদেব নর্ত্তকী॥"

এমন কি মহাকাব্যের যুগে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এবং অন্তপুরিকাদেরও নৃত্যগীতের অবাধ অনুশীলনের অধিকার ছিল।

হরিবংশের সময়েও হল্লীসক নৃত্য ও ছালিক্য নৃত্যক্রীড়ার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গঙ্গাবতরণ নৃত্যনাট্যের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ A short sketch of Indian Dance প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "It has been mentioned in the Harivansa that the wives of Bhaimas used to sing and

dance with gestures and postures, to please Krishna. The Hallisaka dance was also practised during the time of Harivansa, and the Commentator Nilakantha has said that Hallisaka was a kind of dance, in which many women dancers took part : ("হল্লীসকং বহুভিঃ স্ত্রীভিঃ সহনৃত্যম্"). This type of dance was also known as a sportive play, and this dance was in later time known as the Rasa Nritya, which woman dancers dance in circle, in accompaniment with songs and musical instruments. The dance, "Gangavatarana" was also prevalent during periods of the great epics. Nilkantha has said that the "Gangavatarana" was also known as the dance-drama". স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : "হরিবংশকার বলেছেন ছালিক্যগান ছিল যাদবদের অতীব প্রিয়। বিষ্ণুপর্বের ৮৮-৮৯ অধ্যায় দুটিতে উল্লেখ আছে : মহারাজ উগ্রসেন বসুদেবকে রাজ্যভার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবদের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করেন। রেবতী, সত্যভামা প্রভৃতি ছাড়া ষোলশো রমনী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য যাদবগণ তাঁদের পত্নীদেরও সঙ্গে নিয়েছিলেন। অপ্সরা প্রভৃতি নর্তকীরাও সঙ্গে ছিল। তীর্থে জলক্রীড়ার অবসরে বিভিন্ন নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছিল। অপ্সরারা জলদর্দ্দুরের তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিল। তাদের মনোমুগ্ধকর বেশভূষায় সকলেই আনন্দিত হয়েছিলেন। বলদেব রেবতীর সঙ্গে আনন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করছিলেন। সত্যভামাও নৃত্যগীতে যোগ দিয়েছিলেন। অর্জ্জুন সমুদ্রযাত্রার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে সুভদ্রার সঙ্গে নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। নারদও সেই আনন্দোৎসবের মধ্যে ছিলেন। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলকে ছালিক্যগীত গান করার জন্য আদেশ

করেছিলেন। সঙ্গে ছিল মৃদঙ্গাদি বাদ্য। অপ্সরারা নৃত্য-গীত-বাদ্যে যোগদান করেছিল। আসারিত নৃত্য হবার পর নর্তকী রম্ভা নৃত্য নৈপুণ্যে সমাগত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অভিনয়ের যে অনুষ্ঠান হয় তাতে চারুদর্শনা ও বিশালনেত্রা উর্বশী, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি যোগদান করেছিল। নারদ বীনাযোগে ছটি গ্রামরাগ আলাপ করেছিলেন ও সে গ্রামরাগের মূর্ছনা-মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ ও সকলে বিমোহিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে হল্লীসক নৃত্য করেছিলেন।" এই বর্ণনা থেকে প্রথম আমরা নৃত্যের রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাই।

হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে হল্লীসক নত্য প্রসঙ্গে আছে ঃ

"তাস্তু পঙ্‌ক্তীকৃতাঃ সর্বাঃ রময়ন্তি মনোরমম্।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বয়ো গোপকণ্যকাঃ।
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্য কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণা॥"

স্ত্রী পুরুষের এটি সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান। অভিনবগুপ্তের মতে মণ্ডলীকৃত নৃত্যই হল্লীসক নৃত্যঃ "মণ্ডলেন তু যৎ নৃত্যং হল্লীসকমিতি স্মৃতম্"।

আসারিত নৃত্য হচ্ছে অভিনয়ের সহযোগী নৃত্যক্রিয়াপদ্ধতি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আসরিত নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণনা পাওয়া যায়।

"কৃত্বা কুতপবিন্যাসং যথাবদ্দ্বিজসত্তমাঃ॥
আসারিতঃ প্রয়োগস্তু ততঃ কার্য্যঃ প্রযোক্তৃভি।
তত্র চোপোহনং কৃত্বা তন্ত্রীভাণ্ডসমন্বিতম্॥
কার্যঃ প্রবেশো নর্তক্যা ভাণ্ডবাদ্যসমন্বিতঃ।
বিশুদ্ধকরণায়াং তু জাত্যাং বাদ্যং প্রযোজয়েৎ॥
গীত্যা বাদ্যানুসর্পিণ্যা ততশ্চারীং প্রযোজয়েৎ।
বৈশাখস্তালকেনেহ সর্বরেচকচারিণী॥
পুষ্পাঞ্জলিধরা ভূত্বা প্রবিশেদ্রঙ্গমণ্ডপম্।
পুষ্পাঞ্জলিং বিসৃজ্যাথ রঙ্গপীঠং পরীত্য চ॥

প্রণম্য দেবতাভ্যস্ত ততোঽভিনয়মাচরেৎ।
তত্রাভিনেয়গীতং স্যাৎ তত্র বাদ্যং ন যোজয়েৎ॥
অঙ্গহারপ্রয়োগে তু ভাণ্ডবাদ্যং প্রযোজয়েৎ।
সমং রক্তং বিভক্তং চ স্ফুটং শুদ্ধপ্রহারজম্॥"

আসর সজ্জা ও বাদ্যযন্ত্র সমাবেশের পরে নর্তকী সঙ্গীত সহযোগে ভাণ্ডবাদ্যের তালে নৃত্য প্রদর্শন করত। শুদ্ধ চারী, করণ ও অঙ্গহারের প্রয়োগে এই নৃত্যক্রিয়ায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে চিত্রতাণ্ডব বলা হয়েছে। এই বর্ণনা স্বভাবতই নৃত্যকলার দীর্ঘকালের শিক্ষাও সাধনার পরিচায়ক। হরিবংশে ভাবাভিনয়ের উপযোগী উপাদানগুলিরও সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে।

গঙ্গাবতরণ প্রথম নৃত্যনাট্য। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ দানবরাজ বজ্রনাভকে বধ করার জন্য প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও অন্যান্য ভৈমদেব নাট্য-সম্প্রদায় রূপে পাঠান। ভদ্র ছিলেন এই সম্প্রদায়ের প্রধান নট। এরা বজ্রপুরে দৈত্যরাজসভায় গঙ্গাবতরণ অভিনয় করেন এবং এই অভিনয়ে অসুররাজ ও অন্যান্য সকলে মুগ্ধ হন ও উপহার প্রদান করেন। হরিবংশে এই প্রসঙ্গে বর্ণনায় নৃত্যকলার উৎকর্ষের চিত্র পাওয়া যায়। হরিবংশে উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ অভিনয়কে প্রথম প্রযোজিত নৃত্যনাট্য বলা যায়।

মহাকাব্যের যুগে নট ও নটীদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হত। অবশ্য এদের শ্রেণীবিভাগ ছিল। রাজদরবারে তাঁদের সম্মান ও অসম্মান লাভের কথা পাওয়া যায়। অন্ত্যজ নট নটীদেরও উল্লেখ আছে। আবার অভিজাত নট সম্প্রদায়ের কথাও পাওয়া যায়। একথা অনস্বীকার্য যে মহাকাব্যের যুগে তৎকালীন সমাজে নৃত্যগীতের বিশেষ সমাদর ও উৎকর্ষ ছিল।

মৌর্যযুগে ভারতের সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার মত নৃত্যকলাও বিশেষ উন্নত ও সংস্কৃত হয়। এই সময় গ্রীস ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে

বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার ফলে বহির্জগতেও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসারলাভ করে। চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, প্রিয়দর্শী অশোক প্রভৃতির রাজত্বকালে ভাস্কর্যে, ধর্ম্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতাভিনয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকমালায় সঙ্গীত ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। মহাযান ও হীনযান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল।

নৃত্যজাতকে হংসরাজকন্যার কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে হংসরাজকন্যা রত্নোজ্জলগ্রীব সুন্দর পুচ্ছ ময়ূরকে পতিরূপে নির্বাচন করলেও তার নৃত্য অসম ও ছন্দোহীন হওয়ার জন্য সে রাজকন্যার বরমাল্য লাভ করতে পারে নি। এই উপাখ্যানটি বারহুত স্তুপে খোদিত আছে। এছাড়া ভেরীবাদক জাতক, শঙ্খ জাতক, কাকবতী জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।

মহর্ষি বাৎস্যয়ণ রচিত "কামসূত্র" গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৃত্যকলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। নাগরিক জীবনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে নৃত্য-গীত সন্দর্শন ও অংশগ্রহণ অভিজাত সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্ত করণীয় কর্তব্য বলে গণ্য হত। কুশীলবদের সরস্বতী মন্দিরে নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। বাৎস্যায়ণ অভিনয়কে 'প্রেক্ষণক' বলেছেন। বাৎস্যয়ণ চৌষট্টিকলার উল্লেখ করেছেন তার মধ্যেও নৃত্য ও নাট্য অন্যতম। শুধুমাত্র পুরুষ নয় কুমারী ও বিবাহিতা নারীদের মধ্যেও নৃত্যগীতের অবাধ অনুশীলনের প্রচলন ছিল।

গুপ্তযুগও ভারত সংস্কৃতির প্রসারের যুগ। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত নৃত্যগীতের একজন কৃতবিদ্য শিল্পীরূপে পরিচিত। সমুদ্রগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নাট্যমঞ্চ নির্মিত হয় এবং অধিবাসীদের মধ্যে নৃত্যগীতিচর্চার বিশেষ প্রসার হয়। শক ও কুষাণরাও চারুকলার অনুশীলনে উৎসাহী ছিলেন। মহারাজ

বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের নট নটীদের নর্ত্তনমূর্তি, বিভিন্ন তাম্রফলক ও প্রতিকৃতি, সঙ্গীতশালা, নাট্যগৃহ, নবরত্নসভা সেযুগের সংস্কৃতিচর্চার পরিচয় বহন করে।

এই যুগে রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণে নৃত্যকলা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য ও চিত্র পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের স্বর্গের নৃত্যশিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নৃত্যকলায় অধিকার ও শিল্পীর গুণাবলীর কথা নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ধিত হয়েছে।

"যুষ্মাকমিহ সর্বাসাং রূপৌদার্যগুণাধিকম্।
আত্মানং মন্যতে যা তু সা নৃত্যতু মমাগ্রতঃ॥
গুণরূপবিহীনায়াঃ সিদ্ধির্ণাট্যস্য নাস্তি বৈ।
চার্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্‌বিড়ম্বনম্॥"

রূপগুণসম্পন্না উদার প্রকৃতির নারীই নৃত্যশিল্পীরূপে সিদ্ধিলাভ করতে সক্ষম। সুষম, সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত নৃত্যই নৃত্যরূপে গণ্য হতে পারে, অন্যথা তা বিড়ম্বনা মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণে নৃত্য প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

"বিশ্বাচী চ ঘৃতাচী চ উর্বশ্যথ তিলোত্তমা।
মেনকা সহজন্যা চ রম্ভাশ্চাপ্সরসাং বরাঃ॥
ননৃতুর্জগতামীশে লিখ্যমানে বিভাবসৌ।
হাবভাববিলাসাঢ্যান্ কুর্বন্তোহভিনয়ান বহুন॥"

বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা মুদ্রা, অঙ্গহার ও ভাব এর যথাযোগ্য প্রয়োগ সহ নৃত্যগীতের মাধ্যমে অভিনয় করত। রাজসভায় ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নৃত্যগীতের প্রচলন ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণ সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য প্রদান করে।

কথা ও কাহিনী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ বিষ্ণুশর্মা রচিত "পঞ্চতন্ত্র" এ তৎকালীন সমাজের নৃত্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাসের বিভিন্ন রচনায় নৃত্যগীতের বর্ণনা ও নানা তথ্য

পাওয়া যায়। কালিদাসের অভ্যুদয় কাল নিয়ে বহু মতবিতর্ক আছে। খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতানৈক্য আছে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে গীতি, গান, গান্ধর্ব, নৃত্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গুপ্তযুগে কালিদাসের আবির্ভাব। সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তরাজগণ শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন। 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে মহাকবির শৈবধর্মানুরাগের পরিচয় অনুমান করা যায়।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করেছেন : "কালিদাস গলিতক অভিনয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। নন্দ্যাবর্ত, চতুরস্র, খুরক প্রভৃতি নৃত্যেরও তিনি নামোল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীতরত্নাকরে নন্দ্যাবর্ত, চতুরস্র প্রভৃতি নৃত্যের পরিচয় দিয়েছেন। এগুলি এক-পার্শ্বগত নৃত্যশ্রেণীর অন্তর্গত। নন্দ্যাবর্তের উল্লেখ করে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

অস্যৈব চেচ্চরণয়োরন্তরং স্যাৎষড়ঙ্গুলম্।
বিতস্তিমাত্রমথবা নন্দ্যাবর্তং তদোদিতম্॥

নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে উভয় চরণের স্থিতি ছ আঙ্গুলের ব্যবধানে থাকে। শার্ঙ্গদেব নন্দ্যাবর্তের সঙ্গে চতুরস্র নৃত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। শার্ঙ্গদেব চতুরস্রের পরিচয় দিয়েছেন,

নন্দ্যাবর্তস্য চেদঙ্ঘ্রে গর্ভবেদষ্টাদশাঙ্গুলম্।
অন্তরং চতুরৈঃ স্থানং চতুরস্রং তদোদিতম্॥

কালিদাস যে "অস্থানন্তরে অর্দ্ধদ্বিচতুরস্রক" :—অর্ধদ্বিচতুরস্র নৃত্যের উল্লেখ করেছেন তার অপর নাম 'নন্দ্যাবর্তাপর'। কেননা নন্দ্যাবর্ত নৃত্যে শিল্পীর ছ আঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে দুটি চরণের স্থিতি থাকে, আর চতুরস্রে তার তিনগুণ বা আঠার অঙ্গুলি পরিমিত স্থান দূরত্বে থাকে। সুতরাং যে নৃত্যে দুটি চরণের স্থিতি বারো অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের দূরত্বে হয় তাকে অর্ধদ্বিচতুরস্র (১৮ − ৯ = ৯ + ৩ = ১২) বা নন্দ্যাবর্তাপর (৬ × ২ = ১২) নৃত্য বলে। কালিদাস নৃত্য,

গীত, বাদ্য ও নাট্যকলায় পারদর্শী না হলেও চাক্ষুষভাবে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের তত্ত্ব তিনি জানতেন। তাছাড়া নাটকে তিনি শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতের উল্লেখ করেছেন।"

কালিদাস শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এই তথ্যও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ "মহাকবি কালিদাস ও সঙ্গীত" প্রসঙ্গে রঘুবংশ কাব্য উদ্ধৃতি থেকে অতি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

"বেণুনা দর্শনপীড়িতাধরা
বীণয়া নখপদাঙ্কিতোরবঃ।
শিল্পকার্য উভয়েন বেজিতাস্তং
বিজিহ্মনয়না ব্যলোভয়ন্॥
অঙ্গসত্ত্ববচনাশ্রয়ং মিথঃ
স্ত্রীষু নৃত্যমুপধায় দর্শয়ণ্।
স প্রয়োগনিপূনৈঃ প্রযোক্তৃভিঃ
সঞ্জঘর্ষ সহ মিত্রসন্নিধৌ॥

কালিদাসের বর্ণনা হল ঃ "রাজা অগ্নিবর্ণ অধর দ্বারা নর্তকীদের অধর দংশন করতেন ও নিজ নখ দ্বারা তাদের বক্ষদেশ ক্ষতবিক্ষত করে দিতেন। সুতরাং দষ্ট অধর দ্বারা বেণুবাদন ও ক্ষতবিক্ষত বক্ষদেশে বীণাস্থাপন করতে তাদের কষ্টবোধ হলেও তারা কুটিল কটাক্ষ নিয়োগ করে রাজার প্রতি অনুরাগ দেখাত, আর তাতেই অগ্নিবর্ণের চিত্ত অভিভূত হত। রাজা নিভৃতে নর্তকীদের আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক এই তিন রকমের অভিনয়ে শিক্ষিতা করেছিলেন। যখন তারা বন্ধুজনের সমক্ষে শিক্ষার পরীক্ষা দিত, প্রয়োগ কলাবিশারদ নাট্যাচার্যদের সঙ্গে রাজার ঘোর তর্ক-বিতর্ক হত।' এ থেকে বোঝা যায় কালিদাস শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।"

নৃত্যনিপুনা মালবিকা বর্ণনা প্রসঙ্গ উদ্ধৃতি সহ মহাকবির কলাজ্ঞানের যে প্রমান স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ উপস্থিত করেছেন সেটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"কালিদাস নৃত্যগীত পারদর্শিনী মালবিকার নৃত্যনৈপুণ্যের উল্লেখ করে নিজের সুমার্জিত কলাজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস সুন্দরী নর্তকী মালবিকার দেহভঙ্গি ও নৃত্যছন্দের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন,

[১] বামং সন্ধিস্তিমিত বলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে,
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পতিতাক্ষং,
নৃত্যাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্দ্ধম্॥

অর্থাৎ দেহ নিশ্চল বলে এর [মালবিকার] মণিবন্ধে বলয় স্থিরভাবে শোভা পাচ্ছে। এর বামহস্ত নিতম্বদেশে স্থাপিত, শ্যামালতার মত দক্ষিণহস্ত শিথিলভাবে বিলম্বিত। দক্ষিণ-চরণের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পুষ্প-বিস্তৃত মণিময় নৃত্যমণ্ডপে পতিত কুসুমরাশি অপসারিত হচ্ছে। এর চক্ষু দুটি ভূমির দিকে নিবিষ্ট। চরণ থেকে নাভি পর্য্যন্ত দেহের অর্ধভাগ সরল ও আয়ত। এভাবে অবস্থান করাতে অতীব চারু-দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে।

[২] অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ,
পাদন্যাসো লয়মুপগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনিমৃদু রভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ,
ভাবো ভাবং তুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব॥

অর্থাৎ মুখে কোন কথা [শব্দ] উচ্চারিত না হলেও অঙ্গাদির ভঙ্গি [হস্তাদিকরণ] দ্বারা সকল অর্থই প্রকাশ পাচ্ছে। পদবিক্ষেপ সর্বদা লয়সঙ্গত, রস সম্বন্ধেও তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়, অভিনয় অতিশয় কোমল ও সুকুমার দর্শন, কেননা নৃত্যের সময় হস্তের দ্বারাই তার মান নির্নীত হচ্ছে। অভিনয়ের সময়ে যে ধরণের বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর প্রয়োজন (হাব-ভাব দৃষ্টি প্রভৃতি) সেগুলি সমস্ত যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হচ্ছে। এরূপ (নৃত্য গীতাদি সহ) অভিনয় প্রত্যেক মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যেও উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে নৃত্য নিপুনা দেবদাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"পাদন্যাসৈঃ ক্বণিত-রসনা স্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়াখচিত-বলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্তত্তো নখপদসুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূন্
আমোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণী-দীর্ঘান্ কটাক্ষান্।

পদক্ষেপে কাঞ্চী-রুত
দেবদাসী কুশলা নটনে
ক্লান্তহস্তা মণিদ্যুতি
লীলায়িত চামর হেলনে।
নখক্ষতে সুখদায়ী
বর্ষাবিন্দু লভিয়া তোমার
ভ্রমর-নিকর-দীর্ঘ
সুকটাক্ষে চাবে বারবার॥"

(অনুবাদ : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

এছাড়া বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক, ভারবি, ভর্তৃহরি, বাণভট্ট, ভবভূতি, বিশাখদত্ত, হর্ষবর্ধন প্রভৃতির গ্রন্থেও নৃত্য ও নাট্যের কথা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার চেষ্টা না থাকায় তৎকালীন সমাজে নৃত্যকলার রূপ জানবার দুটি পন্থা আছে : একটি প্রত্নতাত্ত্বিক এবং অপরটি হল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের নৃত্যকলার বর্ণনা ও আলোচনা। ভারতের নৃত্যকলার সর্বত্রগামী সার্বিক রূপটিকে উপলব্ধি করতে হলে এখনো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সব উপাদান নিয়ে প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন।

ধর্মের বাহন হয়ে নৃত্যকলা প্রসার লাভ করলেও একমাত্র ধর্মের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে

নানা ধর্ম্মমতের সৃষ্টি হয়েছে। এবং বিভিন্ন ধর্মমতের সংঘাতে নৃত্যকলাও বিভিন্ন ভাবাদর্শে রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানবতার ন্যায় ঔদার্য্যও ভারতীয় ধর্মের আর এক বৈশিষ্ট্য। এই ঔদার্য্য যখনই সংকীর্ণতার পাঁকে নিমজ্জিত হয়েছে তখনই তা সমাজ শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসারকেও ব্যহত করেছে। শৈব ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে ও রাজকূলে প্রভাবের উপর তৎকালীন সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সংস্কৃতির আত্ম সম্প্রসারণের যুগ বলা যায়। পরবর্তী মুসলমান আমলেও সাংস্কৃতিক ভাববিনিময় ও বৈচিত্রের পরিচয় মেলে। অবশেষে ঔপনিবেশিক শাসনের বৃত্ত পরিধিতে এসে নৃত্যকলার গতিবেগ হল মন্থর সঙ্কীর্ণ। এই পরবর্তী যুগের নৃত্য ধারার বিকাশ ও গতি প্রকৃতির ইতিহাস ভারতের শাস্ত্রীয় ও আঞ্চলিক নৃত্যধারা গুলির আলোচনা পর্যায়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পনের নৃত্যকলার উপাদান সম্পর্কেও পরবর্তী অধ্যায়ে স্বতন্ত্র আলোচনা আছে।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দ্রাবিড় সভ্যতার সময় থেকেই নৃত্য ও শিল্পকলার যে উৎকর্ষের সূচনা তার অন্যতম প্রমান 'শিল্প' ও 'কলা' এই শব্দ দুটি। এই দুটি শব্দই মূল দ্রাবিড় ভাষা থেকে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়েছে। বৈদিক যুগে নৃত্যকলার চর্চা ও বিকাশ সেই ধারাকে আরো উন্নত স্তরে নিয়ে আসে। বৌদ্ধ যুগে প্রথমে ধর্মীয় অনুশাসন নৃত্য, গীত বাদ্য দর্শন নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই বিধিনিষেধ সংস্কৃতির শক্তির কাছে পরাভূত হয়ে প্রত্যাহৃত হয়। ভারতীয় নৃত্যের জয়যাত্রা সেই সুদূর অতীতেই শুধুমাত্র ভারতের ভৌগলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। দেশ বিদেশে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়া ও থাইল্যাণ্ড, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বলি প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় নৃত্যের প্রভাব ও প্রসারের কথা সর্বজনস্বীকৃত।

যুগে যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনাবেগ যত বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, নৃত্যকলার বিষয় ও রীতিও তত বিচিত্রতর হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বহু জাতি ও সংস্কৃতির ভাব ও ভাবনার নতুন নতুন উপাদান গ্রহণ ও নব নব ভাবধারার স্বীকৃতির ফলে ভারতের নৃত্যধারা, দেশের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রেখে মহত্তর হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রস্তুতি কালের দীর্ঘতা ও গতিবেগ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। গৃহীত ভাবধারার স্বীকরণ, পরিপাক ও উৎকর্ষ সাধনে ; অপরীক্ষিত সত্য ও সৌন্দর্যের নব পরীক্ষণের ছন্দে জাতির আধ্যাত্মিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ভারতীয় নৃত্যের রূপ ও রেখা রমনীয় লাবণ্যে ও মহিমান্বিত বীর্যে মানব মনের মহৎ আনন্দের উপাদানে পরিণত হয়েছে।

২

নটরাজ

নৃত্যের দেবতা নটরাজ। শিবের তাণ্ডব নৃত্য থেকেই প্রকৃত নৃত্যের সূচনা। নটরাজ মূর্তিকল্পনা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে প্রাচীন কাল থেকেই একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বিভিন্ন রূপকের মধ্য দিয়েই শিল্প কলারও একটা আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টি করার যে প্রবনতা প্রাচীন কালে ছিল তারই সার্থক প্রকাশ দেখা যায় সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের ছন্দে নটরাজ মূর্তির উদাত্ত পরিকল্পনায়।

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্‌ময়ম্।
আহার্য্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥"

পরিদৃশ্যমান নিখিল ভুবন যাহার আঙ্গিক অভিনয় সঞ্জাত; সমস্ত শব্দ ও ধ্বনি যাহার বাচিক অভিনয় সম্ভূত; চন্দ্রতারাদি জ্যোতির্মণ্ডল যাহার শোভা সম্পাদক অলঙ্কার; সেই মহান সর্বগুণময় দেবাদিদেব নটরাজ সর্বকালের শিল্পীদের প্রেরণা।

"নৃত্তাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারম্।
উর্ধতুর্কামঃ সনকাদি সিদ্ধানেতদ্বিমর্শে শিবসূত্রজালম॥"

নটরাজ তাণ্ডবনৃত্য সমাপনান্তে চৌদ্দবার যে ডমরু ধ্বনি করেছিলেন তা থেকে চোদ্দ পর্য্যায়ে বর্ণগুলির সৃষ্টি হয়েছে একথা

কাশিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। এই তাণ্ডব নৃত্যের কল্পনা থেকেই নৃত্যকলার বিকাশ ও বৈচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় প্রতিমা দেবী বলেছেন "জীব জগতের মধ্যে অহরহ যে নিগূঢ় দ্বন্দ্ব চলেছে অণুপরমানু থেকে আরম্ভ করে প্রাণীজগৎ পর্যন্ত, নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার যে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের ঝড়, তাই প্রাণের বিচিত্র ছন্দে লীলায়িত অফুরন্ত রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের চিত্ত সাধনা করেছে সেই অসীম গতিশক্তিকে দেহের সীমার মধ্যে অনুভব করতে। শিবের তাণ্ডব হল সেই বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি শক্তির প্রত্যক্ষ রূপ। তার মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের আবর্ত্ত আমরা দেখি। তাণ্ডবের প্রতি পদক্ষেপের ছন্দে পৃথিবীর ধূলিকনাও যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। মানুষের কল্পনা যে কত গভীর ভাবে এ্যাবস্ট্রাক্ট্‌কে নিরুদ্দেশকে অনুভব করতে পারে শিবের তাণ্ডবে তারই অদ্ভুত প্রকাশ। এর থেকে বোঝা যায় ভারতীয় নৃত্য একদিন অনঙ্গদহনের অর্থাৎ স্থূল অঙ্গ সীমানা অতিক্রমনের পথে আধ্যাত্মিক প্রেরণাতে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছিল।"

এই নটরাজ পরিকল্পনায় অবশ্য বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করা হয়েছে, যেমন রজোগণের বিকাশে শিব স্রষ্টা, সত্বগুণের বিকাশে পালনকর্তা এবং তমোগুণের বিকাশে প্রলয়ঙ্কর। অনেকে বলেন পার্বতীকে তুষ্ট করার জন্য শিব তাণ্ডবনৃত্য করেন। নটরাজমূর্তি কল্পনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই মূর্তি কল্পনায় বিশেষ বৈচিত্রের সমন্বয় দেখা যায়। শিব প্রাক বৈদিকযুগের দেবতা, আর্য্য সভ্যতায় ও তার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। নটরাজ মূর্তির পরিকল্পনায় রূপ, ভাব, লাবণ্য বিভিন্ন মূর্তিতে সমগ্র দেশের মন্দিরে মন্দিরে শুধু যে ভাস্কর্যের শিল্পশাস্ত্রানুসরণ করেছে তাই নয় নৃত্যকলার বিভন্ন করণ, অঙ্গহার শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে এর রূপরচনায় অনুসৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করার মাধ্যম হিসাবে তৎকালীন এই সব মূর্ত্ত

গুলি রচিত হয়েছিল। শুধুমাত্র যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টিই সে যুগের শিল্পাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল না ঠিক তেমনই এর তাল, মান ও ভঙ্গীতে নৃত্যকলার আঙ্গিক যথার্থরূপে রূপায়িত হয়েছে। ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর মন্দিরে নৃত্যরত নটরাজ মূর্তির আটটি হাতে শাস্ত্রানুযায়ী মুদ্রা। বাদামী মন্দিরে শিব নটরাজ মূর্তির ষোলটি হাতেও বিভিন্ন শাস্ত্রীয় হস্তমুদ্রা। ইলোরা, এলিফান্টা ও দাক্ষিণাত্যের চিদাম্বরম মন্দিরের শিব নটরাজের ললিত মূর্তি ও তক্ষশীলার ধ্বংসস্তুপ থেকে আবিষ্কৃত নটরাজের উর্ধতাণ্ডব ভঙ্গীযুক্ত মূর্তি শিল্পকলা ও নৃত্যকলার উৎকর্ষের উজ্জ্বল নিদর্শন।

প্রাচীন গ্রন্থ সঙ্গীতমকরন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে নটরাজের সুন্দর বর্ণনা আছে। "ব্রহ্মা তালধর, শ্রীহরি পটহবাদ্য করিতেছেন, স্বয়ং ভারতী বীনাবাদনরতা ; রবি ও শশী বংশী আলাপনে নিরত ; সিদ্ধ, অপ্সরা ও কিন্নরগণ শ্রুতিধর ; নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি মাদল বাজাইতেছেন ও নারদ গান করিতেছেন ; এরূপ অবস্থায় মঙ্গলময় বিগ্রহ শম্ভু নৃত্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই মাঙ্গল্যনৃত্যেই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ ইহা অনুমান করা কিছু অসঙ্গত হইবে না। বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকের নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোকে ত্রিপুর বিজয়ী মহাদেবের দুঃখনৃত্য বর্ণিত হইয়াছে ঃ—পাছে তাহার পাদন্যাসে পৃথিবীর অবনতি হয়, পাছে তাহার বাহুবিক্ষেপে সকল লোক পীড়িত হয়, পাছে তাহার অনলকণাবর্ষী দৃষ্টিপাতে নিখিল দৃশ্যবস্তু ভস্মীভূত হয়, এই ভয়ে তিনি অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন। আবার অভিনবগুপ্তকৃত নাট্যশাস্ত্রের টীকা "অভিনব ভারতী"তে কল্পাবসানরূপ নিশান্ত সান্ধ্যসময়ে ব্যোম-রঙ্গাঙ্গনে বিচিত্র নৃত্যপরায়ণ আকাশমূর্তিধর বিশ্বরূপ দেবদেব কর্ত্তৃক বিবিধ সৃষ্টির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। তাই নটরাজের নৃত্যকে শুধু বিশ্বধ্বংসের অগ্রদূত বলা অসঙ্গত ; এই নৃত্যই তাহাকে বিশ্বস্থ-পতিরূপে প্রকাশ করিয়াছে।" [অশোকনাথ শাস্ত্রী]। প্রখ্যাত

শিল্পী হ্যাভেল বলেছেন : "Tandavan, which summed up the threefold processes of creation, preservation, and destruction * * ।"

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ নটরাজ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : "নটরাজের নৃত্য সৃষ্টির পরিচায়ক। সাধারণতঃ নটরাজমূর্তি চারহাত বিশিষ্ট। দক্ষিণ দিকে উপরের হাতে ডমরু অনাহত শব্দের প্রতীক, অখণ্ড মহাকালের বুকে তা যেন ছন্দ বা তাল লয় রক্ষা করছে। ডমরুর শব্দের সঙ্গে মহাপ্রাণ ও পঞ্চভূতের যোগসূত্র জড়িত। বিশ্ব-বৈচিত্র্যের উপাদান পঞ্চভূত। শব্দও তাই। নৈয়ায়িকেরা 'শব্দগুণ-মাকাশম' সূত্রে শব্দকে আকাশের গুণ বলেছেন, শব্দ আকাশ বা মহাকাশের প্রকাশক। নটরাজের বামদিকের উপরের হাতে 'অর্ধমুদ্রা', তাতে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড-ধ্বংসের পরিচায়ক। দক্ষিণদিকে নীচেকার হাতে 'অভয়মুদ্রা'—শান্তি ও সান্ত্বনার উদ্বোধক। বাম-দিকের নীচেকার হাত উৎক্ষিপ্ত ও আন্দোলিত এবং তা চরণের দিকে নমিত তাতে আছে 'গজহস্তমুদ্রা' এবং তা বিঘ্ননাশক গণপতি বা বিনায়ককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। এ হাত সর্ববিঘ্ননাশের প্রতীক। পদতলে বামন 'অপস্মার' পুরুষ বা অসুর ত্রিপুর অজ্ঞানরূপ সংসার চক্রের পরিচায়ক। নটরাজ বামনকে পদদলিত করছেন, অর্থাৎ অজ্ঞানকে বিনাশ করে তিনি মুক্তি ও শান্তির আলোকদান করছেন। বামন পদ্মপীঠের ওপর শায়িত। নৃত্যে শিবের পাঁচটি শক্তি বা পঞ্চক্রিয়া বিকশিত : সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। পঞ্চক্রিয়ার অধিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর ও সদাশিব। নটরাজ শিবের হাতে মুদ্রা বা হস্তকরণগুলি, নৃত্যে ভাব ও রসের প্রকাশক। নটরাজের চারদিকে প্রভাবমণ্ডল বা অগ্নিশিখার চক্র বিশ্বের ও বিশ্ববাসীগণের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। অধ্যাপক সিমার একে ওঙ্কারেরও প্রতীক বলেছেন। নটরাজের শিরে জটাজাল নৃত্যের তালে তালে শূণ্যে উৎক্ষিপ্ত। জটার বাঁধনে

গঙ্গা হিমালয়ের গোমুখীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কপালে অর্ধচন্দ্র বা অগ্নি জ্ঞানের এবং শিরে সর্প প্রকৃতি বা প্রাণশক্তির পরিচায়ক। নটরাজের দক্ষিণ কর্ণে মনুষ্যদেহের এবং বাম কর্ণে নারীদেহের ভূষণ। শিল্পী হ্যাভেল এটিকে বলেছেন পুরুষ-প্রকৃতির মিলিত রূপ।

হ্যাভেলের মতে নটরাজের তাণ্ডবনৃত্যে দুটি ভাব অন্তর্নিহিত, একটি প্রকৃতির বাইরের জড়বিকাশের বিলাস ও অপরটি অধ্যাত্মিক জগতের লীলার অভিব্যক্তি—যাতে মানুষের সকল কিছু কামনা, অজ্ঞান ও বন্ধনের অবসান হয়। তিনি নটরাজের নৃত্যের একটি পৌরাণিক আখ্যানের পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যানটি আদিমকালের ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত। গল্পটি হল ঃ একদিন শিব যোগীবেশে অরণ্যে ঋষিদের কাছে গিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হলেন ও ঋষিদের হারিয়ে দিলেন। ঋষিরা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিচারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা শিবকে আক্রমণ করার জন্য যজ্ঞাগ্নিতে ভয়ঙ্কর মূর্তি এক ব্যাঘ্র সৃষ্টি করলেন। শিব কণিষ্ঠাঙ্গুলির নখ দিয়ে ব্যাঘ্রের শরীর থেকে চামড়া খুলে নিয়ে নিজের গায়ে পরিধান করলেন। ঋষিরা বিষাক্ত সর্প সৃষ্টি করলেন। কিন্তু শিব সেই সাপকে মালার আকারে গলায় পরে নৃত্য করতে লাগলেন। তখন ঋষিদের যজ্ঞাগ্নি থেকে বিকটাকার বামনরূপ অসুর বহির্গত হয়ে শিবকে আক্রমন করলো। শিব অসুরকে পদভারে দলিত করে তার পৃষ্ঠদেশ ভেঙ্গে দিলেন। শিবের এই তাণ্ডবনৃত্য স্বর্গলোকের দেবতা ও ঋষিরা প্রত্যক্ষ করলেন। এই নৃত্যের দৃশ্যই এলিফেণ্টার গুহায় চাক্ষুষভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ জাভাযাত্রীর পত্র রচনায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন ঃ "শিব মন্দিরই এখানে প্রধান। শিবের নানাবিধ নাট্যমুদ্রা এখানকার মূর্তিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে তার বিস্তারিত সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একটা জিনিস ভেবে দেখবার বিষয়। শিবকে এদেশে গুরু, মহাগুরু বলে অভিহিত করেছে। আমার বিশ্বাস, বুদ্ধের

গুরুপদ শিব অধিকার করেছিলেন; মানুষকে তিনি মুক্তির শিক্ষা দেন। এখানকার শিব নটরাজ, তিনি মহাকাল; অর্থাৎ সংসারে যে চলার প্রবাহ, জন্মমৃত্যুর যে ওঠা পড়া সে তাঁরই নাচের ছন্দে। তিনি ভৈরব, কেননা তার লীলার অঙ্গই হচ্ছে মৃত্যু। আমাদের দেশে এক সময়ে শিবকে দুই ভাগ করে দেখেছিল। একদিকে তিনি অনন্ত, তিনি সম্পূর্ণ, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি প্রশান্ত; আর একদিকে তারই মধ্যে কালের ধারা তার পরিবর্তনপরম্পরা নিয়ে চলেছে, কিছুই চিরদিন থাকছে না, এইখানে মহাদেবের তাণ্ডবলীলা কালীর মধ্যে রূপ নিয়েছে।"

নৃত্যদেবতা নটরাজের তাণ্ডবনৃত্য থেকেই নৃত্যের সূচনা। শিব তাণ্ডব থেকে নৃত্যের যে জয়যাত্রা সুরু হল তার মূল ভাবধারা আধ্যাত্মিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুদেবদেবীরা প্রায় সকলেই নৃত্যগীতে পারদর্শী। শিব তাণ্ডব যেমন নৃত্যের প্রথম প্রকাশ তেমনই কালীতাণ্ডব লাস্য নৃত্যকলার অপূর্ব নিদর্শন।

৩

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণ

নৃত্যকলা ও নাট্যচিন্তার উৎস-সন্ধানে ভরত-নাট্যশাস্ত্র পর্য্যালোচনা অপরিহার্য্য। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে যখন জনসাধারণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে পড়ে তখন দেবগণ ইন্দ্রের সাথে গিয়ে লোকগুরু ব্রহ্মাকে জনমানসের উন্নতিকল্পে সর্বসাধারণের উপযোগী এক নতুন বেদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন ঃ

"ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ব্ববর্ণিকম।"

এক ধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য ও সর্ববর্ণের উপযোগী পঞ্চম বেদ তারা প্রার্থনা করলেন। তখন চতুর্বেদ থেকে নাট্যবেদ সৃষ্টি হল।

"নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্
জগ্রাহ পাঠ্যং ঋগ্বেদাৎ সামেভ্যোগীতমেব চ
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বনাদপি।"

লোকগুরু ব্রহ্মা ঋগ্বেদ থেকে পাঠ্য, সামবেদ থেকে গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় ও অথর্ববেদ থেকে রস সংগ্রহ করে নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন। তিনি বললেন ঃ

"ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে॥"

অর্থাৎ এমন জ্ঞান, শিল্প, বিদ্যা, কৌশল বা কর্ম নেই যা এই নাট্য-কলায় দেখা যায় না। শিল্পকলা সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। অভিনয় দর্পনে নাট্য প্রশংসায় উল্লেখ আছে,

"ঋগ্‌যজুঃ সামবেদেভ্যো বেদাচ্চথর্ব্বণঃ ক্রমাৎ॥
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মজঃ।
ব্যরীরচচ্ছাস্ত্রমিদং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥
কীর্ত্তিপ্রাগল্‌ভ্য সৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যানাং প্রবর্দ্ধনম্।
ঔদার্য্য স্থৈর্যধৈর্য্যাণাং বিলাসস্য চ কারণম্॥
দুঃখার্ত্তিশোকনির্ব্বেদ খেদবিচ্ছেদকারণম্।
অপি ব্রহ্মপরানন্দাদিদমভ্যধিকং মতম্॥"

চতুর্বেদ-এর অঙ্গ থেকে সংগৃহীত এই নাট্যবেদ ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ প্রদান করে। এই পঞ্চম বেদ কীর্ত্তি, প্রাগল্‌ভ্য, সৌভাগ্য ও বৈদগ্ধ্যের প্রবর্দ্ধক, ঔদার্য্য, স্থৈর্য্য ও বিলাসের কারণ এবং ইহা দুঃখ, আর্ত্তি, শোক, নির্ব্বেদ ও খেদ নিবারণ করে। ইহা পরম ব্রহ্মানন্দ থেকেও উৎকৃষ্টতর।

নাট্যশাস্ত্রের রচনাকাল সম্পর্কে বহু মত পার্থক্য আছে। সাধারণ ভাবে খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এর রচনাকাল নিরুপন করার প্রয়াস হয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, নাট্যশাস্ত্রের পূর্বেও নাট্য ও নৃত্যকলার কিছু ইতিহাস পাওয়া যায়। এবং স্বয়ং ভরতও তিনি যে পূর্ববর্তী আচার্য্যদের কাছ থেকে নাট্য ও নৃত্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সেকথা নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন।

"অহং চ কথয়িষ্যামি নিখিলেন তপোধনাঃ।
সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চ যথাক্রমম্॥"

৩৬০০ থেকে ৬০০০ পর্য্যন্ত শ্লোকে সম্পূর্ণ নাট্যশাস্ত্র-এর বিভিন্ন যে সব সংস্করণ পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচার্য্যগণ এই নাট্যশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনি আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা এ নিয়েও বহু

মতদ্বৈধতা আছে। অনেকে বলেন "ভরত" শব্দটি উপাধি। প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যশাস্ত্রজ্ঞদের "ভরত" উপাধি দেওয়া হত। নন্দিভরত, মতঙ্গভরত, কাশ্যপভরত, কোহলভরত ও তণ্ডুভরত এই নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ পঞ্চভরতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রের বিষয় সূচী লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে নৃত্য, নাট্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে যা কিছু আবশ্যকীয় সবই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বিষয় সূচীতে ১) নাট্যোৎপত্তি ২) মণ্ডপবিধান ৩) রঙ্গ-দৈবত পূজাবিধান ৪) তাণ্ডব লক্ষণ ৫) পূর্বরঙ্গবিধান ৬) রসাধ্যায় ৭) ভাবব্যঞ্জন ৮) উপাঙ্গাভিনয় ৯) অঙ্গাভিনয় ১০) চারীবিধান ১১) মণ্ডলকল্পন ১২) গতি প্রচার ১৩) করযুক্তি ধর্মব্যঞ্জক ১৪) ছন্দোবিধান ১৫) ছন্দোবৃত্তবিধি ১৬) অলঙ্কার লক্ষণ ১৭) কাকুস্বর বিধান ১৮) দশরূপ লক্ষণ ১৯) সন্ধ্যঙ্গ-বিকল্প ২০) বৃত্তিবিকল্প ২১) আহার্য্যাভিনয় ২২) সামান্যাভিনয় ২৩) বৈশিক ২৪) চিত্রাভিনয় ২৫) প্রকৃতি বিকল্পনা ২৬) সিদ্ধিব্যঞ্জক ২৭) জাতি লক্ষণ ২৮) আতোদ্য জাতিবিধান ২৯) তালবিধান ৩০) ধ্রুবাধ্যায় ৩১) গুণাধ্যায় ৩২) পুস্কর বাদ্য ৩৩) ভূমিবিকল্প ৩৪) নটশাপ ৩৫) গুহ্যবিকল্প প্রভৃতি অধ্যায়ে নাট্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য সংক্রান্ত সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে।

ভারতের দৃশ্যকাব্যগুলিতে অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে সেই জন্যই এর নাম নাট্য। নট ধাতুর অর্থ নৃত্য করা তাই নৃত্যক্রিয়ার দ্বারা যা করা যায় তাই নাট্য। প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত অর্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনের সম্মিলিত রূপ বোঝাত। "নৃত্যং গীতং বাদ্যং চেতি ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"— সঙ্গীত রত্নাকরে এই ব্যাখ্যা আছে।

ভারতে নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ আদর্শ অনুসরণ করা হত। নিছক আনন্দ প্রদায়িণী শিল্প সৃষ্টির কথা নাট্যশাস্ত্র বলে নি।

"দেবতানাং মুনীনাং চ রাজ্ঞামথ কুটুম্বীনাম্।
কৃতানুকরণং লোকে নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥
যোহয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।
সোহঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে ॥"

শুধু যে আদর্শ কর্মের আচরণের অনুকরণের কথা তারা নির্দেশ করেছেন তাই নয় বিভিন্ন রস, ভাব ও আচরণে সমৃদ্ধ হয়ে অভিনীত নাট্য সকলের পক্ষে শিক্ষনীয় ও উপদেশজনক হবে এই নির্দেশও আছে।

"এতদ্ রসেষু ভাবেষু সর্বকর্মক্রিয়াসু চ।
সর্বোপদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি ॥"

। নন্দিকেশ্বর ও অভিনয় দর্পণ।

নৃত্যকলার ইতিহাস, ব্যকরণ, বিজ্ঞান, মূর্তিতত্ত্ব ও দর্শন একটি অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। এর বিকাশ ও ক্রমবিবর্তনে বিভিন্ন মনীষি ও নাট্যসম্প্রদায়ের অবদান অনস্বীকার্য। মুণি ভরতের পূর্বে ব্রহ্মভরত ও সদাশিবভরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভরতের পরে নন্দিকেশ্বর, কোহল, শাণ্ডিল্য, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু প্রভৃতি আচার্যদের আবির্ভাবকাল নিয়ে বহু মতবিতর্ক আছে। সাধারণ ভাবে একথা অনস্বীকার্য যে ভরতসম্প্রদায়, নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় ও কোহলমতঙ্গ সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে নন্দীকেশ্বরকে ভরতের পূর্ববর্তীও বলে থাকেন। সারদাতনয়ের মতে নন্দিকেশ্বর ভরতের গুরু ছিলেন। শিবানুচর বলেও নন্দিকেশ্বরকে কল্পনা করা হয়। অবশ্য অভিনয়-দর্পণ গ্রন্থে নাট্যোৎপত্তি প্রসঙ্গে নন্দিকেশ্বর ভরতের নাম উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার বলেন যে নন্দী, নন্দিকেশ্বর ও শিবানুচর তণ্ডু একই ব্যক্তি। এবং অভিনয় দর্পণ গ্রন্থটি "নন্দীশ্বর-সংহিতা" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের পরিশিষ্ট। "Mirror of Gestures" গ্রন্থের ইন্দ্র-নন্দিকেশ্বর সংবাদে একটি কাহিনী পাওয়া

যায়। দেবরাজ ইন্দ্র একদা নন্দিকেশ্বরের নিকট নৃত্যশিক্ষাগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ তখন দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যকুলের শ্রেষ্ঠ নর্তক নটশেখরকে নৃত্যের প্রতিযোগীতায় পরাস্ত করতে চেয়েছিলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে নন্দীকেশ্বর চার হাজার শ্লোক সম্বলিত "ভরতার্ণব" নামক গ্রন্থ রচনা করে নৃত্যকলা শিক্ষার জন্য ইন্দ্রকে দিলেন। ইন্দ্র গ্রন্থের বিশাল আয়তন দেখে ভীত হয়ে নন্দীকেশ্বরকে কাতর অনুরোধ জানান যে তিনি যেন তার নৃত্যকলা অনুশীলনের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত-সার রচনা করে দেন। তখন নন্দিকেশ্বর কৃপাভরে ইন্দ্রের জন্য "অভিনয় দর্পণ" রচনা করেন। •

এই সব কাহিনী ও উৎপত্তিকাল সম্পর্কে মতপার্থক্য থাকলেও ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে 'অভিনয়-দর্পণ' গ্রন্থ ও নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত ধারা অভিনয়কলা, মুদ্রা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায়ে বহিরঙ্গের খুঁটিনাটি খুব বেশী এবং তিনি নাট্যধর্মী অভিনয়কেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন। অপর পক্ষে ভরত এই বহিরঙ্গ খুঁটিনাটি অপেক্ষ অন্তরঙ্গ রসস্ফূর্তির উপরেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন এবং লোকধর্মী অভিনয়কেই শ্রেষ্ঠতর বলে নির্দেশ করেছেন। বিভিন্ন অঙ্গাভিনয়ের প্রকার ভেদের নির্দেশ ভরতনাট্য-শাস্ত্রে থাকলেও উহাদের পারস্পারিক সংযোজনার মাধ্যমে অনন্ত শিল্পবৈচিত্রের কথা নন্দিকেশ্বর বিশদ আলোচনা করেছেন সে বিষয়ে ভরত বিশেষ জোর দেননি। বরং রসাভিনয়ের বিরোধী অতিরিক্ত অঙ্গাভিনয়ের নিন্দা করেছেন। ভরতের মতে সাত্বিক গুণযুক্ত উত্তম পাত্রের পক্ষে শুধুমাত্র আঙ্গিকাভিনয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মধ্যম ও অধম প্রকৃতির পাত্ররা আঙ্গিকাভিনয়ের অধিকারী। বহিরঙ্গের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে ভরত সম্প্রদায় বিশেষ অবহেলা দেখিয়েছেন। অপরদিকে নন্দিকেশ্বর সম্প্রদায় এই বহিরঙ্গের খুঁটিনাটির ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেখিয়েছেন। কোহল ও মতঙ্গ সম্প্রদায় এই দুই মতের সামঞ্জস্য-বিধান করে রসসৃষ্টিকে অভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করে বহিরঙ্গের

দিকেও যত্নশীল হবার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেছেন।

অঙ্গাভিনয়ের বিভিন্ন কর্মের লক্ষণে নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। তবে একথা সত্য যে রসসৃষ্টি প্রসঙ্গে বিশেষ অবহেলা দেখালেও নাট্যধর্মী অভিনয়ের আলোচনায় অভিনয়-দর্পণ বিশেষ মূল্যবান।

নাট্যপ্রয়োগ

। *তাণ্ডব ও লাস্য* ।

ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ মর্তে প্রয়োগের জন্য ভরতমুণিকে নির্দেশ দিলেন। ভরতমুণি ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে তার শত পুত্রকে ভারতী, সাত্বতী ও আরভটি বৃত্তিতে শিক্ষা দেন। তারপর ব্রহ্মা 'কৈশিকী' বৃত্তিতে এর প্রয়োগ করতে বলায় ভরতমুণি জানান যে নারী ব্যতীত কেবলমাত্র পুরুষের দ্বারা এর প্রয়োগ অসম্ভব। তখন ব্রহ্মার মানসে অপ্সরাদের সৃষ্টি হয়। ভরতমুণি তখন গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মাধ্যমে নাট্যবেদের সাহায্যে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেন। প্রয়োগ-কালে দেবাদিদেব মহেশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে মহেশ্বর নিজভক্ত তণ্ডুর মাধ্যমে তাণ্ডব নৃত্য ভরত-মুণিকে শিক্ষা দেন।

"সৃষ্টা ভগবতা দণ্ডস্তাণ্ডিনে মুণয়ে তথা।
তাণ্ডিনাপি ততঃ সম্যগ্‌ গানভাণ্ডসমন্বিতঃ ॥
নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তাণ্ডব ইতিস্মৃতঃ।"

গান ও ভাণ্ডবাদ্যের তালেতালে মুনি তণ্ডু "তাণ্ডব" নৃত্য প্রদর্শন করেন: নাট্যশাস্ত্র মতে তাণ্ডব শৃঙ্গার রস থেকে সৃষ্ট এবং প্রয়োগ সুকুমার ও লীলায়িত গতিবিশিষ্ট। অভিনয় দর্পণের মতে যে নর্তন এর করণ ও অঙ্গহারগুলি উদ্ধত এবং বৃত্তি আরভটি তাহাই তাণ্ডব।

তাণ্ডব তিন প্রকার,চণ্ড, প্রচণ্ড ও উচ্চণ্ড। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে অঙ্গহার সমূহের উদ্ধত প্রয়োগের নাম তাণ্ডব। সঙ্গীত দামোদরের মতে তাণ্ডব দুই প্রকার, পেবলি ও বহুরূপ। ইহাও উদ্ধত ভাব প্রকাশক। ভরতের মতানুযায়ী তাণ্ডব নৃত্যে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। নাট্যশাস্ত্রের মতে তাণ্ডব শৃঙ্গার রস থেকে সৃষ্ট সুতরাং তাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অংশ গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তী কালে তাণ্ডব ও লাস্যকে পৃথক করে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্যকে স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্ধারিত করা হয়।

ভরতমুণি নাট্যশাস্ত্রে তাণ্ডব-এর পরিচয়ে বলেছেন ঃ

"যে গীতকাদৌ যুজ্যন্তে সম্যঙনৃত্তবিভাগকাঃ।
দেবেন চাপি সম্প্রোক্তস্তণ্ডুস্তাণ্ডবপূর্বকম্॥
গীতপ্রয়োগমাশ্রিত্য নৃত্তমেতৎ প্রবর্ত্যতাম্।
প্রায়েণ তাণ্ডববিধিদেবস্তত্যাশ্রয়ো ভবেৎ॥
সুকুমার প্রয়োগশ্চ শৃঙ্গাররসসম্ভবঃ।
তস্য তণ্ডুপ্রযুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম॥"

পার্ব্বতী স্বয়ং লাস্য নৃত্য ভরতমুণিকে শিক্ষা দেন। ভরতমুণি এই তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের মর্তে প্রচলন করেন। আবার পৌরানিক কাহিনীতে পাওয়া যায় যখন শনিরাজের কোপে মহেশ্বর বাণাসুরের দ্বাররক্ষকরূপে ও পার্ব্বতী বাণাসুরকন্যা ঊষার পরিচারিকা নিযুক্ত হন তখন পার্ব্বতী ঊষাকে লাস্য নৃত্য শিক্ষা দেন। ঊষা আবার দ্বারকাবাসিনী গোপীদের এই নৃত্য শিক্ষা দেন এবং সৌরাষ্ট্রের মেয়েদের মাধ্যমেই মর্তে লাস্য নৃত্যের প্রচলন হয়। অভিনয় দর্পণে উল্লিখিত আছে ঃ

"বুদ্ধাহথ তাণ্ডবং তণ্ডোর্মর্ত্তেভ্যো মুণয়োহবদন।
পার্ব্বতী ত্বণুশাস্তিস্ম লাস্যং বাণাত্মজামুষাম॥
তয়া দ্বারবতীগোপস্তাভিঃ সৌরাষ্ট্রযোষিতঃ।
তাভিস্তু শিক্ষিতা নার্য্যো নানাজনপদাস্পদাঃ॥
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমেতল্লোকে প্রতিষ্ঠিতম্।"

সঙ্গীত রত্নাকরেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যাই হোক তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্যের ভরতমুণি বিশেষ ভেদস্বীকার না করলেও পরবর্তীকালের আচার্য্যেরা ভেদ নির্দেশ করেছেন। শারদাতনয়ের মতে নৃত্ত ও নৃত্য উভয়েই মধুর ও উদ্ধত ভেদে দুই প্রকার। মধুর রূপ লাস্য ও উদ্ধত রূপ তাণ্ডব। তাহার মতে রসভাবযুক্ত অঙ্গ চালনা যাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) মিশ্রিত এবং যাতে অঙ্গহার ও লয়গুলি ললিত এবং কৈশিকী বৃত্তি ও গীতির প্রাধান্য তাহাই লাস্য। লাস্য চার প্রকার লতা, পিণ্ডী, ভেদ্যক ও শৃঙ্খল। সঙ্গীতরত্নাকরের মতে লাস্য এর প্রয়োগ সুকুমার এবং কামবর্দ্ধক। সঙ্গীত দামোদরের মতে লাস্যের প্রয়োগ সুকুমার এবং ইহা দুই প্রকার—ছুরিত ও যৌবত। ছুরিত হচ্ছে নায়ক নায়িকার নৃত্যবশতঃ ভাব-রসের বিকাশ ও যৌবত হচ্ছে নর্তকীবৃন্দ কর্তৃক ললিত মনোমুগ্ধকর মধুর নৃত্য।

। নটনভেদ ।

পাঠ্য, অভিনয়, গীত ও রস এই চতুর্বেদাঙ্গযুক্ত কলাকে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

"এতচ্চতুর্ব্বিধোপেতং নটনং ত্রিবিধং স্মৃতম্
নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি মুনিভির্ভরতাদিভিঃ।"

নটনকলা সম্পর্কে নির্দেশ এই যে সর্বদা দর্শন সম্ভব না হলে নাট্য ও নৃত্য উৎসবকালে অবশ্য দর্শনীয়। রাজাভিষেক, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, প্রিয়সঙ্গম, নবজাতকের অবির্ভাব প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নৃত্ত অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয় কারণ ইহা সৌভাগ্য ও মঙ্গল সুচনা করে।

নাট্য ঃ

"নাট্যং তন্নাটকঞ্চৈব পূজ্যং পূর্বকথাযুতম্"

যা নাট্য, তাই নাটক এবং উহা পূজার উপযোগী ও পৌরাণিক কথাযুক্ত। নাট্য শব্দটি থেকে প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্য কাব্যের বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। নট ধাতুর অর্থ নৃত্য করা সুতরাং যাহা নৃত্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায় তাহাকে নাট্য আখ্যা দেওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত

কাহিনী যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করাই হল ন্যট্য। নাট্য বলতে আমরা বুঝি কথার সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের একাত্মকতা। নাট্য রসাশ্রয় সুতরাং মুদ্রা সমন্বিত ভাব সম্মিলিত ছন্দোময় দেহের লীলায়িত ব্যঞ্জনা।

"গীতেষু যত্ন প্রথমং তু কার্যঃ
শয্যা হি নাট্যস্য বদন্তি গীতম্।
গীতে চ বাদ্যে চ হি সংপ্রযুক্তে
নাট্যস্য যোগো ন বিপত্তিমেতি॥"

নাট্যের সাথে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দশরূপককারের মতে "অবস্থাণুকৃতির্নাট্যং" অর্থাৎ নাট্য দৃশ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত পাত্র-পাত্রীর ভাব ভাষা, অবস্থার অনুকরণ।

নৃত্ত ঃ

"ভাবাভিনয়হীনং তু নৃত্তমিত্যভিধীয়তে॥"

ভাববিহীন, অভিনয়হীন তাল সমন্বিত অঙ্গবিক্ষেপ অর্থাৎ শুধুমাত্র লীলায়িত দেহের ছন্দোময় প্রকাশকে নৃত্ত বলা যায়। ধনঞ্জয় ও শারদায়তনের মতে নৃত্ত বাক্যার্থাভিনয় প্রধান। দশরূপককারের মতে তাললয়াশ্রয় নৃত্তের নাম দেশী। শার্ঙ্গদেবের মতে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য্য অভিনয় বর্জিত সাধারণ অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্ত বলা যায়। অর্থাৎ নৃত্ত বলতে বুঝা যায় তাল ও লয়ের দিকে মনোযোগ রেখে অভিনয়হীন সবিলাস অঙ্গচালনা।

নৃত্যঃ

"রসভাবব্যঞ্জনাদি যুক্তং নৃত্যমিতীর্য্যতে।"

যে নাট্যকলা ভাব অভিনয়যুক্ত ও রসসমৃদ্ধ হয় হয় তাই নৃত্য। ধনঞ্জয় ও সারদাতনয়ের মতে নৃত্য ভাবাশ্রয়, যা ভাবাশ্রয় তাই পদার্থাভিনয়াত্মক এবং মার্গ নামে খ্যাত। শার্ঙ্গদেব বলেন, আহার্য্যাভিনয় বর্জিত আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্তনের নাম নৃত্য। সঙ্গীত দামোদর রচয়িতা শুকম্ভরের

মতে দেবগণের রুচি সম্মত তালমানরসাশ্রয় সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য।

নাট্যশাস্ত্রে অবশ্য নৃত্য ও নৃত্ত এই দুই বিভাগের কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে এই বিভাগ সৃষ্টি হয়েছে। এরিষ্টটলের পোয়েটিকস্ এ নৃত্যের যে সংজ্ঞা পাওয়া যায় তাও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। ডাঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ "নৃত্য ও অনুকরণ। নৃত্য দৈহিক ছন্দে চরিত্র, ভাবাবেগ ও ঘটনাকে অনুকরণ করে থাকে। ছন্দই (rhythm) হচ্ছে এর বিশেষ উপায় (Dancing imitates character, emotion and action by rhythmical movement.) আসল কথা নৃত্য জীবনেরই অনুকরণ—তবে এই অনুকরণের মাধ্যম হচ্ছে দেহের গতিভঙ্গিমা।" (এরিষ্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব)

নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য হচ্ছে নাট্য রসাশ্রয়, নৃত্য ভাবাশ্রয় ও নৃত্ত তাললয়াশ্রয়। নাট্যের দ্বারা দর্শকের মনে রস সঞ্চার হয়, নৃত্যের মাধ্যমে হৃদয়াভাবের উদ্বোধন ঘটে আর নৃত্য শোভা সম্পাদন করে।

। রঙ্গমণ্ডপ।

নাট্যশাস্ত্রের মতে প্রাচীন ভারতে নাট্যগৃহ তিন প্রকার— (ক) চতুরস্র (খ) বিকৃষ্ট (গ) ত্র্যস্র। মাপ অনুযায়ী এগুলি আবার ছোট, বড় ও মাঝারি তিন রকমের হয়। অর্থাৎ নয়টি মাপের রঙ্গমণ্ডপ এর প্রচলন ছিল। বড় মাপ হচ্ছে ১০৮ হাত, মাঝারি ৬৪ হাত আর ছোট ৩২ হাত। চতুরস্র হচ্ছে চারকোনযুক্ত সমক্ষেত্র (Square), বিকৃষ্ট হচ্ছে আয়তক্ষেত্র (rcetangular) ও ত্র্যস্র হচ্ছে ত্রিকোনক্ষেত্র (trangular)।

রঙ্গমঞ্চের দুটি প্রধান অংশ। প্রথম অংশে নেপথ্যগৃহ, দ্বিতীয় রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ ও মত্তবারনী। নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখ আছে ঃ

"ত্রিবিধঃ সন্নিবেশশ্চ শাস্ত্রতঃ পরিকল্পিতঃ।
বিকৃষ্টশ্চতুরস্রশ্চ ত্র্যস্রশ্চৈব তু মণ্ডপ" ॥

এদের মধ্যে আবার গুণভেদে বিকৃষ্ট উত্তম, চতুরস্র মধ্যম ও ত্র্যস্র কনিষ্ঠ, এবং যথাক্রমে দেবতা, মানুষ ও প্রকৃতিদের জন্য উত্তম, মধ্যমও কনিষ্ঠ নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণতঃ মধ্যম মাপের প্রেক্ষাগৃহই (৬৪ × ৩২) নাট্যাভিনয়ের বেশী উপযোগী ছিল।

নাট্যশাস্ত্রে নাটকের জন্য পাঁচ প্রকার ভূমির নির্দেশ পাওয়া যায় (১) সমা (২) স্থিরা (৩) কঠিনা (৪) কৃষ্ণা (৫) গৌরী। প্রেক্ষাগৃহে শাদা, লাল, হলুদ ও কাল চার শ্রেণীর স্তম্ভকে কেন্দ্র করে আসন রচনা করা হত। শাদারঙের স্তম্ভকে বলা হত 'ব্রাহ্মণ স্তম্ভ', এই স্তম্ভের নীচে স্বর্ণ দেওয়া থাকত, ব্রাহ্মণেরা এই সীমানায় আসন গ্রহণ করতেন। লালরঙের স্তম্ভকে বলা হত—'ক্ষত্রিয় স্তম্ভ', এর নীচে তামা দেওয়া থাকত, ক্ষত্রিয়েরা এই সীমানায় আসন গ্রহণ করতেন। হলুদ রঙের স্তম্ভকে বলা হত—'বৈশ্যস্তম্ভ', এর নীচে রূপা দেওয়া থাকত, বৈশ্যরা এই সীমানায় বসতেন। গাঢ় নীল বা কালরঙের স্তম্ভের নাম ছিল 'শূদ্রস্তম্ভ', এর নীচে লোহা দেওয়া থাকত, শূদ্ররা এই সীমানায় আসন গ্রহণ করতেন। আসনগুলি ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরী করা হত। সম্মুখ রঙ্গের পাশে চারটি স্তম্ভের উপর একটি বারান্দা মতন স্থান থাকত। সেখানে সম্ভ্রান্ত দর্শকের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। রঙ্গভূমি চিত্র ও বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে সজ্জিত করা হত। রঙ্গশীর্ষে রঙ্গদেবতার পূজার ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গপীঠের পার্শ্বে মত্তবারণী। নাট্যশাস্ত্র অনুমোদিত রঙ্গমঞ্চ নির্মান কৌশলে অভিনেতার স্বরক্ষেপন ও বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিকে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হতে সাহায্য করত।

। *সূত্রধার-পাত্র পাত্রী* ।

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত সূত্রধারের ভূমিকা আসলে নাট্যাচার্যের।

ভারতীয়নাট্য নৃত্য, গীত ও অভিনয়কলার সমন্বয় কাজেই সূত্রধারকে প্রায় সর্বকলাপারঙ্গম হতে হত। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী সূত্রধারকে নিম্নোক্ত গুনগুলির অধিকারী হতে হবে।

"চতুরাতোদ্যকুশলঃ শাস্ত্রকর্মসুশিক্ষিতঃ।
নানা পাষণ্ডকার্যজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥
বেশোপচারনিপুনঃ কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।
নানাগতিপ্রচারজ্ঞ রসভাববিশারদঃ ॥
নাট্যপ্রয়োগকুশলো নানাশিল্পসমন্বিতঃ।
পাদচ্ছন্দোবিধানজ্ঞঃ সর্বশাস্ত্রবিচক্ষণ ॥
গ্রহনক্ষত্রতত্ত্বজ্ঞো দেহব্যাপার পণ্ডিতঃ।
পৃথিবীদ্বীপবর্ষাণাং পর্বতানাং জলস্য চ ॥
প্রমাণচরিতজ্ঞশ্চ রাজবংশপ্রসূতিবিৎ।
শ্রোতাশাস্ত্রার্থকারণাং শ্রুত্বা চৈবাবধারকঃ ॥
অবধার্য প্রবক্তা চ শক্তৈশ্চবোদেশনে।
এবং গুণস্তথাচার্যঃ সূত্রধারো বিধীয়তে ॥"

চতুর্বাদ্যনিপুন, নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী বিভিন্ন কর্মে সুশিক্ষিত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের আচরণে অভিজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রে নিপুন, বেশোপচারে ও কামশাস্ত্রে বিজ্ঞ, বিভিন্ন নাট্যোক্ত গতি, চারী ও রসভাবোপলব্ধিতে সুদক্ষ, নাট্য প্রয়োগ নিপুন, বিভিন্ন শিল্প, পাদ ও ছন্দবিধানে জ্ঞানবান, জ্যোতির্বিদ্যা, শারীরতত্ত্ব, মানবচরিত্র, ভৌগলিক সংস্থান, পুরান ও শাস্ত্রার্থে সুপণ্ডিত এবং মত প্রকাশ ও কর্তব্যনির্ধারণে যোগ্যতাসম্পন্ন গুণী ব্যক্তিই সূত্রধার বা নাট্যাচার্য হবার উপযুক্ত।

এই গুণের তালিকা থেকে সেই সময়ের নাট্যচর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সূত্রধারকে সহায়তা করতেন পারিপার্শ্বিক বা প্রধান সহকারী। এছাড়া কর্মীদলে বিদূষক, নট, নাট্যকার, মুকুটকার, গায়ক, বাদক, আভরণকার, মালাকার, বেশকার, রজক, চিত্রকর ও কারুশিল্পী এই বারোরকমের লোক থাকত।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যকলার প্রকৃত অধিকারিনী নর্তকীকে

বুদ্ধি, সত্ত্ব, সুন্দর অথচ স্বাভাবিক রূপ বিশিষ্ট, তাললয়ে দক্ষ, পরিপূর্ণ যৌবন, শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্য, শিক্ষণীয় বস্তুর স্মরণশক্তি, শিক্ষায় উৎসাহ, নৃত্য-গীতে নৈপুণ্য, লজ্জা-ভয়-শ্রম-সহিষ্ণুতা উৎসাহ প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। অভিনয় দর্পনে উল্লিখিত আছে ঃ

"তন্বী রূপবতী শ্যামা পীনোন্নতপয়োধরা ॥
প্রগল্‌ভা সরসা কান্তা কুশলা গ্রহমোক্ষয়োঃ।
বিশাললোচনা গীতবাদ্যতালানুবর্তিনী ॥
পরার্দ্ধ্যভূষাসম্পন্না প্রসন্নমুখপঙ্কজা।
এবংবিধগুণোপেতা নর্তকী সমুদীরিতা ॥"

তন্বী, রূপবতী, পীনোন্নতপয়োধরা, প্রগল্‌ভা, রসিকা, বিশালনয়না, গীতবাদ্য ও তাললয়ে দক্ষ, মূল্যবান মনোহর বেশভূষায় সুসজ্জিতা, কমণীয় লাবণ্যযুক্ত ও প্রসন্নমুখ পঙ্কজ বিশিষ্টা গুণযুক্তা নর্ত্তকীই নটনকলার অধিকারী।

সঙ্গীত রত্নাকরের মতে অঙ্গসৌষ্ঠব, রূপসম্পদ অর্থাৎ সুন্দর বদনমণ্ডল, বিম্বাধর, বিশাল নয়ন, কম্বুগ্রীবা, সুচারু দশন, ক্ষীণ কটি, স্থূল নিতম্ব, সঞ্চারিণী পল্লবিনী বাহুলতা, নাতিখর্ব, নাতিদীর্ঘ, নাতিপীন, শিরাপ্রকাশহীন দেহ, শ্যাম অথবা গৌরবর্ণা, লাবণ্য, কান্তি, মাধুর্য, ঔদার্য্য ও প্রাগল্‌ভ্য প্রভৃতি গুণযুক্তা হলেই সেই নর্ত্তকী নটনকলার শ্রেষ্ঠ পাত্র রূপে বিবেচিত হবে।

সঙ্গীত মকরন্দ অনুযায়ী রূপের তারতম্য অনুসারে নর্ত্তকী হস্তিনী, শঙ্খিনী, চিত্রিনী ও পদ্মিনী এই চার প্রকারের ও বয়সের তারতম্য অনুসারে বালা, তরুণী ও বিদগ্ধযৌবনা এই তিন প্রকারের। সুলক্ষণযুক্ত দেহ, পদ্মের ন্যায় আরক্ত কোমল করতল-পদতল ও বদনমণ্ডল, রম্য কপোলযুগল, বিশাল কুচযুগ, কুসুমসজ্জিত কবরী-রচনা, সলাজ মৃদু মধুর বাণী, মরালীর মত সাবলীল গতি, নৃত্য গীত নিপুনতা, রসলাস্যমদির তনুভঙ্গিমা, গান্ধর্বশাস্ত্রে দক্ষতা, মনোহারিত্ব প্রভতি গুণসম্পন্ন হলে সেই নর্ত্তকী উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি আদর্শ নর্ত্তকীদের সমতুল্য বলে গণ্য হবে।

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত নৃত্যছন্দের এই ছবিটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে মুদ্রিত।

নর্ত্তক হবে সুরূপ, মধুরকণ্ঠ, বিদ্বান, দক্ষ, বাগ্মী, অভিজাত, কলা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ, নৃত্যগীতবাদ্যনিপুন, আত্মনির্ভরশীল, প্রত্যুৎপন্নমতি ও পরিহাস প্রিয়।

নর্ত্তক ও নর্ত্তকী গুণের এই বিবরণ থেকেই নাট্যশাস্ত্রকারদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান, রসবোধ ও নৃত্যকলার প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই গুণগুলি অর্জন করার জন্য তখনকার শিল্পীদের যে কঠোর সাধনা করতে হত তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

। বৃত্তি।

আচার্য্য ভরত ব্রহ্মার আদেশঅনুযায়ী নাট্যবেদকে ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী এই চারি বৃত্তিতে প্রয়োগ করেন। বৃত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে আছে ঃ

"ভারতী সাত্বতী চৈব কৈশিক্যারভটী তথা।
চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতা যাসু নাট্য-প্রতিষ্ঠিতা॥"

বৃত্তি এক কথায় মনের ধর্ম। চরিত্ররূপায়ণে কাহিনীর রসোদ-ভাবন অনুযায়ী পাত্র পাত্রীর চিত্তের বিকাশ ও বিস্তারে বৃত্তিই প্রধান সহায়ক। কোমল-প্রৌঢ় ও কোমল অর্থ প্রকাশক বৃত্তি হচ্ছে ভারতী। পুরুষ চরিত্র রূপায়ণে এই বৃত্তি বেশী অনুসৃত হয়। প্রৌঢ় ও কোমল-প্রৌঢ় অর্থ প্রকাশক সাত্বতী বৃত্তি বীর, অদ্ভুত ও রৌদ্ররসানুকুল কর্মে এবং সামান্য করুণ ও শৃঙ্গার রস প্রসঙ্গে অনুসৃত হয়। সুকুমার অর্থ প্রকাশক কৈশিকী বৃত্তি শৃঙ্গার রসের অনুকূল ভাব প্রকাশে অনুসৃত হয়। প্রৌঢ় অর্থ প্রকাশক আরভটী বৃত্তি দম্ভ, মিথ্যাচার, ইন্দ্রজাল, অলৌকিক শক্তি প্রভৃতি ভাব প্রকাশে অনুসৃত হয়।

। সিদ্ধি।

অনুষ্ঠানকালে দর্শকদের অভিব্যক্তি থেকেই সিদ্ধির লক্ষণ বোঝা যায়। নাট্যশাস্ত্র মতে সিদ্ধি দুই প্রকার—দৈবী ও মানুষী। জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ ও অভিভূত দর্শকবৃন্দ

যখন স্তব্ধ ও অক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করেন তখন তাকে দৈবী সিদ্ধি বলা যায়। আর যখন দর্শকবৃন্দ অনুষ্ঠানের ঘটনা ও সংস্থাপনের গতির সাথে সঙ্গতি রেখে হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি উচ্ছাস সহকারে ব্যক্ত করেন, এবং প্রশংসাসূচক ধ্বনি বা করতালি দ্বারা আবেগ প্রকাশ করেন, অথবা উৎসাহ দেবার জন্য নটনটীদের পুরস্কার দান করেন, তখন তাকে মানুষী সিদ্ধি বলা যায়।

। অভিনয় ।

"তত্র ত্বভিনয়স্যৈব প্রাধান্যমিতি কথ্যতে।
আঙ্গিকো বাচিকস্তদাহার্য্যঃ সাত্ত্বিকোহপর ঃ ॥
চতুর্দ্ধাভিনয়স্তত্র আঙ্গিকোহঙ্গৈনির্দেশিত ঃ।
বাচা বিরচিতঃ কাব্যনাটকাদিষু বাচিক ঃ ॥
আহার্য্যো হারকেয়ূরবেষাদিভিরলঙ্কৃতি ঃ।
সাত্ত্বিকঃ সাত্তিকৈর্ভাবৈর্ভাবজ্ঞেন বিভাবিত ঃ ॥"

অভিনয় চার প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর যে চলন তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। কাব্য, নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস ঋগবেদ, ভাব সঞ্চারী। নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্র অলঙ্করণের অঙ্গসজ্জা, বসনভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আহার্য্য অভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে ভাবের সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী।

এই অভিনয়ভেদ নৃত্যকলার অন্যতম বিস্তৃত আলোচনাযোগ্য বিষয়। সেজন্য আলাদা ভাবে শ্রেণী ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

৫

আঙ্গিক অভিনয়

পূর্বেই বলা হয়েছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর চলনের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। এর উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ সমূহের মাধ্যমে এই অভিনয় হয়। শির, হস্তদ্বয়, বক্ষ, কটী, পার্শ্বদ্বয় ও পদদ্বয় এই ছয়টি প্রধান অঙ্গ। কেউ কেউ গ্রীবাকেও অঙ্গ বলে গন্য করেন। স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় এই ছয়টি প্রত্যঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রের মতে নেত্র, ভ্রূ, নাসা, অধর, কপোল ও চিবুক এই ছয়টি উপাঙ্গ। অভিনয়-দর্পণের মতে নেত্র, ভ্রূ, অক্ষিপুট, অক্ষিতারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, গণ্ডাস্থি, অধর, দণ্ডপঙক্তি, জিহ্বা, চিবুক, মুখ। মনে রাখতে হবে অঙ্গগুলির চলনেই প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি চালিত হয়।

আঙ্গিক অভিনয় আবার নাট্যশাস্ত্র মতে তিন প্রকার, ক) মুখজ খ) চেষ্টাকৃত ও গ) শারীর। মুখজ অভিনয় বলতে শির, চক্ষু প্রভৃতির বিভিন্ন সঞ্চালন ও প্রয়োগ বোঝায়। চেষ্টাকৃত অভিনয় বিভাগে হস্তাভিনয় প্রধান। আর বক্ষোদেশ, উদর, পার্শ্ব, কটী, উরু, জঙ্ঘা প্রভৃতির সঞ্চালন ও প্রয়োগের মাধ্যমে শারীর অভিনয়। প্রতীকধর্মী অঙ্গাভিনয় ভারতীয় নৃত্যকলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

। শিরকর্ম ।

"সমমুদ্বাহিতমধোমুখমালোলিতং ধুতম ॥
কম্পিতঞ্চ পরাবৃত্তমুৎক্ষিপ্তং পরিবাহিতম্।
নবধা কথিতং শীর্ষং নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥"

অভিনয় দর্পণের মতে সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত এই নয়টি শিরকর্ম। নাট্যশাস্ত্র মতে শিরকর্ম তের প্রকার, যথা আকম্পিত, ধুত, বিধুত, পরিবাহিত, উদ্বাহিতক, অবধুত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও লোলিত।

সম : স্বাভাবিক অবস্থায় শির নিশ্চল ভাবে থাকিলে তাহা সমশির অবস্থা। নৃত্যের আরম্ভে, জপের সূচনায়, গর্ব, কপটক্রোধ, স্তম্ভন ও নিষ্ক্রিয় ভাব প্রদর্শনে সমশিরের প্রয়োগ হয়।

উদ্বাহিত : ঊর্দ্ধদিকে মুখ উন্নত করলে উদ্বাহিত শির অবস্থা হয়। ধ্বজ, চন্দ্র, আকাশ, পর্বত, আকাশচারী বস্তু প্রভৃতি দর্শনের ভাব প্রকাশে উদ্বাহিত শিরের প্রয়োগ হয়।

অধোমুখ : নিম্নমুখে স্থিত অবস্থায় অধোমুখ শির হয়। লজ্জা, খেদ, প্রণাম, দুশ্চিন্তা, মূর্চ্ছা, পদতলে পতিত বস্তু প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অধোমুখ শিরের প্রয়োগ হয়।

আলোলিত : মণ্ডলাকারে চারিদিকে চঞ্চলভাবে শির চালনা করিলে আলোলিত শির হয়।
নিদ্রাবেশ, অসহনীয় অবস্থা, মূর্চ্ছা, মত্তাবস্থা, ভূতগ্রস্ত অবস্থা, উদ্দামতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশে আলোলিত শিরের প্রয়োগ হয়।

ধুত ঃ বাম ও দক্ষিণ দিকে শির চালনা করিলে ধুতশির হয়।
বিস্ময়, বিষাদ, অনিচ্ছা প্রকাশ, শীতার্ত, ভীত, মত্ত, নিষেধ, ক্রোধ ও অসহ্য ভাব প্রকাশে, নিজ অঙ্গ অবলোকন, অপরকে পাশ থেকে ডাকা প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ধুতশিরের প্রয়োগ হয়।

কম্পিত ঃ উপরে ও নীচে দ্রুতভাবে মস্তক সঞ্চালন করিলে কম্পিত শির হয়।
ক্রোধে, স্তব্ধ হও, প্রশ্নে, গণনায়, তর্জন, আবাহন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে কম্পিত শিরের প্রয়োগ হয়।

পরাবৃত্ত ঃ মস্তককে পিছন দিকে ফেরালে পরাবৃত্ত শির হয়।
ক্রোধ অথবা লজ্জায় মুখ ফেরানো, অনাদরে, কেশ-বন্ধনে, শর গ্রহণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পরাবৃত্ত শিরের প্রয়োগ হয়।

উৎক্ষিপ্ত ঃ প্রথমে পার্শ্বে ও পরে উর্দ্ধদিকে মস্তক চালনা করিলে উৎক্ষিপ্ত শির হয়।
স্বীকৃতি, অঙ্গীকার, এসো, যাও প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে উৎক্ষিপ্ত শিরের প্রয়োগ হয়।

পরিবাহিত ঃ দুই দিকে চামরের মত মস্তক সঞ্চালন করিলে পরি-বাহিত শির হয়।
মোহ, বিরহ, স্তুতি, সন্তোষ, অনুমোদন, বিচার, চিন্তা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পরিবাহিত শিরের প্রয়োগ হয়।

আকম্পিত ঃ শির ধীরে ধীরে উর্দ্ধ ও অধোদেশে সঞ্চালিত হইলে আকম্পিত শির হয়। ইহা সাধারণ ভাবে শিক্ষা দেওয়া,

প্রশ্ন করা, সম্বোধন-করা, নির্দ্দেশ দেওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

বিধুত ঃ বাম ও দক্ষিণ দিকে দ্রুত গতিতে আন্দোলিত অবস্থায় বিধুত শির হয়। মদ্যাসক্ত, শীতগ্রস্ত, ভীত ত্রস্ত ভাব প্রকাশ করে।

অঞ্চিত ঃ গ্রীবাদেশ পার্শ্বদেশে অল্প ঘোরা অবস্থায় নত হলে অঞ্চিত শির হয়। ব্যাধি, মূর্চ্ছা, উদ্বেগ, মত্ততা, বেদনার্ত ভাব, চিন্তা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

অবধুত ঃ শির নিম্নমুখে আক্ষিপ্ত অবস্থায় অবধুত শির হয়। দেবপ্রণাম, নিকটে আসিবার সঙ্কেত, সংবাদজ্ঞাপন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

নিহঞ্চিত ঃ স্কন্ধ উর্ধে উৎক্ষিপ্ত ও গ্রীবা পার্শ্বদেশে আনত অবস্থায় নিহঞ্চিত শির হয়। ইহা স্ত্রীলোকের পক্ষে আচরণীয়। গর্ব, মান, বিলাস, কৃত্রিম কোপ, নীরব স্নেহাভিব্যক্তি, ঔদাসিন্য ভাব প্রকাশ করে।

এই সকল শিরঃকর্ম ছাড়াও নাট্যশাস্ত্রের মতে লোক-স্বভাব অনুযায়ী শিল্পী বিভিন্ন শিরকর্মের ব্যবহার করতে পারেন।

। দৃষ্টি ।

"সমমালোকিতং সাচা প্রালোকিতনিমীলিতে।
উল্লোকিতানুবৃত্তে চ তথা চৈবাবলোকিতম্॥
ইত্যষ্টৌ দৃষ্টিভেদাঃ স্যুঃ কীর্ত্তিতা পূর্ব্বসূরিভিঃ।"

অভিনয়দর্পণের মতে সম, আলোকিত, সাচী, প্রলোকিত, মীলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত এই আট প্রকার দৃষ্টি-

ভেদ। নাট্যশাস্ত্রের মতে আট প্রকার রসদৃষ্টি। আট প্রকার স্থায়ী ভাব দৃষ্টি ও কুড়ি প্রকার সঞ্চারী ভাব দৃষ্টি অর্থাৎ মোট ছত্রিশ প্রকার দৃষ্টিভেদ আছে।

কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুতা, রৌদ্রী, বীরা ও বীভৎসা আটটি রসদৃষ্টি। স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা, বিস্মিতা—এই আটটি স্থায়ীভাব দৃষ্টি। শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্বিতা, গ্লানা, শঙ্কিতা, বিষন্না, মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিহ্মা, ললিতা, বিতর্কিতা, অর্দ্ধমুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, আকেকরা, বিকোশা, মদিরা ও ত্রস্তা—এই কুড়ি প্রকার সঞ্চারী ভাব দৃষ্টি।

সমদৃষ্টি ঃ স্বাভাবিক সৌম্যভাবযুক্ত দৃষ্টিকে সমদৃষ্টি বলে। নৃত্যের সূচনায়, তুলনায়, অন্যের চিন্তা নির্ণয়ে, প্রসন্ন স্মিতভাব, দেব প্রতিমা বর্ণন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে সমদৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

আলোকিত ঃ বিস্ফারিত-দর্শন ও চক্ষু তারকার সঞ্চালনে আলোকিত দৃষ্টি হয়। চক্রের আবর্তন, অনুরোধ, সকল বস্তু প্রদর্শন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে আলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

সাচী ঃ অপাঙ্গে তাকালে সাচীদৃষ্টি হয় অর্থাৎ মাঝখান থেকে চোখের পাশের দিকে টেরচা ভাবে দেখা। কার্য্যের সূচনা, ইঙ্গিত, বানের লক্ষ্য স্থির করা, স্মরণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সাচীদৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

প্রলোকিত ঃ উভয় দিকে দৃষ্টি চালনা করলে প্রলোকিত দৃষ্টি হয়।

উভয় পার্শ্বের বস্তু নির্দ্দেশে, বুদ্ধির জড়তা, তুলনা প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে প্রলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

মীলিত : অর্দ্ধবিকশিত দৃষ্টিকে মীলিত দৃষ্টি বলা হয়।
ধ্যান, জপ, সর্প, প্রার্থনা, নমস্কার, উন্মত্ততা, সুক্ষ্মদৃষ্টি প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে মীলিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

উল্লোকিত : উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উল্লোকিত দৃষ্টি হয়।
ধ্বজাগ্র-দর্শন, দেবমণ্ডল, উচ্চতা, জ্যোৎস্না, পূর্ব্বজন্ম প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে উল্লোকিক দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

অনুবৃত্ত : দ্রুতবেগে উপরে ও নীচে দৃষ্টি চালনা করিলে অনুবৃত্ত দৃষ্টি হয়।
ক্রোধ প্রদর্শন, প্রিয় আবাহণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অনুবৃত্ত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

অবলোকিত : নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে অবলোকিত দৃষ্টি হয়।
ছায়াদর্শন, চিন্তা, পরামর্শ, পাঠশ্রম, নিজ অঙ্গ অবলোকন প্রভৃতি ভাবপ্রকাশে অবলোকিত দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।

কান্তা : প্রণয়ানুভূতিতে চোখ কুঞ্চিত এবং তির্যকভাবে দর্শন-এর অবস্থায় কান্তা-দৃষ্টি। ইহাই রসদৃষ্টি কান্তা ও ভাবদৃষ্টি স্নিগ্ধা।

হাস্যা : এই অবস্থায় চোখের পাতা কুঞ্চিত, চোখের মনি গতিশীল ও অল্প দৃশ্যমান। ইহাই রসদৃষ্টি হাস্যা ও ভাবদৃষ্টি হৃষ্টা।

করুণা ঃ চোখের উপরের পাতা স্থির হয়ে নত অবস্থায় থাকবে, চোখের মণিও অচঞ্চল। দৃষ্টি ও স্থির, অশ্রুর আভাস। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি দীনা।

রৌদ্রী ঃ চোখের পাতা নিশ্চল, মনি বিক্ষুব্ধ ও লোহিতবর্ণ। ভ্রূকুঞ্চিত ও দৃষ্টি স্থির। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি রৌদ্রী ও ভাবদৃষ্টি ক্রুদ্ধা।

বীরা : চোখ সম্পুর্ণ খোলা থাকবে। চেখের মনি মাঝখানে বিক্ষুব্ধ ভাব প্রকাশ করবে ও দৃষ্টি উজ্জ্বল। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি বীরা ও ভাবদৃষ্টি দৃপ্তা।

বীভৎসা ঃ এক চেখের কোন সংকুচিত, অপর চোখ প্রায় বন্ধ। বিকর্ষণ জাতীয় অনুভূতিতে চোখের মণি অস্থির। চোখের পাতা অচঞ্চল থাকবে। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি বীভৎসা ও ভাবদৃষ্টি জুগুপ্সিতা।

ভয়ানকা ঃ চোখের পাতা নিশ্চল অবস্থায় কপালের দিকে উঠে থাকবে। চোখের মনি চঞ্চল। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি ভয়ানকা ও ভাবদৃষ্টি ভয়ান্বিতা।

অদ্ভুতা ঃ চোখের বাইরে কোনে পাতা একটু বেঁকে থাকবে। চোখের মনি সম্পুর্ণ দৃশ্যমান। এই অবস্থাই রসদৃষ্টি অদ্ভুতা ও ভাবদৃষ্টি বিস্মিতা।
উপরোক্ত এই ষোলটি রসদৃষ্টি ও স্থায়ীভাব দৃষ্টি। এ ছাড়া বলা হয়েছে সঞ্চারী ভাবদৃষ্টি কুড়িটি।

শূন্যা ঃ চোখের পাতা ও মনি স্বাভাবিক কিন্তু দৃষ্টি দুর্বল, গতিহীন ও প্রাণহীন। বহির্জগতের কোন কিছুই

যেন চোখে পড়ছে না। ইহা মানসিক অসামর্থ্যতা, উদ্বেগ, পক্ষাঘাত প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

মলিনা ঃ চোখের পাতা অচঞ্চল। দীপ্তিহীন অর্ধানিমীলিত দৃষ্টি। ইহা রক্তহীনতা, ক্লান্তি, গভীর বেদনা, অনুৎসাহ, বিবর্ণতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

শ্রান্তা ঃ চোখের মনি গতিহীন। চোখের পাতা যেন অবসাদ-ভারে বুজে আসছে। ইহা চিন্তাক্লিষ্ট, শ্রমক্লান্ত প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

লজ্জান্বিতা ঃ দৃষ্টি নীচের দিকে নিবদ্ধ, চোখের পাতা অল্প অবনত হয়ে যেন নেমে আসছে। ইহা লজ্জা ভাব প্রকাশ করে।

গ্লানা ঃ চোখের মনি যেন শ্রান্তিতে কাতর। ভ্রূ ও চোখের পাতা অল্প কাঁপবে। ইহা রোগ, দুর্বলতা, শ্রমজনিত আলস্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

শঙ্কিতা ঃ সতর্ক দৃষ্টি কখনো স্থির কখনো কম্পিত হয়ে চারিদিক দেখছে। চোখের পাতা মাঝে মাঝে তির্যকভাবে ওপরে উঠবে। ইহা আশংকা; শংকিত ভাব প্রকাশ করে।

বিষন্না ঃ চোখের পাতা স্থির, মনি নীচের দিকে নিশ্চল। দৃষ্টি দীপ্তিহীন। ইহা গভীর বেদনা, শোকার্তভাব প্রকাশ করে।

মুকুলা ঃ চোখের পাতা অল্প কাঁপবে। দৃষ্টিতে আবেগময়

অনুজ্জলতা। ইহা ঘুম, স্বপ্নদর্শন, সুখাবিষ্ট ভাব প্রকাশ করে।

কুঞ্চিতা : চোখের পাতা কোনের দিকে বাইরে কুঁচকে থাকবে। দৃষ্টি তির্য্যক। ইহা ঈর্ষা, অবাঞ্ছিত বস্তু, কষ্ট করে দেখা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

অভিতপ্তা : চোখের পাতা ও মনি অল্প অল্প কম্পিত হবে। দৃষ্টি দীপ্তিহীন। ইহা বিপদ, আকস্মিক আঘাত, উৎসাহভঙ্গ-জনিত দুঃখ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

জিহ্মা : চোখের পাতা কুঁচকে অল্প ঝুলে থাকবে। দৃষ্টিচকিত তির্য্যক। ইহা ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

ললিতা : উজ্জ্বল প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি। ভ্রূ অল্প নড়বে। চোখের কোনের শেষাংশ অল্প কুঞ্চিত হয়ে মধুর অনুভূতি প্রকাশ করবে। ইহা আনন্দের উজ্জ্বলতা, ভোগ, প্রীতি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিতর্কিতা : চোখের পাতা সম্পূর্ণভাবে উপরের দিকে উঠবে। চোখের মনি সঞ্চরণশীল ও সম্পূর্ণ দৃশ্যমান। ইহা স্মরণ করা, কল্পনায় কিছু দেখার চেষ্টা করা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

অর্ধমুকুলা : চোখ তৃপ্তির আবেশে অর্ধমুদিত। অল্প সঞ্চরণশীল চোখের মনি। ইহা সুগন্ধের ঘ্রাণ, সুখদ স্পর্শের অনুভূতির আনন্দ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিভ্রান্তা : প্রসারিত দৃষ্টি। চোখের পাতা ও মনি চঞ্চল। ইহা

উদ্‌ভ্রান্তি, উত্তেজনা, কি করা কর্তব্য এই চিন্তা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

আকেকরা ঃ অর্ধমুদিত চক্ষু, শেষ প্রান্ত অল্প কুঞ্চিত। চোখের মনি যেন চঞ্চলতা দমন করে স্থির হতে চাইছে। ইহা বস্তুর পৃথকীকরণ, দূরের জিনিসের স্বরূপ নির্ণয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিপ্লুতা ঃ চোখের পাতা প্রথমে কম্পমান অবস্থা থেকে নিশ্চল হয়ে আসবে। পাতা নিশ্চল হওয়ার সাথে সাথে চোখের মণি চঞ্চল হয়ে উঠবে। ইহা অপ্রকৃতিস্থতা, বিমূঢ়তা, বিরক্তি প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

বিকোশা ঃ চোখের পাতা ও মণি অচঞ্চল ও স্থির। দৃষ্টি নিথর অথচ উজ্জ্বল। পূর্ণদৃষ্টি, ঘৃণা, গর্ব, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

ত্রস্তা ঃ খোলা চোখ বিস্ফারিত। চোখের মণি কম্পমান। ইহা ভয়, আতঙ্ক প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

মদিরা ঃ মত্তাবস্থায় বিভিন্ন অবস্থায় এর ভাব। কম নেশায় চোখ টেনে তাকানো। নেশা কিছু গাঢ় হলে চোখ ভারী হয়ে আসবে। নেশা আরো তীব্র হলে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে। চোখের ভিতরের কোণ কুঁচকে থাকবে। চোখের মণি প্রায় দেখা যাবে না। এই দৃষ্টিগুলি চোখের মাণ, পাতা, ভ্রূ প্রভৃতির পরিপূরক সঞ্চালনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবের সার্থক রূপদান করে।

। তারাকর্ম ।

"ভ্রমণং বলনং পাতঃ চলনং সম্প্রবেশনম্।
নিবর্ত্তনং সমুদ্বৃত্তং নিষ্ক্রামং প্রাকৃতং তথা॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে ভ্রমণ, বলন, পাতন, চলন, সম্প্রবেশন, নিবর্ত্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিষ্ক্রামণ ও প্রাকৃত এই নয় প্রকার তারাকর্ম প্রচলিত।

তারাদ্বয় মণ্ডলাকারে ঘুরিলে ভ্রমণ, ত্রিকোণাকারে ঘুরিলে বলন, নীচের দিকে তারার বিশ্রান্ত ও ত্রস্ত ভাব হইলে পাতন, তারার দ্রুত কম্পনা হইলে চলন, তারা ভিতরের দিকে আকর্ষিত হইলে সম্প্রবেশন। তারা তির্যক কটাক্ষপাত করিলে নিবর্তন, তারাদ্বয় বাম হইতে দক্ষিণে সমুন্নত অবস্থ্যায় চঞ্চল হইলে সমুদ্বৃত্ত, তারাদ্বয় সামনের দিকে দীপ্তভাবে বহির্গত হইলে নিষ্ক্রামণ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রাকৃত অবস্থা বলা হয়।

সাধারণভাবে শৌর্য, বীর্য, ক্রোধ প্রকাশে অর্থাৎ বীর ও রৌদ্ররসে ভ্রমণ, চলন, সমুদ্বৃত্ত ও নিষ্ক্রামণ-এর প্রয়োগ হয়। চলন ও নিষ্ক্রামণ ভয় বুঝাইতেও প্রয়োগ হয়। হাস্য ও বীভৎস রসে সম্প্রবেশন, শৃঙ্গার রসে নিবর্ত্তন, করুণ রসে পাতন ও অদ্ভুত রসে নিষ্ক্রামণ এর প্রয়োগ হয়। স্বাভাবিক প্রাকৃত সব রসেই প্রয়োগ হয়ে থাকে।

। **পুটকর্ম** ।

"উন্মেষশ্চ নিমেষশ্চ প্রসৃতং কুঞ্চিতং সমম্।
বিবর্ত্তিতং চ স্ফুরিতং পিহিতং চ বিলোলিতম্॥"

নাট্যশাস্ত্রমতে উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিত, সম, বিবর্তিত, স্ফুরিত, পিহিত ও বিলোলিত এই নয় প্রকার পুটকর্ম প্রচলিত।

পুটদ্বয় বিশ্লিষ্ট অবস্থায় উন্মেষ, সংযুক্ত অবস্থায় নিমেষ, পুটদ্বয়ের মধ্যে বিস্তৃত ব্যবধান থাকিলে প্রসৃত, সঙ্কুচিত অবস্থায় কুঞ্চিত, স্বাভাবিক অবস্থায় সম, উদ্বৃত্ত অবস্থায় বিবর্তিত, কম্পমান অবস্থায় স্ফুরিত ও আহত অবস্থায় বিলোলিত ভাব প্রকাশ করে।

উন্মেষ, নিমেষ ও বিবর্তিত ক্রোধ প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। ঘ্রাণ গ্রহণ, স্পর্শ বুঝাইতে কুঞ্চিত ; বিস্ময়, আনন্দ ও বীর ভাব প্রকাশে প্রসৃত ; রতি ভাব প্রকাশে সম, ঈর্ষা প্রকাশে স্ফুরিত ; সুপ্তি, মূর্চ্ছা,

উষ্ণতা, ঝড়, বর্ষা, চক্ষুপীড়া প্রভৃতি প্রকাশে পিহিত ও আহত ভাব প্রকাশে বিলোলিত এর প্রয়োগ হয়।

। ভ্রূ কর্ম ।

"উৎক্ষেপপাতনং চৈব ভ্রূকুটি চতুরং ভ্রূবাঃ।
কুঞ্চিতং রেচিতং কর্ম সহজং চেতি সপ্তধা॥"

নাট্যশাস্ত্রমতে উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রূকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ এই সাত প্রকার ভ্রূকর্ম আঙ্গিকাভিনয়ে প্রচলিত।

ভ্রূদ্বয়ের একই সাথে অথবা পর পর সমুন্নত অবস্থাকে উৎক্ষেপ বলা হয়। হাব, হেলা, লীলা, কোপ, বিতর্ক, দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি বুঝাইতে সাধারণতঃ একটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং বিস্ময়, হর্ষ, ক্রোধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশে একযোগে দুইটি ভ্রূ-ই উৎক্ষিপ্ত হয়। নীচের দিকে একই সাথে দুটি ভ্রূ নত হলে পাতন হয় এবং ইহা হাস্য, ঘ্রাণ, অসূয়া, জুগুপ্সা ভাব রূপায়ণে প্রযুক্ত হয়। মূল থেকে ভ্রূদ্বয় উৎক্ষিপ্ত হলে ভ্রূকুটি হয় এবং ইহা ক্রুদ্ধ ভাব প্রকাশ করে। ভ্রূদ্বয় মধুর ভাবে সঞ্চালিত হইয়া আয়ত হইলে চতুর হয় এবং ইহা শৃঙ্গার, লালিত্য, সৌম্য, সুখস্পর্শ, প্রবোধদান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। একটি অথবা উভয় ভ্রূকে বঙ্কিম করিলে কুঞ্চিত ভ্রূ হয় এবং ইহা স্নেহ, স্মিতভাব, গর্ব কৃত্রিম ভাব প্রকাশ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। কুঞ্চিত ভ্রূ মহিলা শিল্পীদের জন্য বিশেষভাবে নির্দ্দেশিত। সৌষ্ঠবযুক্ত ও ললিতভাবে একটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হইলে রেচিত হয় এবং নৃত্যে ইহার প্রয়োগ অধিক প্রচলিত। স্বাভাবিক ভ্রূ কর্মকে সহজ বলা হয় এবং সকল স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে ইহার প্রয়োগ হয়।

। নাসাকর্ম ।

"নতা মন্দা বিকৃষ্টা চ সোচ্ছাসানুবিকূনিতা।
স্বাভাবিকী হৃদি বুধৈঃ ষড়বিধা নাসিকাস্মৃতা॥"

নাট্যশাস্ত্রমতে নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছাসা, বিকুনিতা ও স্বাভাবিকী এই ছয় প্রকার নাসাকর্ম প্রচলিত।

নাসাপূট মুহুর্মুহু সংশ্লিষ্ট হইলে নতা এবং ইহা বিষাদ ও মৃদু রোদন অর্থ প্রকাশ করে। নাসাপুট স্থির অবস্থায় মন্দা এবং নির্বেদ, চিন্তা ও ঔৎসুক্য ভাব প্রকাশ করে। নাসাপুট স্ফুরিত অবস্থায় বিকৃষ্টা এবং ইহা শ্বাসগ্রহণ, ক্রোধ, ভয়, দুর্গন্ধ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। নাসারন্ধ্র সঙ্কুচিত করে বাতাস গ্রহণকালে সোচ্ছাসা এবং ইহা দীর্ঘনিশ্বাস, সুগন্ধি ঘ্রাণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। নাসা কুঞ্চন করিলে বিকুনিতা এবং ইহা কৌতুক, ঈর্ষা, জুগুপ্সা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় স্বাভাবিকী নাসা এবং ইহা সকল স্বাভাবিক ভাব প্রকাশ করে।

। গণ্ডকর্ম।

"ক্ষামং ফুল্লং চ পূর্ণং চ কম্পিতং কুঞ্চিতং সমম্।
ষড়বিধং গণ্ডমুদ্দিষ্টমস্য লক্ষণমুচ্যতে॥"

নাট্যশাস্ত্রমতে ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ, কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম এই ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম প্রচলিত।

ভারাবনত অবস্থাকে ক্ষাম বলা হয় এবং ইহা বিষাদ ভাব প্রকাশ করে। বিকশিত উৎফুল্ল অবস্থানকে ফুল্ল এবং ইহা আনন্দ প্রকাশ করে। উদ্ধত অবস্থাকে পূর্ণ এবং ইহা গর্ব ও উৎসাহ ভাব প্রকাশ করে। কম্পমাণ অবস্থাকে কম্পিত এবং ইহা ক্রোধ ও হর্ষাতিশয্য ভাব প্রকাশ করে। সঙ্কুচিত অবস্থাকে কুঞ্চিত এবং ইহা শীতার্ততা, ভয়, জ্বর, উষ্ণ স্পর্শ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। স্বাভাবিক অবস্থায় সম গণ্ডের প্রয়োগ।

। অধর কর্ম।

"বিকর্তনং কম্পনং চ বিসর্গো বিণিগুণহম্।
সংদষ্টকং সুমুদ্রশ্চ ষড়কর্মাণ্যধরস্য তু॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে বিকর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগুহণ, সংদষ্ট ও সমুদ্গক এই ছয় প্রকার অধরকর্ম প্রচলিত।

সঙ্কুচিত অবস্থায় বিকর্ত্তন এবং ইহা বেদনা, অবজ্ঞা, অস্বাচ্ছন্দ্য, অসূয়া প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। কম্পমান অবস্থায় কম্পন এবং ইহা ক্রোধ, ভয়, দুর্বলতা, জয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ললিত সংবদ্ধ অবস্থায় বিসর্গ এবং ইহা রমণীর বিলাস, চুম্বন, উপেক্ষা, রঞ্জনা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। অধর দষ্ট অবস্থায় সংদষ্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে। গোলাকৃতি অবস্থায় সমুদ্গক এবং ইহা অভি-নন্দন জ্ঞাপন, দেহচাঞ্চল্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

। চিবুক কর্ম ।

"কুট্টনং খণ্ডনং ছিন্নং চিকিতং লেহনং সমম্।
দষ্টং চ দন্তক্রিয়য়া চিবুকস্ত্বেহ বক্ষ্যতে ॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চিকিত, লেহন, সম ও দষ্ট এই সাত প্রকার চিবুক কর্ম প্রচলিত।

দন্ত সংঘর্ষিত অবস্থায় কুট্টন এবং ইহা ভয়, শীত, জ্বর ও ক্রোধ-গ্রস্ততা ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় পুনঃপুন পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে এবং দন্ত বিযুক্ত অবস্থায় থাকিলে খণ্ডন এবং ইহা প্রার্থনা, বিবাদ, আগমন, অধ্যয়ন, আলাপ, ভক্ষণ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত অবস্থায় ছিন্ন এবং ইহা মৃত্যু, ব্যাধিভয়, শীতার্ততা, ব্যায়াম প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় দূরে বিচ্যুত অবস্থায় চিকিত এবং জৃম্ভণে প্রযুক্ত হয়। জিহ্বার দ্বারা লেহিত অবস্থায় লেহন এবং ইহা লোভ ও বিমূঢ় ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠ দংশিত অবস্থায় দষ্ট এবং ইহা ক্রোধ প্রকাশ করে। ওষ্ঠদ্বয় অল্প বিবৃত অবস্থায় সম এবং ইহা স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়।
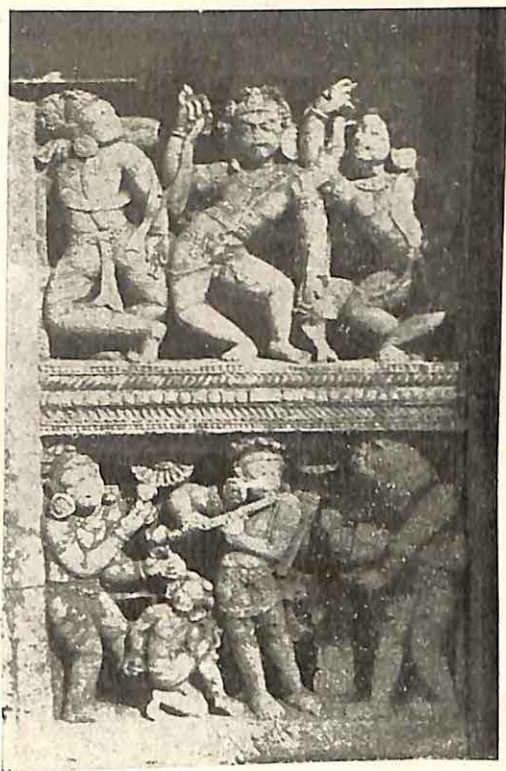
ভুবনেশ্বর মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্যছন্দ
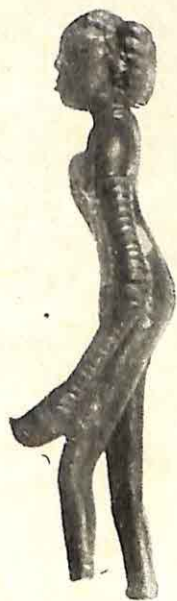
নৃত্যশীলা নারী মূর্তি

মহেঞ্জোদারো ।

খৃঃপূঃ ৪০০০-৩০০০

(স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সৌজন্যে)

বিহু
আসাম ।

কারগম
তামিলনাদ ।

ভাঙ্গরা নৃত্য
পাঞ্জাব ।

লোকনৃত্য
উড়িষ্যা ।

লোকনৃত্য ।

। গ্রীবাকর্ম ।

"সমা নতোন্নতা ত্রস্রা রেচিতা কুঞ্চিতাঞ্চিতা।
বলিতা চ নিবৃত্তা চ গ্রীবা নববিধার্থতঃ॥"

নাট্যশাস্ত্র মতে সমা, নতা, উন্নতা, ত্রস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা অঞ্চিতা, বলিতা ও নিবৃত্তা এই নয় প্রকার গ্রীবাকর্ম প্রচলিত। অভিনয় দর্পণের মতে সুন্দরী, তিরশ্চীনা, পরিবর্তিতা ও প্রকম্পিতা এই চার প্রকার গ্রীবাকর্ম।

সমা অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থানে গ্রীবা প্রার্থনা, ধ্যান প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। নত অবস্থানে নতা গ্রীবা অলঙ্কার বন্ধন, ভূমিতে পতিত বস্তুদর্শন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। উন্নত অবস্থানে উন্নতা গ্রীবা হারকেয়ূরাদি বন্ধন, উর্ধ্বে স্থিত বস্তু দর্শন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। কম্পিত ও আন্দোলিত অবস্থায় রেচিতা গ্রীবা লালিত্য, ভাব উপলব্ধি ও নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। শিরসহ আনত অবস্থায় কুঞ্চিতা গ্রীবা ভারবহন, গ্রীবারক্ষণ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। সম্মুখভাগে প্রসারিত অবস্থায় অঞ্চিতা গ্রীবা ব্যগ্রতা, কেশবিন্যাস প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। পশ্চাৎভাগে অপসারিত অবস্থায় বলিতা গ্রীবা পিছনের বস্তুদর্শন ভাব প্রকাশ করে। যুগপৎ সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগে আন্দোলিত অবস্থায় নিবৃত্তা গ্রীবা পক্ষীগ্রীবা ভঙ্গী বর্ণনা, বিশেষ দৃষ্টি সংস্থাপন প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

তির্যক ভঙ্গীতে সঞ্চালিত গ্রীবাকে সুন্দরী গ্রীবা বলে। স্নেহ ভাব, যত্ন, বিস্তার, সন্তোষ ও অনুমোদন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ইহার প্রয়োগ। উভয় পার্শ্বে উর্ধ্ব দিকে সর্পগতিতে সঞ্চালিত গ্রীবাকে তিরশ্চীনা গ্রীবা বলে। সর্পগতি প্রদর্শন এই ভাব ইহা প্রকাশ করে। গ্রীবা অর্ধচন্দ্রাকারে বাম ও ডান দিকে সঞ্চালিত হলে পরিবর্তিত গ্রীবা হয়। শৃঙ্গার রসযুক্ত লাস্য নৃত্যে ও কান্তার গণ্ডদ্বয় চুম্বন বুঝাতে ইহার প্রয়োগ হয়। সামনে ও পিছনদিকে অল্প

সঞ্চালিত কম্পিত গ্রীবাকে প্রকম্পিত গ্রীবা বলা হয়। লোক নৃত্যে ও দোলন প্রভৃতি ভাব প্রকাশে ইহা প্রযুক্ত হয়।

। আস্যকর্ম।

নাট্যশাস্ত্রমতে বিনিবৃত্ত, বিধুত, নিভু্র্গ্ন, ভুগ্ন, বিবৃত ও উদ্বাহিত এই ছয় প্রকার আস্যকর্ম্ম প্রচলিত। অসূয়া, ঈর্ষা, কোপ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি ভাব প্রকাশে বিনিবৃত্ত প্রযুক্ত হয়। তির্যক ও আয়ত অবস্থায় বিধূত মুখ নিষেধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। নিম্নমুখ অবস্থায় নিভু্র্গ্ন মুখ গাম্ভীর্য প্রকাশ করে। কিঞ্চিৎ আয়ত অবস্থায় ভুগ্ন মুখ নির্বেদ, চিন্তা, উৎসুক্য, লজ্জিত ভাব প্রকাশ করে। ওষ্ঠ বিশ্লিষ্ট অবস্থায় বিবৃত মুখ হাস্য, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। আক্ষিপ্ত অবস্থায় উদ্বাহিত মুখ রমণীগণের লীলা, বিলাস, গর্ব, কপট ক্রোধ প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে।

। মুখরাগ।

"আয়তো মুখরাগস্ত চতুর্দ্ধা স চ কীর্ত্তিতঃ।
স্বাভাবিকঃ প্রসন্নশ্চ রক্তঃ শ্যামোহর্থসংশ্রয়ঃ॥"

স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত ও শ্যাম এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচলিত। স্বাভাবিক ভাব প্রকাশে স্বাভাবিক মুখরাগ কোন বিশেষ ভাব প্রকাশের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। প্রসন্ন মুখরাগ আনন্দ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করে। শৌর্য, বীর্য, ক্রোধ, অসহ দুঃখ, উন্মত্ত ভাব প্রকাশে রক্তবর্ণ মুখরাগ এবং জুগুপ্সা ও ভয় বুঝাতে শ্যাম মুখরাগ প্রযুক্ত হয়।

। চারী।

জঙ্ঘা, উরু, কটি ও পদের যুগপৎ সঞ্চালনকে চারী বলে। নাট্যশাস্ত্রের মতে চারী দুই প্রকার—ভৌম ও আকাশিকী। সমপাদা, স্থিতাবর্তা, শকটাস্যা, বিচ্যবা, অধ্যর্ষিকা, চাষগতি, এলকাক্রীড়িতা,

সমোৎসারিতমণ্ডলী, মণ্ডলী, উৎসন্দিতা, অড্ডিতা, স্যন্দিতা, অপস্যন্দিতা, বদ্ধা, জণিতা ও উরুদ্বৃত্তা—এই ষোলটি ভৌম চারী। অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, মৃগপ্লুতা, উধ্বর্জানু, অলাতা, সুচী, নূপুরপাদিকা, দোলাপাদা, দণ্ডপাদা, বিদ্যুদ্ভ্রান্তা, ভ্রমরী, ভুজঙ্গত্রাসিতা, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা ও উদ্বৃত্তা—এই ষোলটি আকাশিকা চারী। অভিনয় দর্পণে আট প্রকার চারীভেদের উল্লেখ আছে যথা চলন, চঙ্ক্রমণ, সরণ, বেগিনী, কুট্টন, লুঠিত, লোলিত, বিষমসঞ্চর। এই আট প্রকার চারীর সাথে নাট্যশাস্ত্রোক্ত চারীগুলির সাদৃশ্য নেই।

। করণ ।

নাট্যশাস্ত্রের মতে "হস্তপাদসমাযোগো নৃত্তস্য করণং ভবেৎ।" অর্থাৎ হস্ত ও পদের পারস্পরিক সহযোগে করণ হয়। একশো আটটি করণের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা, তলপুষ্পপুট, বর্তিত, বলিতোরু, অপবিদ্ধ, সমনখ, লীন, স্বস্তিকরেচিত, মণ্ডলস্বস্তিক, নিকুট্টক, অর্দ্ধনিকুট্টক, কটিচ্ছি, অর্ধরেচিত, বক্ষস্বস্তিক, উন্মত্তস্বস্তিক, পৃষ্ঠস্বস্তিক, দিকস্বস্তিক, অলাত, কটিসম, অঞ্চিত, আক্ষিপ্তরেচিত, বিক্ষিপ্তাক্ষিপ্তক, অর্ধস্বস্তিক, ভুজঙ্গত্রাসিত, উধ্বর্জানু, নিকুঞ্চিতা, মত্তল্লি, অর্ধমত্তল্লি, রেচকনিকুট্টিত, পাদাপবিদ্ধক, বলিত, চূর্ণিত, ললিত, দণ্ডপক্ষ, ভুজঙ্গত্রস্তরেচিত, নূপুর, বৈশাখরেচিত, ভ্রমরক, চতুর, ভুজঙ্গাঞ্চিতক, দণ্ডকরেচিত, বৃশ্চিককুট্টিত, কটিভ্রান্ত, লতাবৃশ্চিক, ছিন্ন, বৃশ্চিকরেচিত, বৃশ্চিক, ব্যংসিত, পার্শ্বনিকুট্টন, ললাটতিলক, ক্রান্তক, কুঞ্চিত, চক্রমণ্ডল, উবোমণ্ডল, আক্ষিপ্ত, তলবিলাসিত, অর্গল, বিক্ষিত, আবৃত্ত, দোলপাদ, বিবৃত্ত, বিনিবৃত্ত, পার্শ্বক্রান্ত, নিশুম্ভিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, অতিক্রান্ত, বিবর্তিক, গজক্রীড়িতক, তলসংস্ফোটিক, গরুড়প্লুতক, গণ্ডসুচী, পরিবৃত্ত, পার্শ্বজানু, গৃধ্রাবলীনক, সন্নত, সুচী, অর্ধসুচী, সুচীবিদ্ধ, অপক্রান্ত, ময়ূরললিত, সর্পিত, দণ্ডপাদ, হরিণপ্লুত, প্রেঙ্খোতিলক, নিতম্ব, স্খলিত, করিহস্তক, প্রসর্পিতক,

সিংহবিক্রীড়িত, সিংহাকর্ষিত, উদ্বৃত্ত, অপসৃতক, তলসংঘট্টিত, জণিত, অপহিথ্থক, নিবেশ, এলকাক্রীড়িত, উরুবৃত্ত, মদস্খলিতক, বিষ্ণুক্রান্ত, সম্ভ্রান্ত, বিস্কম্ভ, উদ্ধট্টিত, বৃষভক্রীড়িত, লোলিতক, নাগোপসর্পিত, শকটাস্য ও গঙ্গাবতরণ।

চারী, করণ, খণ্ড, মণ্ডল এগুলি পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গিজড়িত। হস্তকর্মের সঙ্গে গতির অনুকরণাত্মক অভিনয়ে বিভিন্ন পাদভেদে বিভিন্ন চরণকর্মের রূপায়ণে এগুলির প্রয়োগ অপরিহার্য। পাদ, জঙ্ঘা, উরু, ও কটি যুগপৎ বিচিত্রভাবে চালিত হলে চারী হয়। অর্থাৎ একপাদের প্রচারে চারী, দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ আবার করণসমূহের সংযোগে খণ্ড এবং কয়েকটি খণ্ডের সংযোগে হয় মণ্ডল। অভিনয় দর্পণের মতে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে শরীর সংস্থাপনের নাম মণ্ডল। স্থানক, আয়ত, আলীঢ়, প্রেঙ্খন, প্রেরিত, প্রত্যালীঢ়, স্বস্তিক, মোটিত, সমসূচী ও পার্শ্বসূচী এই দশটি মণ্ডলভেদ। নাট্যশাস্ত্রে মণ্ডলভেদ ভিন্নরূপ যথা ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবর্ত, সমোৎসারিত, এড়কাক্রীড়িত, অড্ডিত, শকটাস্য, অধ্যর্ধক, পিষ্টকুট ও চাষগত। নাট্যশাস্ত্রে এগুলির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

"এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া ঊর্বো কটয়াস্তথৈব চ।
সমানকরণাচ্চেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে ॥"

পাদ, জঙ্ঘা, উরু ও কটি এই অঙ্গগুলির সহযোগে যেমন চারী আবার তেমনি এই করণ, খণ্ড ও মণ্ডল এই সকল কর্মই চারীর সংযোগে গঠিত।

"একপাদপ্রচারো যঃ সা চারীত্যভিসংজ্ঞিতা।
দ্বিপাদক্রমণং যত্তু করণং নাম তদ্ভবেৎ ॥
করণাণাং সমাযোগাৎ খণ্ডমিত্যভিধীয়তে।
খণ্ডৈঃ ত্রিভিশ্চতুর্ভিবা সংযুক্তং মণ্ডলং ভবেৎ ॥
চারিভিঃ প্রস্তুতং নৃত্তং চারিভিশ্চেষ্টিতং তথা।
চারিভিঃ শাস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্যো যুদ্ধে চ কীর্তিতাঃ ॥"

তাহলে দেখা যাচ্ছে এক পায়ের প্রচেষ্টায় চারী ও দুই পায়ের প্রচেষ্টায় করণ। আবার ছয় থেকে নয়টি করণের সমাবেশে অঙ্গহারের সৃষ্টি। সুতরাং এই সকল কর্মের মধ্যেই চারীর প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

"ষড়ভির্বা সপ্তভির্বাপি অষ্টভির্ণবভিস্তথা।
করণৈরিহ সংযুক্তা অঙ্গহারাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অঙ্গহারের সংখ্যা বত্রিশঃ স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, সুচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্তক, উদ্‌ঘট্টিত, বিস্কম্ভ, অপরাজিত, বিস্কম্ভাপসৃত, মত্তাক্রীড়, স্বস্তিকরেচিত, বৃশ্চিক, ভ্রমর, মত্তস্খলিতক, মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন, পরিহৃত্তরেচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, অলাতক, পার্শ্বচ্ছেদ, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্ত, উদ্ধৃতক, আলীঢ়, রেচিত, আচ্ছুরিত, আক্ষিপ্তরেচিত, সম্ভ্রান্ত, উপসার্পিত, অর্ধনিকুট্টক।

। স্থান।

পাদবিন্যাসের ভেদে স্থানক বা স্থান নির্দিষ্ট হয়। বিবিধ প্রকার দাঁড়ানোর ভঙ্গীকে স্থান বলে। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী পুরুষদের জন্য বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ়, ও প্রত্যালীঢ় এই ছয়টি এবং স্ত্রীলোকদের জন্য আয়ত, অবহিত্থা, অশ্বক্রান্তা ও চতুরস্র এই চারিটি স্থানের নির্দেশ আছে। অভিনয় দর্পণের মতে সমপাদ, একপাদ, নাগবন্ধ, ঐন্দ্র, গারুড় ও ব্রহ্মস্থান এই ছয় প্রকার স্থান প্রচলিত। নাট্যশাস্ত্রে স্থান নির্দেশে তাল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; এক্ষেত্রে তাল অর্থে মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত হলে যে বিস্তৃতি ঘটে সেই পরিমিত স্থান বুঝতে হবে।

বৈষ্ণব ঃ পদদ্বয়ের মধ্যে আড়াই তাল ব্যবধান। জানু নমিত হওয়ায় জঙ্ঘা কিছুটা বক্র অবস্থায় থাকবে। এক পায়ের অবস্থান স্বাভাবিক অপর পায়ের অবস্থান তির্যক। অঙ্গে সৌষ্ঠব। ইহার অধিদেবতা বিষ্ণু।

কথাকলি নৃত্যে এই বক্রজানু বৈষ্ণব স্থানের বেশী প্রয়োগ দেখা যায়।

সুদর্শনচক্র ত্যাগ, ধানুকীর ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, তিরস্কার, ভ্রম, দুঃখ, সন্দেহ, ঈর্ষা, নৃশংসতা, অভয়দান প্রভৃতি ভাব প্রকাশে এর প্রয়োগ। সাধারণতঃ শৃঙ্গার ও বিস্ময় রসে এর প্রয়োগ।

সমপাদ ঃ পদদ্বয় সমভাবে ভূমিতে স্থাপিত। দুইটি পদ সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে, অঙ্গুলিগুলি সম্মুখে। দুই পায়ের মধ্যে ব্যবধান হবে এক তাল। অবস্থান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহার অধিদেবতা ব্রহ্মা।

পুষ্পকরথ চালনা, ব্রাহ্মণ ও দেবতার আশীর্বাদ গ্রহণ, বিবাহোৎসবে বরবধূর আচার অনুষ্ঠানে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে, উৎসবে, যোগদানে, পাখীর অনুকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয়।

বৈশাখ ঃ পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সাড়ে তিন তাল। অঙ্গুলিগুলি দুই পাশে তির্যকভাবে থাকবে। অবস্থান স্থির। ইহার অধিদেবতা কার্তিকেয়।

ধনুতে জ্যারোপন, অশ্বারোহন, ব্যায়াম, নির্গমন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই স্থানের ব্যবহার।

মণ্ডল ঃ পদদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান চারতাল। কটি ও জানু সম। পদদ্বয় ত্রস্র ও পক্ষস্থিত। ইহার অধিদেবতা ইন্দ্র।

বজ্রনিক্ষেপ, শরত্যাগ, গজপৃষ্ঠে আরোহণ প্রভৃতি রাজসিক আচরণে এই স্থান এর প্রয়োগ হয়।

আলীঢ় ঃ বাম উরু নিশ্চলভাবে অবস্থান করবে ; বাম পদ থেকে পাঁচতাল ব্যবধানে দক্ষিণ পদ স্থাপিত। উভয় পদই ত্রস্র। ইহার অধিদেবতা রুদ্র।

ভয়ানক ও বীররসের ক্ষেত্রে এই স্থানের প্রয়োগ অপরিহার্য। মল্লযুদ্ধ, আক্রমণে, বর্শানিক্ষেপ, প্রস্তর নিক্ষেপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই স্থানের প্রয়োগ হয়।

প্রত্যালীঢ় ঃ দুই পায়ের ব্যবধান পাঁচতাল। দক্ষিণ পদ কুঞ্চিত ও বামপদ প্রসারিত। ইহা বিভিন্ন অস্ত্রত্যাগ এর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।

স্ত্রীলোকদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে চারটি অবস্থানের নির্দেশ আছে।

আয়ত ঃ ডান পা সম অবস্থানে ও বাঁম পা ত্রস্র বা তির্য্যক অবস্থান। বামদিকে কোমর প্রস্থত ও প্রকট হবে। মঞ্চে প্রথম আবির্ভাবের সময় সাধারণতঃ এই স্থানের ব্যবহার হয়। এ ছাড়া প্রত্যাখান, পর্যবেক্ষণ, অনুমোদন না করা, চিন্তা পরিহার করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেখা যায়। আবার বিভিন্ন ভঙ্গীমাযুক্ত হয়ে পুষ্পবৃষ্টি করা, ক্রোধে আঙ্গুল মটকানো, গর্ব প্রকাশ, গাম্ভীর্য, অসন্তোষ, দিগন্ত-পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আয়ত-স্থানের ব্যাপক প্রয়োগ হয়।

অবহিত্থা ঃ বাম পা সম অবস্থায় ও ডান পা ত্রস্র অবস্থায় থাকবে। বাঁ দিকের কোমর স্বল্প প্রস্থত ও প্রকট।

স্বাভাবিক ভাবে কথোপকথনকালে স্ত্রী চরিত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট। শৃঙ্গার ও অনুরূপ রসও ভাবের ক্ষেত্রে এই স্থান বিশেষ প্রযোজ্য। এছাড়া প্রফুল্লতা, প্রসন্নতা, উদ্বেগ, অনুমান, প্রণয়াসক্তি, প্রমোদ, প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দেখা যায়।

অশ্বক্রান্তা : কিছু অবলম্বন করে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গী। এক পা তোলা থাকবে, অন্য পা পায়ের পাতার সামনের অংশে ভর দিয়ে গোড়ালি উঠে থাকবে। ঊর্ধ্বে উত্থিত পায়ের অঙ্গুলিগুলি মৃত্তিকা অভিমুখে প্রসারিত থাকবে।

কুসুমচয়ন, বৃক্ষশাখা ধরে দাঁড়ানো ও বিভিন্ন শোভাময়ী দেবী ও মানবী চরিত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশে এর প্রয়োগ হয়।

চতুরস্র : অবস্থান বৈষ্ণব স্থান অনুযায়ী। হস্তদ্বয় যথাক্রমে ও যুগপৎ কটি ও নাভিদেশে সঞ্চালিত হবে। বক্ষোদেশ সমুন্নত।

ইহা নারী দেহের লালিত্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে বলে সাধারণভাবে স্ত্রী চরিত্রের অবলম্বন।

নৃত্যকলায় এই সংস্থানগুলি যথাযথ না হলে সৌন্দর্যহানি হয়। নাট্যশাস্ত্রমতে সৌষ্ঠব বলতে কটি ও কর্ণ সমরেখায়, কূর্পর (কনুই), স্কন্ধ ও মস্তক সমরেখায় ; বক্ষোদেশ উন্নত বোঝায়। সঙ্গীত রত্নাকর-এর মতে সৌষ্ঠব অর্থে কটী জানুর সমরেখায় ; কনুই স্কন্ধ ও মস্তক একরেখায় ; বক্ষোদেশ উন্নত ; গাত্র স্বস্থানে বিশ্রান্ত অর্থাৎ সাবলীল;

ভাবে অবস্থিত বোঝায়। যথার্থ সংস্থানের ওপরেই সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য নির্ভর করে।

। গতিভেদ ।

অনুষ্ঠানকালে বিশেষ অবস্থা ও গতিবিধির জন্য বিভিন্ন চারী, মণ্ডল ও স্থান যেমন অবলম্বন করা হত তেমনি বিভিন্ন গতিরও নির্দেশ আছে। নটনটীদের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়ে বিশেষ পাদচারণার নিয়ম আছে। এই সব পাদচারণভঙ্গী থেকেই চরিত্র-গুলির বৈশিষ্ট্য বোঝা যেত। বিভিন্ন রস ও ভাব অনুযায়ী গতিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটত। যেমন রৌদ্ররসাত্মক অভিনয়ে অসংযত গতি ও করুণ রসে গতিকে সংযত করা হত। নাট্যশাস্ত্রে গতি প্রচার পর্যায়ে বিশদ আলোচনা আছে তবে অভিনয়দর্পণোক্ত গতিভেদ নৃত্যকলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অভিনয় দর্পণে হংসী, ময়ূরী, মৃগী, গজলীলা, তুরঙ্গিণী, সিংহী, ভুজঙ্গী, মণ্ডুকী, বীরা ও মানবী এই দশ প্রকার গতিভেদের নির্দেশ পাওয়া যায়।

হংসী ঃ "পরিবর্ত্ত্য তনূপার্শ্বং বিতস্ত্যান্তরিতং শনৈঃ।
একৈকং তৎ পদং ন্যস্য কপিথ্থং করয়োর্বহন্‌॥
হংসবদ্‌গমনং যত্ত, সা হংসী গতিরীরিতা।"

এক পা সামনের দিকে এগিয়ে ভূমিতে স্থাপন করতে হবে, সেই দিকের দেহের পার্শ্বদেশ সামনের দিকে অল্প ফেরানো থাকবে। এবং পর্যায়ক্রমে অপর পা ভূমিতে স্থাপন করা এবং তখন সেই দিকের দেহপার্শ্ব সামনে ঘোরাতে হবে, তাহলেই হংসীগতি ভঙ্গী রূপায়িত হবে। উভয় হস্তেই কপিত্থ মুদ্রা।

ময়ূরী ঃ "প্রপদাভ্যাং ভুবি স্থিত্বা কপিথ্থং করয়োর্বহন।
একৈকজানুচলনান্ময়ূরী গতিরীতিতা॥"

দুই পায়ের অঙ্গুলিগুলির ওপর ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়ানো অবস্থায় পর্য্যায়ক্রমে এক একটি জানু চালনা করলে ময়ূরী গতিভঙ্গী রূপায়িত হবে। উভয় হস্তে কপিত্থ মুদ্রা।

মৃগী ঃ "মৃগবদ্‌গমনং বেগাৎ ত্রিপতাককরৌ বহন্।
পুরতঃ পার্শ্বয়োশ্চৈব যানং মৃগগতির্ভবেৎ ॥"

সবেগে সামনের দিকে ও উভয় পার্শ্বে হরিণের মত সঞ্চালন করলে মৃগগতি রূপায়িত হবে। উভয় হস্তে ত্রিপতাক মুদ্রা।

গজলীলা ঃ "পার্শ্বয়োস্তু পতাকাভ্যাং করাভ্যাং বিচরংস্ততঃ।
সমপাদগতির্মন্দং গজলীলেতি বিশ্রুতা ॥"

দুই পা সম অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থানে রেখে ধীরে ধীরে বিচরণ করলে গজলীলা গতিভঙ্গী রূপায়িত হবে। দুই পাশে দুই হাতে পতাকা মুদ্রা।

তুরঙ্গিনী ঃ "উৎক্ষিপ্য দক্ষিণং পাদমুল্লঙ্ঘ্য চ মুহুর্মুহু।
বামেন শিখরং ধৃত্বা দক্ষিণেন পতাকিকাম্।
তুরঙ্গিনী গতিঃ প্রোক্তা নৃত্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥"

ঘোড়া লাফিয়ে চলার সময় যেমন সামনের পা শূন্যে তুলে রাখে, আবার ভূমিস্পর্শ করে আবার শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে সেই ভাবে ডান পা সামনে তুলে চলতে হবে। বাম হস্তে শিখর ও ডান হস্তে পতাকা মুদ্রা।

সিংহী ঃ "পাদাগ্রাভ্যাং ভুবি স্থিত্বা পুর উৎপ্লুত্য বেগতঃ।
করাভ্যাং শিখরং ধৃত্বা যানং সিংহগতির্ভবেৎ ॥"

দুই পায়ের সামনের দিকে ভর দিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে

সবেগে সম্মুখে লাফিয়ে লাফিয়ে চললে সিংহী গতিভঙ্গী রূপায়িত হয়। উভয় হস্তে শিখর মুদ্রা।

ভুজঙ্গী ঃ "ত্রিপতাককরৌ ধৃত্বা পার্শ্বয়োরুভয়োরপি।
পূর্ব্ববদ্‌গমনং যত্ত্ব্ সা ভুজঙ্গী গতির্ভবেৎ ॥"

সাপের মত এঁকে বেঁকে ধীরে ও দ্রুত গতিতে চলা। এই চলন দেহেও সঞ্চারিত হবে। উভয় হস্তে দুই পার্শ্বে ত্রিপতাক মুদ্রা।

মণ্ডুকী ঃ "করাভ্যাং শিখরং ধৃত্বা কিঞ্চিৎ সিংহসমা গতিঃ।
মণ্ডুকী গতিরিত্যেষা প্রসিদ্ধা ভরতাগমে ॥"

এই গতির সহিত সিংহী গতির অবস্থান একই রকম। কিন্তু লাফ দেওয়ার তারতম্য আছে। মণ্ডুকী গতিতে অল্প লাফ দিয়ে এগোতে হবে। উভয় হস্তে শিখর মুদ্রা।

বীরা ঃ "বামেন শিখরং ধৃত্বা দক্ষিণেন পতাকিকাম্।
দূরাদাগমনং যত্ত্ব্ বীরা গতিরুদীরিতা ॥"

এই চলন হবে ধীর, উদ্ধত ও ভারযুক্ত, লঘুক্ষিপ্রপদে নয়। গতি দূর থেকে আনতে হবে। বাম হস্তে শিখর ও দক্ষিণ হস্তে পতাকা মুদ্রা।

মানবী ঃ "মণ্ডলাকারবদ্ ভ্রান্ত্যা সমাগত্য মুহুর্মুহু।
বামং করং ন্যস্থ কটৌ দক্ষিণে কটকামুখম্ ॥"

এর চলন হচ্ছে চক্রাকারে বার বার ঘুরে সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানোর সময় বাঁ হাত কোমরে রেখে ডান হাতে কটকামুখ মুদ্রা ধারণ করতে হবে।

৬

মুদ্রা

নৃত্যকলায় রস ও ভাব প্রকাশের জন্য মুদ্রার প্রয়োগ হয়। 'মুদম্‌, আনন্দং রাতি দাতি', অর্থাৎ মুদ্রা বলতে বুঝায় যা আনন্দ দান করে। নৃত্যে আঙ্গিকাভিনয়ের অন্যতম আশ্রয় রূপে বিভিন্ন হস্তমুদ্রা বিভিন্ন ভাব ও রস পরিবেশন করে। অবশ্য এই ভাব প্রকাশে অন্যান্য অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের সহযোগে পূর্ণ রসনিষ্পত্তি সাধিত হয়।

"আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥"

অর্থাৎ মুখের দ্বারা গান অবলম্বন করা উচিত, হস্তের দ্বারা গানের অর্থ প্রদর্শন, চক্ষুর দ্বারা ভাব প্রদর্শন ও পদদ্বয়ে তাল রক্ষা করা উচিত। যেখানে হস্ত সেখানেই দৃষ্টি; যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি; যেখানে মন সেখানেই ভাব; আর যেখানে ভাব সেখানেই রসোৎপত্তি।

রসোৎপত্তি হলে তবেই নৃত্য আস্বাদনযোগ্য হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই প্রতীকধর্মী মুদ্রাগুলি মানুষের আন্তর ভাব ও রসকে

বাস্তব জগতে প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। উপরোক্ত শ্লোকে মুদ্রার সার্থকতা প্রমানিত হয়েছে। কারণ হস্তমুদ্রার প্রয়োগ ও সঞ্চালনের সাথে সাথেই তার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এই হস্তমুদ্রা নয়ন মনোরম হলে তার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। মন একাগ্র হলে তবেই ভাবের উদ্রেক হয় তা রসসৃষ্টিতে পরিণত হয়। অবশ্য বৈদিক যুগ থেকেই পূজায় ভাব প্রকাশের জন্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। সামগানে ছন্দ, তাল ও ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করার জন্য মুদ্রা ব্যবহার করা হত। এই হস্তমুদ্রাগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ বা বিনিয়োগগুলিই ভাবের পরিচায়ক ও রসের দ্যোতক।

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণ অনুসারে অসংযুক্ত ও সংযুক্ত মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণে উল্লিখিত মুদ্রাগুলির সংখ্যা ও প্রয়োগে কিছু পার্থক্য আছে। পরবর্তী কালে বিভিন্ন নৃত্যধারায় এই মুদ্রাগুলির ব্যবহারের সংস্কার ঘটেছে। বিশেষ করে কথাকলি নৃত্যে মুদ্রা প্রয়োগ সব থেকে সংস্কৃত ও উন্নত হয়েছে। অবশ্য মূলতঃ হস্তমুদ্রাগুলির লক্ষণ ও স্থাপনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কথাকলি নৃত্যে মুদ্রা প্রয়োগের সেজন্য স্বতন্ত্র আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে মূল মুদ্রাগুলির ব্যখ্যা করা হল।

নাট্যশাস্ত্রের মতে পতাক, ত্রিপতাক, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, পদ্মকোশ, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, কাঙ্গুল, অলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, উর্ণনাভ, তাম্রচূড় এই চব্বিশ প্রকার অসংযুক্ত হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিনয় দর্পণে আটাশ প্রকার অসংযুক্ত হস্তের উল্লেখ আছে ; যথা :—পতাক, ত্রিপতাক, অর্ধপতাক, কর্তরীমুখ, ময়ূর, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, চন্দ্রকলা, পদ্মকোশ, সর্পশিরঃ, মৃগশীর্ষ, সিংহমুখ, কাঙ্গুল, অলপদ্ম, চতুর, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, তাম্রচূড়, ত্রিশূল।

"অঙ্গুল্যঃ কুঞ্চিতাঙ্গুষ্ঠঃ সংশ্লিষ্টাঃ প্রসৃতা যদি।
স পতাককরঃ প্রোক্তো নৃত্যকর্মবিশারদৈঃ ॥"

পতাক

অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় প্রসারিত হলে এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে পতাক হস্ত হয়।

নাট্যারম্ভে, মেঘ ও বন বুঝাইতে, বস্তুনিষেধে, কুচ, রাত্রি, নদী, অমরমণ্ডল, তুরঙ্গ, খণ্ডন, পবণ, শয্যা, যাত্রার উদ্যোগ, প্রতাপ, প্রসাদ, জ্যোৎস্না, প্রখর সূর্যকিরণ, সমভাব, অঙ্গরাগ, তালপত্র, আশীর্বাদ, নৃপতিশ্রেষ্ঠ, সমুদ্র, বৎসর, বৃষ্টির দিন, গাঢ় আলিঙ্গন, প্রলাপ, মঞ্চ, জল, বামন, কামার্তভাবে নারীর নাভিস্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থ বুঝাবার জন্য পতাক হস্ত প্রয়োগ হয়।

ত্রিপতাক

"স এব ত্রিপতাকঃ স্যাদ্ বক্রিতানামিকাঙ্গুলিঃ" ॥

পতাক হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র হলে ত্রিপতাক হস্ত হয়।

মুকুট, বৃক্ষ, বাসব, বজ্র, কেতকীফুল, দীপ, বহ্নিশিখা, পারাবত, পত্রলেখা, পরিবর্তন, ইক্ষুদণ্ড, মাঙ্গল্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ত্রিপতাক হস্ত প্রয়োগ হয়।
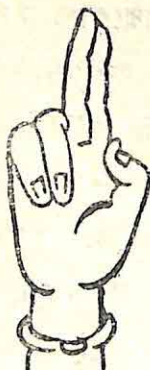
অর্ধপতাক

"ত্রিপতাকে কনিষ্ঠা চেদ্ বক্রিতার্দ্ধপতাকিকা" ॥

ত্রিপতাক হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠাকে বক্র করলে অর্ধপতাক হস্ত হয়।

পত্র, ফলক, তীর, করাত, ছুরিকা, ধ্বজ, শৃঙ্গ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধপতাক হস্ত প্রয়োগ হয়। নাট্যশাস্ত্রে এই মুদ্রার উল্লেখ নেই।

"অস্যৈব চাপি হস্তস্য তর্জ্জনী চ কনিষ্ঠিকা।
বহিঃ প্রসারিতে দ্বে চ স করঃ কর্ত্তরীমুখ" ॥

কর্ত্তরীমুখ

অর্ধপতাক হস্ত অবস্থায় তর্জনী ও কনিষ্ঠা বাইরের দিকে প্রসারিত হলে কর্তরীমুখ হস্ত হয়।

মৃত্যু, বিদ্যুৎ, পতন, লতা, স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদ, লুণ্ঠন, বিপর্যস্ত অবস্থা, বিরহশয্যায় শয়ন ইত্যাদি অর্থ প্রকাশে কর্তরীমুখ হস্তের প্রয়োগ হয়। নাট্যশাস্ত্রে পাঠভেদে ত্রিপতাক হস্ত অবস্থায় মধ্যমার পৃষ্ঠে তর্জনী রাখলে কর্তরীমুখ হস্ত হয় এইরূপ বর্ণিত আছে। কথাকলি নৃত্যে সাধারণত এই আকারে প্রযুক্ত হয়।

"অস্মিন্নামিকাঙ্গুষ্ঠৌঃ শ্লিষ্টৌ চান্যাঃ প্রসারিতাঃ।
ময়ূরহস্তঃ কথিতঃ করটীকাবিচক্ষনৈঃ" ॥
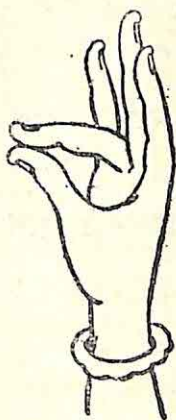
ময়ূর

কর্তরীমুখ হস্ত অবস্থায় অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত ও অন্য অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করলে ময়ূর হস্ত হয়।

ময়ূরের মুখ, পক্ষী, ললাটতিলক, বিখ্যাত বস্তু, শাস্ত্রের অর্থবিচার, বমন, লতা, নদীর জল নিক্ষেপ, অলকগুচ্ছ সরানো প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ময়ূর হস্ত ব্যবহার হয়।

"অর্দ্ধচন্দ্রকরঃ সোহয়ং পতাকেহঙ্গুষ্ঠসারণাৎ।"

পতাক হস্ত অবস্থায় কুঞ্চিত অঙ্গুষ্ঠটি প্রসারিত করলে অর্ধচন্দ্র হস্ত হয়।

অর্ধচন্দ্র

ধ্যান, প্রার্থনা, অঙ্গস্পর্শ, নমস্কার, কটিদেশ, গলাধাক্কা দেওয়া, দেবাভিষেকক্রিয়া, ভল্ল, কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্র, ভোজনপাত্র প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধচন্দ্র হস্তের প্রয়োগ হয়।

অরাল

"পতাকে তর্জ্জনী বক্রা নাম্না সোহয়মরালকঃ।"

পতাক হস্ত অবস্থায় তর্জনী বক্র করলে অরালহস্ত হয়।

বিষপান, অমৃতপান, প্রচণ্ড ঝড় প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অরাল হস্ত প্রয়োগ হয়।

শুকতুন্ত

"অস্মিন্ননামিকা বক্রা শুকতুণ্ডকরো ভবেৎ।"

অরাল হস্ত অবস্থায় অনামিকা বক্র করলে শুকতুণ্ড হস্ত হয়।

বাণ প্রয়োগে, বর্শা, ভল্ল ব্যবহারে, উগ্রভাব প্রকাশে শুকতুণ্ড হস্ত প্রয়োগ হয়।

মুষ্টি

"মেলনাদঙ্গুলীনাঞ্চ কুঞ্চিতানাং তলান্তরে॥
অঙ্গুষ্ঠশ্চোপরিযুতো মুষ্টিহস্তোঽয়মীর্যতে।"

করতলের মধ্যে অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত অবস্থায় পরস্পর মিলিত হবার পর তার উপর অঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করলে মুষ্টি হস্ত হয়।

ধৈর্য, কেশগ্রহণ, দৃঢ়তা, যুদ্ধভাব ধারণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে মুষ্টি হস্তের প্রয়োগ হয়।

"চেন্মুষ্টিরুন্নতাঙ্গুষ্ঠঃ স এব শিখরঃ করঃ ॥"
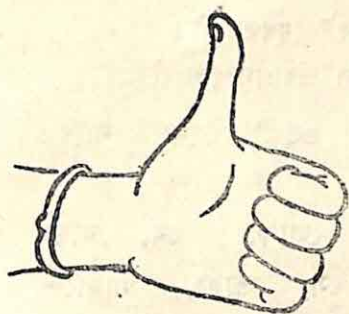
শিখর

মুষ্টিহস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করলে শিখর হস্ত হয়।

ধনু, স্তম্ভ, শ্রাদ্ধ, কামভাব, মদনদেব, নিশ্চয়তা, দন্ত, লিঙ্গ, স্মরণ, অভিনয়, ঘণ্টাধ্বনি, ওষ্ঠ, কটিবন্ধের আকর্ষণ প্রভৃতি অর্থপ্রকাশে শিখরহস্তের প্রয়োগ হয়।

"অঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্নি শিখরে বক্রিতা যদি তর্জ্জনী ॥
কপিত্থাখ্যঃ করঃ সোঽয়ং কীর্ত্তিতো নৃত্যকোবিদৈঃ ॥"

কপিত্থ

শিখর হস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠের মস্তকে তর্জনী বক্রভাবে স্থাপন করলে কপিত্থ হস্ত হয়।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, নটগণের তালধারণ, গোদোহন, অঞ্জন, অবলম্বন, ধূপ দীপ দ্বারা আরতি, বসনাঞ্চল ধারণ, লীলাকুসুম ধারণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কপিত্থ-হস্ত প্রয়োগ হয়।

"কপিত্থে তর্জ্জনী চোর্দ্ধমুচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমধ্যমা ॥
কটকামুখহস্তোঽয়ং কীর্ত্তিতো ভরতাগমৈঃ।"

কটকামুখ

কপিত্থ হস্ত অবস্থায় তর্জনীর সঙ্গে উর্ধ্বোত্থিত অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা মিলিত হলে কটকামুখ হস্ত হয়।

কুসুমচয়ন, সুগন্ধীকরণ, বচন, দৃষ্টিনিক্ষেপ, মুক্তামালা বা পুষ্পমালা ধারণ, তাম্বুল প্রদান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কটকামুখ হস্তের প্রয়োগ হয়।

"ঊর্দ্ধ-প্রসারিতা যত্র কটকামুখতর্জ্জনী ॥
সূচীহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো ভরতাগমকোবিদৈঃ।"

সূচী

কটকামুখহস্ত অবস্থায় তর্জনী উর্ধ্বে প্রসারিত করলে সূচীহস্ত হয়।

শত, রবি, নগরী, লোক, যে, যাহা, যাহাতে, যেরূপে, সে, তাহা, তাহাতে, সেইরূপে, বিজন, কৃশতা, শলাকা, দেহ, বিস্ময়, বেণীরচনা, ছত্র, সামর্থ্য, ভেরীবাদন, কুমোরের চাকীর ঘূর্ণন, বিবেচনা, দিনান্ত প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সূচীহস্তের প্রয়োগ হয়।

"সূচ্যামঙ্গুষ্ঠমোক্ষে তু করশ্চন্দ্রকলা ভবেৎ"।

চন্দ্রকলা

সূচীহস্ত অবস্থায় অঙ্গুষ্ঠটি মুক্ত করলে চন্দ্রকলা হস্ত হয়।

চন্দ্র, মুখ, পরিমাণ, শিবের মুকুট, গঙ্গা, লাঠি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে চন্দ্রকলা হস্ত প্রয়োগ হয়।

"অঙ্গুল্যো বিরলাঃ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতাস্তলনিম্নগাঃ।
পদ্মকোশাবিধো হস্তো তন্নিরূপণমুচ্যতে ॥"

পদ্মকোশ

করতল সমভাবে না থেকে কুঞ্চিত হবে, অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক অবস্থায় সামান্য বক্রভাবে নিম্নমুখী অবস্থায় থাকলে পদ্মকোশ হস্ত হয়।

বিল্বফল, কপিত্থ ফল, রমণীর কুচকুম্ভ, ঘূর্ণীপাক, কন্দুক, ভোজন, রন্ধনপাত্র, পুষ্পকোরক, আম্রফল, পুষ্পাবর্ষণ, পুষ্পমঞ্জরী, পদ্ম, বল্মীক, দর্পণ, ডিম্ব, প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পদ্মকোশ হস্তের প্রয়োগ হয়।

সর্পশীর্ষ

"পতাকা নমিতাগ্রা চেৎ সর্পশীর্ষকরো ভবেৎ ॥"

পতাক হস্ত অবস্থায় অগ্রভাগ নমিত করলে সর্পশীর্ষ হস্ত হয়।

চন্দন, সর্প, মন্ত্রধ্বনি, পোষণ, দেবপ্রণাম, বাহন, বামন, আস্ফালন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সর্পশীর্ষ হস্তের প্রয়োগ হয়।

মৃগশীর্ষ

"অস্মিন্ কনিষ্ঠিকাঙ্গুষ্ঠে প্রসৃতে মৃগশীর্ষকঃ ॥"

সর্পশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করলে মৃগশীর্ষ হস্ত হয়।

ভীতি, বিবাদ, নেপথ্য, আহ্বান, মিলন, বীণা, গতি, আবাস, নৈবেদ্য, বসন, যোনিদেশ, ছত্রধারণ, পাদসংবাহন, সমর, শমন, সময়, দেহ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে মৃগশীর্ষ হস্তের প্রয়োগ হয়।

সিংহমুখ

"মধ্যমানামিকাগ্রাভ্যামঙ্গুষ্ঠৌ মিশ্রিতো যদি ॥
শেষৌ প্রসারিতৌ যত্র স সিংহাস্যকরো ভবেৎ।"

মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগের সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ মিলিত হলে এবং তর্জনী ও কনিষ্ঠা প্রসারিত অবস্থায় থাকলে সিংহমুখ হস্ত হয়।

হোম, গজ, পদ্মমালা, সিংহমুখ, শশক, স্মিত, সিংহাসন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সিংহমুখ হস্তের প্রয়োগ হয়।

কাঙ্গুল

"পদ্মকোশেহনামিকা চেন্নম্রা কাঙ্গুলহস্তকঃ ॥"

পদ্মকোশ হস্ত অবস্থায় অনামিকা নমিত করলে কাঙ্গুলহস্ত হয়। নাট্যশাস্ত্রে পাঠান্তরে লাঙ্গুল হস্তও বলা হয়।

নূপুর, চকোর, চাতক, কহ্লার, সুপারি গাছ, নারিকেল, বালিকা স্ত্রীর কুচমণ্ডল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কাঙ্গুলহস্তের প্রয়োগ হয়।

অলপদ্ম

"কনিষ্ঠাদ্যা বক্রিতাশ্চ বিরলাশ্চালপদ্মকঃ ॥"

কনিষ্ঠা ও অন্যান্য অঙ্গুলিগুলিকে ফাঁক ফাঁক অবস্থায় বক্র করলে অলপদ্ম হস্ত হয়।

পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্ম, পূর্ণচন্দ্র, বিরহ, দর্পণ, আবর্ত, কুচমণ্ডল, উর্ধ্বচূড়া কবরী, শ্লাঘা, সৌন্দর্য, শকট, চক্রবাক, কোপ, কলকল ধ্বনি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অলপদ্ম হস্তের প্রয়োগ হয়।

"তর্জন্যাদ্যাস্ত্রয়ঃ শ্লিষ্টাঃ কনিষ্ঠা প্রসৃতা যদি ॥
অঙ্গুষ্ঠোহনামিকামূলে তির্য্যক্ চেচ্চতুর করঃ।"

চতুর

তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা পরস্পরসংশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকবে, কনিষ্ঠা প্রসারিত হবে ও অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা তির্যকভাবে স্থাপিত হলে চতুর হস্ত হয়।

স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ, নয়ন, প্রমাণ, ঘৃত, তৈল, সরস বস্তু, আর্দ্র, খেদ, রসাস্বাদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে চতুর হস্তের প্রয়োগ হয়।

"মধ্যমাঙ্গুষ্ঠসংযোগে তর্জনী বক্রিতাকৃতিঃ।
শেষাঃ প্রসারিতাশ্চাসৌ ভ্রমরাভিধহস্তকঃ॥"

ভ্রমর

মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত অবস্থায়, তর্জনী বক্রাকৃতি, কনিষ্ঠা ও অনামিকা প্রসারিত অবস্থায় থাকলে ভ্রমর হস্ত হয়।

ভ্রমর, পক্ষ, শুক, সারস, কোকিল, যোগ, মৌনভাব প্রভৃতি অর্থপ্রকাশে ভ্রমর হস্তের প্রয়োগ হয়।

"মধ্যমাগ্যাস্ত্রয়োঽঙ্গুল্যঃ প্রসৃতা বিরলা যদি।
তর্জন্যঙ্গুষ্ঠসংশ্লেষাৎ করো হংসাস্যকো ভবেৎ॥"

হংসাস্য
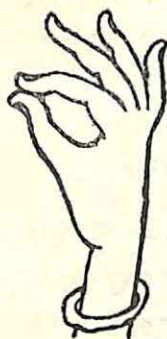
তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংশ্লিষ্ট থাকলে এবং মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা ফাঁক ফাঁক ভাবে প্রসারিত হলে হংসাস্য হস্ত হয়। এই মুদ্রার অন্য আকৃতিও আছে।

দংশন, মাছি, বাঁধ, কষ্টি পাথর, কর্তব্য, চিত্রাঙ্কন, শোভা, রেখাবিচার, মুক্তা, সূত্রবন্ধন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে হংসাস্য হস্তের প্রয়োগ হয়।

"সর্পশীর্ষকরে সম্যক্ কনিষ্ঠা প্রসৃতা যদি।
হংসপক্ষকরঃ সোঽয়ং তন্নিরূপণমুচ্যতে॥"

হংসপক্ষ

সর্পশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা সম্পূর্ণ প্রসারিত করলে হংসপক্ষ হস্ত হয়।

সেতুবন্ধন, আবরণ, আচ্ছাদন, আচমন, চন্দনলেপন, ষট্‌সংখ্যা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে হংসপক্ষ হস্তের প্রয়োগ হয়।

"পুনঃ পুনঃ পদ্মকোশাঃ সংশ্লিষ্টো বিরলো যদি ।
সন্দংশাভিধহস্তোঽয়ং কীর্ত্তিতো নৃত্যকোবিদৈঃ ॥"

সন্দংশ

পদ্মকোশ হস্ত অবস্থায় অঙ্গুলিসমূহ ক্রমান্বয়ে সংশ্লিষ্ট ও ফাঁক ফাঁক করলে সন্দংশ হস্ত হয়। এর আর একটি রূপও প্রচলিত যেমন, অরাল হস্ত অবস্থায় তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সাঁড়াশীর মত যুক্ত করলে ও করতল নামালে সন্দংশ হস্ত হয়। অগ্রজ, মুখজ ও পার্শ্বজ এই তিন প্রকার সন্দংশ হস্তের কথা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

ব্রণ, কীট, উদর, মহাভয়, পূজা, প্রবাল ও সংখ্যা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সংন্দশ হস্তের প্রয়োগ হয়।

"অঙ্গুলীপঞ্চকশ্চৈব মেলয়িত্বা প্রদর্শনে।
মুকুলাভিধহস্তোঽয়ং কীর্ত্যতে ভরতাগমে ॥"

মুকুল

পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্রে মিলিত অবস্থায় সমভাবে উর্দ্ধে প্রসারিত করলে মুকুল হস্ত হয়। মুকুলীকৃত পদ্ম, ভোজন, জপ, পঞ্চশর, নাভি, কদলীপুষ্প, চুম্বন, কামোদ্দীপক নখবিলেখন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে মুকুল হস্তের প্রয়োগ হয়।

"মুকুলে তাম্রচূড়ঃ স্যাৎ তর্জ্জনী বক্রিতা যদি ॥"
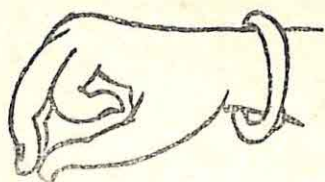
তাম্রচূড়

মুকুল হস্ত অবস্থায় তর্জনী বক্র করলে তাম্রচূড় হস্ত হয়। নাট্য-শাস্ত্রে অন্য দুই রকমের তাম্রচূড় হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটিতে মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সাঁড়া-শীর মত যুক্ত, তর্জনী বক্র অবস্থায়

এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা করতলে থাকে। ইহা ভৎর্সনা, তাল দেওয়া প্রভৃতি নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টিতে মুষ্টি হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকে। ইহা শত সহস্র লক্ষ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করে।

কুক্কুট, বক, কাক, উট, গোবৎস, তালপত্র প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে তাম্রচূড় হস্তের প্রয়োগ হয়।

ত্রিশূল

"নিকুঞ্চনযুতাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠস্ত্র ত্রিশূলকঃ ॥"

কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে ও অন্যান্য অঙ্গুলি সমভাবে উর্ধ্বে প্রসারিত থাকলে ত্রিশূল হস্ত হয়।

ব্যাঘ্র হস্ত, অর্ধসূচী হস্ত, কটক হস্ত ও পল্লিহস্ত প্রচলিত কিন্তু নাট্যশাস্ত্র বা অভিনয়দর্পণে অসংযুক্ত মুদ্রা তালিকায় এদের উল্লেখ নেই।

ব্যাঘ্র

"কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠনমনে মৃগশীর্ষকরে তথা।
ব্যাঘ্রহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো ভরতাগমকোবিদৈঃ ॥"

মৃগশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ নমিত করলে ব্যাঘ্র হস্ত হয়।

ব্যাঘ্র, ভেক, মর্কট, শুক্তি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ব্যাঘ্র হস্তের প্রয়োগ হয়।

অর্দ্ধসূচী

"কপিত্থে তর্জ্জনী উর্দ্ধসারণে ত্বর্দ্ধসূচিকঃ ॥"

কপিত্থ হস্ত অবস্থায় তর্জনী উধ্বে প্রসারিত করলে অর্ধসূচী হস্ত হয়।
অঙ্কুর, পক্ষীশাবক, বৃহৎ কীট প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে অর্ধসূচী হস্তের প্রয়োগ হয়।

কটক

"সন্দংশেহপূর্দ্ধভাগে তু মধ্যমানামিকান্বয়াৎ ॥"

সন্দংশ হস্ত অবস্থায় মধ্যমা ও অনামিকা মিলিত হলে কটক হস্ত হয়।
আহ্বানের ভাব ও চলন বুঝাইতে কটক হস্তের প্রয়োগ হয়। এই মুদ্রার শ্লোকের পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায় নাই।

"ময়ূরে তর্জ্জনীপৃষ্ঠো মধ্যমেন যুতো যদি ॥"

ময়ূর হস্ত অবস্থায় তর্জনীর পৃষ্ঠদেশ মধ্যমার সহিত যুক্ত হলে পল্লিহস্ত হয়।
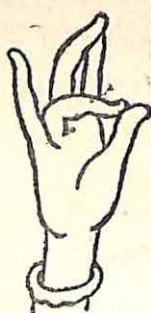
পল্লি

অসংযুক্ত হস্তগুলি থেকেই সংযুক্ত হস্তের উৎপত্তি হয়েছে। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, কটকাবর্ধমান, উৎসঙ্গ, নিষেধ, ডোল, পুষ্পপুট, মকর, গজদন্ত, অবহিত্থ ও বর্ধমান এই তেরটি সংযুক্ত হস্ত। অভিনয় দর্পণে সংযুক্ত হস্ত তালিকায় অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, ডোলা, পুষ্পপুট, উৎসঙ্গ, শিবলিঙ্গ, কটকাবর্ধন, কর্তরীস্বস্তিক, শকট, শঙ্খ, চক্র, সম্পুট, পাশ,

কীলক, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, গরুড়, নাগবন্ধ, খট্বা ও ভেরুণ্ড এই তেইশটি মুদ্রার উল্লেখ আছে। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রে এছাড়াও আরো বিভিন্ন নৃত্য-হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার নাট্যশাস্ত্রে চতুঃষষ্টি হস্তের উল্লেখ দেখা যায়। এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করে মুদ্রার একটি অভি-ধান সংকলন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য এ কাজ বিশেষ দুরূহ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ।

অঞ্জলি

"পতাকাতলয়োর্যোগাদঞ্জলিঃ কর ঈরিতঃ ॥"

দুই পতাকা হস্ত অবস্থায় তলদেশ যুক্ত হলে অঞ্জলি হস্ত হয়।

দেবতা, গুরু ও বিপ্র প্রণাম অর্থ প্রকাশে অঞ্জলি হস্তের প্রয়োগ হয়।

কপোত
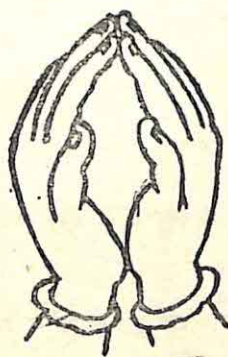
"কপোতোহসৌ করো যত্র শ্লিষ্টমূলাগ্রপার্শ্বকঃ ॥"

অঞ্জলি হস্ত অবস্থায় মণিবন্ধ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ মিলিত হলে ও করতলের অপর দিক উন্মুক্ত হলে কপোত হস্ত হয়।

প্রণাম, গুরু সম্ভাষণ, সবিনয় স্বীকৃতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কপোত হস্তের প্রয়োগ হয়।

কর্কট

"অন্যোহন্যস্যান্তরে যত্রাঙ্গুল্যো নিঃসৃত্য হস্তয়োঃ
অন্তর্বহির্বা বর্ত্তন্তে কর্কটঃ সোহভিধীয়তে।"

এক হাতের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলি এক এক করে প্রবিষ্ট করতে হবে এবং উহা হাতের তলায় অথবা উপরের দিকে থাকলে কর্কট হস্ত হয়।

জনসমাগম, শাখা উন্নমন, শঙ্খবাদন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কর্কট হস্তের প্রয়োগ হয়।
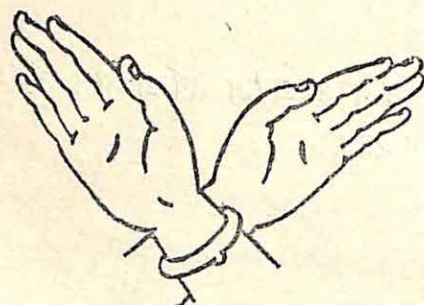
"পতাকয়োঃ সন্নিযুক্ত করয়োর্মণিবন্ধয়োঃ ॥
সংযোগেন স্বস্তিকাখ্যো মকরে বিনিযুজ্যতে।"

স্বস্তিক

দুইটি পতাকা হস্ত মণিবন্ধে পরস্পর সংযুক্ত হলে স্বস্তিক হস্ত হয়।

আকাশ, দিক, মেঘ, সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অসীম পদার্থের অর্থপ্রকাশে স্বস্তিক হস্তের প্রয়োগ হয়।

"পতাক উরুদেশস্থে ডোলাহস্তোহয়মিষ্যতে ॥"

পতাক হস্ত দুটি লম্বমান অবস্থায় উরুদেশে স্থাপন করলে ডোলাহস্ত হয়।

বিষাদ, সম্ভ্রম, মূর্ছা, আবেগ, ক্ষতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে ডোলাহস্তের প্রয়োগ হয়।

"সংশ্লিষ্টকরয়োঃ সর্পশীর্ষঃ পুষ্পপুটঃ করঃ ॥"

পুষ্পপুট

দুইটি সর্পশীর্ষ হস্তকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট অবস্থায় রাখলে পুষ্পপুট হস্ত হয়।

সান্ধ্য উপাসনা, অর্ঘ্যদান, আরতি, মন্ত্রপুষ্প প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পুষ্পপুট হস্তের প্রয়োগ হয়।

"অন্যোন্যবাহুদেশস্থৌ মৃগশীর্ষকরৌ যদি।
উৎসঙ্গহস্তঃ স জ্ঞেয়ো ভরতাগমবেদিভিঃ ॥"

মৃগশীর্ষ অবস্থায় দুইটি হাত পরস্পর পরস্পরের বিপরীত বাহুদেশে স্থাপন করলে উৎসঙ্গ হস্ত হয়।

আলিঙ্গন, লজ্জা, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে উৎসঙ্গ হস্তের প্রয়োগ হয়।

"বামেঽর্দ্ধচন্দ্রে বিন্যস্তঃ শিখরঃ শিবলিঙ্গকঃ।"
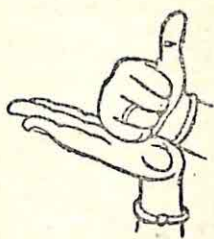
শিবলিঙ্গ

বাম হাতে অর্ধচন্দ্র ও ডান হাত-শিখর হস্ত অবস্থায় তাহার উপর রাখলে শিবলিঙ্গ হস্ত হয়।

শিবলিঙ্গ অর্থ প্রকাশে শিবলিঙ্গ হস্তের প্রয়োগ হয়।
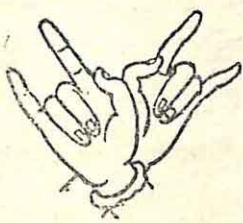
"কটকামুখয়োঃ পাণ্যোঃ স্বস্তিকো মণিবন্ধয়োঃ।
কটকাবর্দ্ধনাখ্যঃ স্যাদিতি নাট্যবিদো বিদুঃ ॥"

কটকাবর্ধন

দুটি কটকামুখ হস্ত পরস্পরের মণিবন্ধে সংযুক্ত করলে কটকাবর্ধন হস্ত হয়।

পূজা, বিবাহ, অভিষেক প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কটকাবর্ধন হস্তের প্রয়োগ হয়।
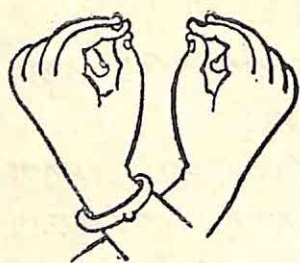
"কর্ত্তরী স্বস্তিকাকারা কর্ত্তরীস্বস্তিকো ভবেৎ ॥"

কর্তরীস্বস্তিক

কর্তরীমুখ অবস্থায় দুইটি হস্ত স্বস্তিকা-কারে সংযুক্ত হলে কর্তরীস্বস্তিক হস্ত হয়।

শাখা, গিরিশিখর, বৃক্ষ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কর্তরীস্বস্তিক হস্তের প্রয়োগ হয়।

"ভ্রমরে মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ প্রসারাচ্ছকটো ভবেৎ ॥"
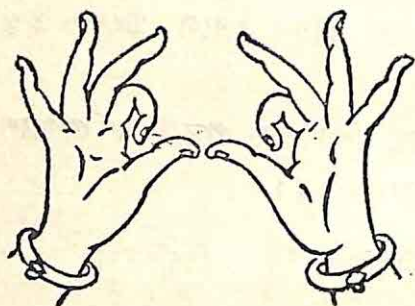
শকট

দুই ভ্রমর হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত করলে শকট হস্ত হয়।

রাক্ষস ভূমিকাভিনয়ে শকট হস্তের প্রয়োগ হয়।

"শিখরান্তর্গতাঙ্গুষ্ঠ ইতরাঙ্গুষ্ঠসঙ্গত ॥
তর্জ্জন্যা যুত আশ্লিষ্টঃ শঙ্খহস্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"
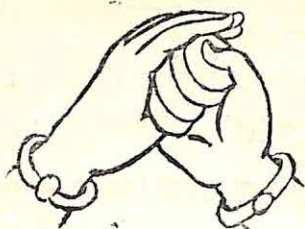
শঙ্খ

এক হাতের শিখরহস্ত অবস্থায় অপর হাতের অঙ্গুষ্ঠ প্রবিষ্ট করলে এবং শিখর হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত অপর হস্তের তর্জনী দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করলে শঙ্খ হস্ত হয়। নাট্যশাস্ত্রে এই হস্তের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

শঙ্খ, শঙ্খবাদন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে শঙ্খমুদ্রা প্রয়োগ হয়।

"যত্রার্দ্ধচন্দ্রৌ তির্য্যঞ্চাবন্যোন্যতলসংস্পৃশৌ।
চক্রহস্তঃ সঃ বিজ্ঞেয়শ্চক্রার্থে বিনিযুজ্যতে॥"
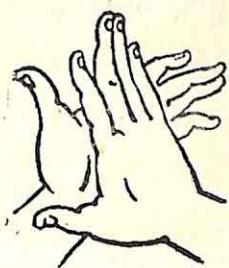
চক্র

অর্ধচন্দ্র হস্ত অবস্থায় দুইটি হাত যখন টেরচা ভাবে পরস্পরের তলদেশ স্পর্শ করে তখন চক্র হস্ত হয়।
চক্র বুঝাইতে চক্র হস্তের প্রয়োগ হয়। এই মুদ্রা বৃহস্পতি, বিষ্ণু ও শিবের প্রিয়।

"কুঞ্চিতাঙ্গুলয়শ্চক্রে প্রোক্তঃ সম্পুটহস্তকঃ।"
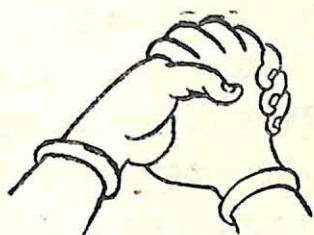
সম্পূট

চক্র হস্ত অবস্থায় অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত হলে সম্পূট হস্ত হয়। অর্থাৎ এক হস্তের অঙ্গুলিগুলি দিয়া অপর হস্তের অঙ্গুলিগুলি চাপিয়া ধরিতে হয়। বস্তুর আচ্ছাদন ও কৌটা, বাক্স প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে সম্পূট হস্তের প্রয়োগ হয়।

"সূচ্যাং নিকুঞ্চিতে শ্লিষ্টে তর্জ্জনৌ পাশ ঈরিতঃ।"
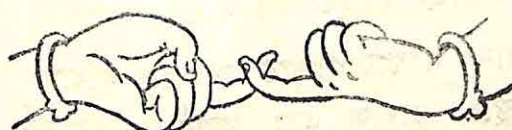
দুই হাতে সূচীহস্ত অবস্থায় তর্জনী দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে পাশ হস্ত হয়।

পাশ

কলহ, শৃঙ্খল, বন্ধন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে পাশ হস্তের প্রয়োগ

হয়। এই মুদ্রা দুর্গা, গণেশ ও শক্তি-
দেবতাদের প্রিয়।

"কনিষ্ঠে কুঞ্চিতে শ্লিষ্টে মৃগশীর্ষস্ত কীলকঃ।'

কীলক

দুই হাতে মৃগশীর্ষ হস্ত অবস্থায় কনিষ্ঠাদুটি কুঞ্চিত হয়ে পিছনের দিকে পরস্পর সংযুক্ত হলে কীলক হস্ত হয়। স্নেহ, ক্রীড়া, কৌতুক, বিহার, পরিহাস, বিশ্রব্ধা-লাপ, সঙ্কেত প্রভৃতি অর্থ প্রকাশে কীলক হস্তের প্রয়োগ হয়।

মৎস্য

"করপৃষ্ঠোপরি ন্যস্তো যত্র হস্তস্ত্বধোমুখঃ।
কিঞ্চিৎপ্রসারিতাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠো মৎস্যনামকঃ॥"

অধোমুখ অবস্থায় করপৃষ্ঠে অপর হস্ত অধোমুখ অবস্থায় রাখলে এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ প্রসারিত করলে মৎস্য হস্ত হয়।
মৎস্যের রূপ প্রদর্শনে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

কূর্ম্ম
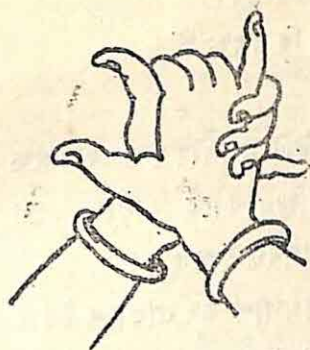
'কুঞ্চিতাগ্রাঙ্গুলিশ্চক্রে ত্যক্তাঙ্গুষ্ঠকনিষ্ঠকঃ ॥
কূর্ম্মহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো কূর্ম্মার্থে বিনিযুজ্যতে।"

কূর্ম অর্থ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

বরাহ

'মৃগশীর্ষে হ্যন্যতরে স্বোপর্য্যেকঃ স্থিতো যদি ॥
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্যোগাদ্বরাহকর ঈরিতঃ।"

মৃগশীর্ষ অবস্থায় দুইটি হাত পরস্পরের উপর স্থাপিত হলে এবং উভয় হাতের কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দুটি পরস্পর মিলিত হলে বরাহ হস্ত হয়।
বরাহ রূপ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

গরুড়
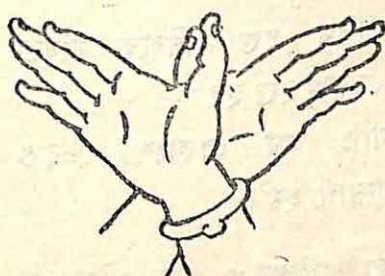
"তির্য্যক্‌তলস্থিতাবর্দ্ধচন্দ্রাবঙ্গুষ্ঠযোগতঃ।
গরুড়হস্ত ইত্যাহুর্ গরুড়ার্থে নিযুজ্যতে॥"

দুইটি অর্ধচন্দ্র হস্ত একটি অপরের তলদেশে তির্যকভাবে থাকলে, এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পরসংযুক্ত থাকলে গরুড় হস্ত হয়।
গরুড় রূপ প্রকাশে এই মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

"সর্পশীর্ষস্বস্তিকশ্চ নাগবন্ধ ইতীরিতঃ।
এতস্য বিনিয়োগস্তু নাগবন্ধে হি সম্মতঃ ॥"
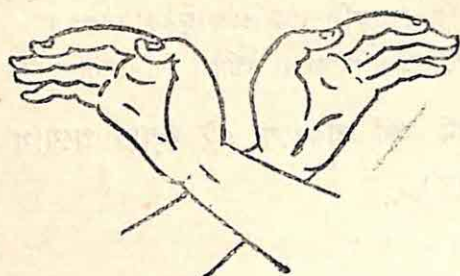
নাগবন্ধ

দুইটি সর্পশীর্ষ হস্ত মণিবন্ধে স্বস্তিকাকারে সংযুক্ত হলে নাগবন্ধ হস্ত হয়।
নাগপাশ অর্থ প্রকাশে ইহার প্রয়োগ হয়।

খট্টা
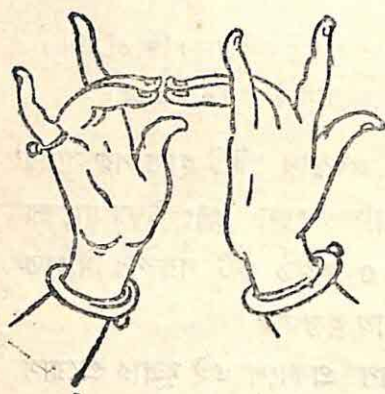
"চতুরে চতুরং ন্যস্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমোক্ষতঃ।
খট্টাহস্তো ভবেদেষখট্টাশিবিকয়োঃ স্মৃতঃ ॥"

দুইটি চতুর হস্ত পরস্পর নিবিষ্ট করে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠকে উন্মুক্ত করলে খট্টা হস্ত হয়।
খট্টা ও শিবিকা অর্থ প্রকাশে এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

ভেরুণ্ড

"মণিবন্ধে কপিত্থাভ্যাং ভেরুণ্ডকর ইষ্যতে।
ভেরুণ্ডে পক্ষিদম্পত্যোর্ভেরুণ্ডো যুজ্যতে করঃ ॥"
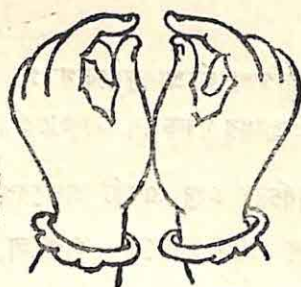
দুইটি কপিত্থ হস্ত মণিবন্ধে সংযুক্ত করলে ভেরুণ্ড হস্ত হয়।
পক্ষিদম্পতি অর্থ প্রকাশে ভেরুণ্ড মুদ্রার প্রয়োগ হয়।

সাধারণভাবে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রা তালিকা ও লক্ষণ এইখানেই শেষ হইল কিন্তু এ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থ প্রকাশক মুদ্রার উল্লেখ

নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ ও সঙ্গীত রত্নাকরে পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেবদেবীর ভূমিকায় বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত।

ব্রহ্ম হস্ত ঃ "ব্রহ্মণশ্চতুরো বামে হংসাস্যো দক্ষিণে করঃ।"

বাঁ হাতে চতুর হস্ত ও ডান হাতে হংসাস্য হস্ত করলে ব্রহ্ম হস্ত হয়।

ঈশ্বর হস্ত ঃ "শম্ভোর্বামে মৃগশীর্ষস্ত্রিপতাকস্তু দক্ষিণে।"

বাঁ হাতে মৃগশীর্ষ ও ডান হাতে ত্রিপতাক হস্ত করলে শম্ভু হস্ত বা ঈশ্বর হস্ত হয়।

বিষ্ণু হস্ত ঃ "হস্তাভ্যাং ত্রিপতাকস্তু বিষ্ণুহস্তঃ সঃ কীর্তিতঃ।"

দুই হাতেই ত্রিপতাক হস্ত করলে তাকে বিষ্ণু হস্ত বলে।

সরস্বতী হস্ত ঃ "সূচীকৃতে দক্ষিণে চ বামে চাংসসমাকৃতৌ।
কপিত্থকেঽপি ভারত্যাঃ করঃ স্যাদিতি সম্মতঃ।"

ডান হাতে সূচী ও স্কন্ধের সমরেখায় বাঁ হাতে কপিত্থ হস্ত করলে সরস্বতী হস্ত হয়।

পার্বতী হস্ত ঃ "ঊর্দ্ধাধঃ প্রসৃতারর্দ্ধচন্দ্রাখ্যৌ বামদক্ষিণৌ।
অভয়ো বরদশ্চৈব পার্বত্যাঃ করঃ ঈরিতঃ।"

বাঁ হাত অর্ধচন্দ্র অবস্থায় উর্ধ্বে ও ডান হাত অর্ধচন্দ্র অবস্থায় নিম্নমুখে প্রসারিত হলে অভয়া ও বরদা রূপে পার্বতী হস্ত হয়।

লক্ষ্মী হস্ত ঃ "অংসোপকণ্ঠে হস্তাভ্যাং কপিত্থস্তু শ্রিয়ঃ করঃ।"

দুই হাত কপিত্থ হস্ত অবস্থায় কাঁধের কাছে উত্তোলিত থাকলে লক্ষ্মী হস্ত হয়।

বিনায়ক হস্তঃ "উরোগতাভ্যাং হস্তাভ্যাং কপিথো বিঘ্নরাট্-করঃ।"

বক্ষোদেশে দুই হাত কপিথ হস্ত অবস্থায় রাখলে বিনায়ক হস্ত বা গণেশ হস্ত হয়।

ষন্মুখ হস্তঃ "বামে করে ত্রিশূলঞ্চ শিখরো দক্ষিণে করে।
উধ্বং গতে ষন্মুখস্য হস্তঃ স্যাদিতি কীর্তিতঃ॥"

বাঁ হাতে ত্রিশূল হস্ত ও উধ্বে ডান হাতে শিখর হস্ত করলে ষন্মুখ হস্ত বা কার্তিকেয় হস্ত হয়।

মন্মথ হস্তঃ "বামে করে তু শিখরো দক্ষিণে কটকামুখঃ।
মন্মথস্য করঃ প্রোক্তো নাট্যশাস্ত্রার্থকোবিদৈঃ॥"

বাঁ হাতে শিখর হস্ত ও ডান হাতে কটকামুখ হস্ত করলে মন্মথ হস্ত হয়।

ইন্দ্র হস্তঃ ত্রিপতাকঃ স্বস্তিকশ্চ শক্রহস্তঃ প্রকীর্তিতঃ॥"

দুই হাতে ত্রিপতাক স্বস্তিকাকারে রাখলে ইন্দ্র হস্ত হয়।

যম হস্তঃ "বামে পাশং দক্ষিণে তু সূচী যমকরঃ স্মৃতঃ॥"

বাঁ হাতে পাশ হস্ত ও ডান হাতে সূচী হস্ত করলে যম হস্ত হয়। যমরাজকে চতুর্ভুজ কল্পনা করা হয়।

অগ্নি হস্তঃ "ত্রিপতাকো দক্ষিণে তু বামে কাঙ্গুলহস্তকঃ।
অগ্নিহস্তঃ স বিজ্ঞেয়ো নাট্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥"

বাঁ হাতে কাঙ্গুল হস্ত ও ডান হাতে ত্রিপতাক হস্ত করলে অগ্নিহস্ত হয়।

বরুণ হস্তঃ "পতাকো দক্ষিণে বামে শিখরো বারুণঃ করঃ।"

বাঁ হাতে শিখর হস্ত ও ডান হাতে পতাক হস্ত করলে বরুণহস্ত হয়।

বায়ু হস্ত ঃ "অরালো দক্ষিণে হস্তে বামে চার্ধপতাকিকা॥
ধৃতা চেদ্বায়ুদেবস্য কর ইত্যভিধীয়তে।"

বাঁ হাতে অর্ধপতাক হস্ত ও ডান হাতে অরাল হস্ত করলে বায়ু হস্ত হয়। এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন অবতার হস্ত, নবগ্রহ হস্ত ও কর্মানুসারে জাতি হস্তেরও বিভিন্ন মুদ্রা আছে। শুধুমাত্র মুদ্রা সম্পর্কেই স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও অভিধান রচিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রয়োজনীয় মুদ্রাগুলির পরিচয় ও লক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

পতাক, স্বস্তিক, ডোলা হস্ত, অঞ্জলি, কটকাবর্ধন, শকট, পাশ, কীলক, কপিত্থ, শিখর, কূর্ম, হংসাস্য ও অলপদ্ম এ তেরটিকে নৃত্তের উপযোগী প্রধান মুদ্রারূপে গণ্য করা হয়।

নৃত্তহস্তগুলির পাঁচটি ধান গতি যথা ঊর্ধ্বগতি, অধোগতি, উত্তরাগতি, প্রাচীগতি ও দক্ষিণাগতি। পাদবিক্ষেপ অনুযায়ী এই গতি সঞ্চালিত হয়।

নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণে নৃত্তহস্তের সংখ্যা ও লক্ষণে পার্থক্য আছে। বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় লক্ষণভেদে এই মুদ্রাগুলির প্রয়োগ হয়। ভারতীয় নৃত্যের ভাবসম্পদের গভীরতা, ব্যাপ্তি ও সূক্ষ্মতা প্রকাশে পৃথক ঋষি, বর্ণ ও বংশসম্ভূত হস্ত মুদ্রাগুলির প্রতীকধর্মী প্রয়োগ, অধ্যাত্মভাব ও শিল্পপ্রতিভার সমন্বয়ের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

নন্দিকেশ্বর-সম্প্রদায় বহিরঙ্গের খুঁটিনাটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং নাট্যধর্মী অভিনয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। আঙ্গিকাভি-নয় পর্যায়ে অভিনয়দর্পণ একটি মূল্যবান গ্রন্থ, সেইজন্য এই অধ্যায়ে মুদ্রালক্ষণগুলি সম্পর্কে অভিনয়দর্পণের শ্লোক অনুযায়ী

বর্ণিত হয়েছে। মুদ্রার অন্যান্য লক্ষণগুলি 'কথাকলি' অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সিংহমুখ (সম্মুখ)

কাঙ্গুল (সম্মুখ)

চতুর (সম্মুখ)

৭

আহার্য, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়

। আহার্য অভিনয় ।

পূর্বেই বলা হয়েছে নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশসৃষ্টিতে, চরিত্র অলঙ্করণের অঙ্গসজ্জা, বসন-ভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয়, তাকে আহার্য অভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। আহার্য অর্থে আহরণীয় অর্থাৎ কৃত্রিম শোভা এবং এই শোভাযুক্ত অভিনয় আহার্য অভিনয়। মঞ্চসজ্জায় প্রাচীনকালে নটনটীদের পিছনে দৃশ্যপট ব্যবহার করা হত না। কিন্তু তা না থাকলেও দর্শকদের বোধের সুবিধার্থে নেপথ্যসজ্জার ব্যবস্থা ছিল। এই আহার্য অভিনয় ও নেপথ্যবিধানের প্রধান অঙ্গ ছিল পুস্ত, অলঙ্কার ও অঙ্গরচনা।

পুস্ত ঃ রঙ্গমঞ্চে পাহাড়, গুহা, রথ, বিমান, অশ্ব প্রভৃতি দেখাবার জন্য মাদুর, কাপড়, চাটাই, চামড়া প্রভৃতির সাহায্যে এদের যে কৃত্রিম প্রতিরূপ নির্মাণ করা হত তার নাম পুস্ত। এছাড়া কৃত্রিম মাথা, হাত, বিকটদর্শন বৃহৎ পুতুল প্রভৃতিও তৈরী করা হত। দশানন, গজাসুর প্রভৃতি চরিত্রের জন্য কৃত্রিম মাথা, হাত প্রভৃতির ব্যবহার করা হয়। অবশ্য অনেক সময় রঙ্গমঞ্চে পাহাড়

গুহার প্রতিরূপ না এনে বর্ণনার সাহায্যেও ঐ সব জিনিসের কথা বোঝান হত।

অলঙ্কার : মাল্য, আভরণ, বস্ত্র, কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, বিভিন্ন পোশাক ও আভরণাদি, এছাড়াও অলঙ্কারের প্রচুর বৈচিত্র্য, কাপড়ের রঙ, কেশবিন্যাস প্রভৃতির সাহায্যে শিল্পীদের চরিত্র বোঝান হত। সে সময় দেবতা, রাজা, মুনিকন্যা, সিদ্ধাঙ্গনা, রাক্ষসী প্রভৃতি চরিত্রের পার্থক্য তাদের বস্ত্রালঙ্কার ও সাজসজ্জা দেখেই দর্শকরা অনুমান করতে পারতেন।

নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী অলঙ্কারকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

'চতুর্বিধন্তু বিজ্ঞেয়ং দেহস্যাভরণং বুধৈঃ।
আবেধ্যং বন্ধনীয়ঞ্চ ক্ষেপ্যমারোপ্যকস্তথা।'

আবেধ্য, বন্ধনীয়, ক্ষেপ্য ও আরোপ্য এই চার প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে কুণ্ডলাদি আবেধ্য ; শ্রোণীসূত্র, অঙ্গদ প্রভৃতি বন্ধনীয় ; নূপুর, বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি ক্ষেপ্য ; স্বর্ণসূত্র ও বহুবিধ হার প্রভৃতি আরোপ্য। দেবতা ও নারীদের জন্য নাট্যশাস্ত্রে শিখাপাশ, কুণ্ডল, শিখাজাল, খড়্গপত্র, খণ্ডপত্র, বেণীগুচ্ছ, চূড়ামণি, দারক, মকরিকা, ললাটতিলক, মুক্তাজাল, গুচ্ছ, গবাক্ষি, কুসুম, কর্ণিকা, কর্নবলয়, পত্রকর্ণিকা, কর্ণ-বলয়, পত্রকর্ণিকা, কর্ণোৎপল. তিলক, পত্রলেখা প্রভৃতি অলঙ্কারের উল্লেখ ও বর্ণনা আছে।

এই অঙ্গসজ্জা, বেশভূষা ও অলঙ্কারের প্রয়োগের দিকে কিরূপ যত্ন নেওয়া উচিত তা শাস্ত্রানুযায়ী নর্তকীর মণ্ডন বা অলঙ্করণবিধির বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। "স্নিগ্ধ, বিস্তীর্ণ, অবেণীসংবদ্ধ কেশপাশ গ্রন্থিহীন অবস্থায় পৃষ্ঠে বিলীন থাকিবে। মস্তকে পুষ্পের মালা (chaplet) অথবা মুক্তাজালশোভিতা দীর্ঘা সরলা বেণী বিলম্বিত করিতে হইবে। ভালদেশে কস্তুরীচন্দনানুলেপনে বিচিত্র পত্র-লেখার উপর ঈষৎ অসংযত অলকগুচ্ছ শোভা পাইবে। নয়নযুগলে সূক্ষ্ম অঞ্জনরেখা। কর্ণযুগলে সমুজ্জ্বল বলয়াকৃতি কুণ্ডল বা তালপত্র।

দন্তপঙ্‌ক্তির প্রভায় সমগ্র রঙ্গভূমি প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। কপোলযুগলে কস্তুরীচিত্রিত পত্রভঙ্গরেখা (অলকা-তিলকা কাটা)। কণ্ঠে তারাহার দল-দল দুলিবে। স্থূল মুক্তাহারে কুচযুগল মণ্ডিত করিতে হইবে। প্রকোষ্ঠে বহুমূল্যরত্নখচিত সুবর্ণবলয়; অঙ্গুলীতে মাণিক্য, নীলা বা হীরকখচিত অঙ্গুরীয়কমুদ্রা। গাত্র হইবে চন্দনে ধূসর অথবা কুঙ্কুমে রঞ্জিত। পরিধানে দুগ্ধধবল দুকুলবসন। তনুর ঊর্দ্ধভাগ কূর্পাসকে (bodice) আবৃত; অথবা দেশের প্রথা অনুসারে কঞ্চুকও (হাতাশুদ্ধ জামা) পরিধান করা যাইতে পারে।" (অশোকনাথ শাস্ত্রী)।

অঙ্গরচনা: মুখ, হাত প্রভৃতিতে রঙ মাখান হচ্ছে অঙ্গরচনা। রঙের সাহায্যে বিশেষ জাতি বা চরিত্র বোঝান হত। যেমন সাধারণ দেবতা ও অপ্সরাদের রঙ করা হত গৌরবর্ণ। আবার ব্রহ্মা, রুদ্র ও স্কন্দকে সোনালী রঙ করা হত। চন্দ্র, শুক্র, বৃহস্পতি বরুণ, সমুদ্র, গঙ্গা প্রভৃতিকে সাদা, অগ্নিকে হলুদ রঙ, নারায়ণ, নর, বাসুকি, দৈত্য, দানব প্রভৃতিকে শ্যামবর্ণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব, বানর প্রভৃতিদের তপ্তকাঞ্চন রঙ করা হত। জাতি ও বর্ণ অনুযায়ী মর্তবাসীদেরও বিভিন্ন রঙের সাহায্যে তাঁদের প্রভেদ নির্দেশ করা হত। এ ছাড়াও শ্মশ্রুকর্ম অথবা গোঁফদাড়ির ব্যবহারের বৈচিত্র্য ছিল। রাজা, অমাত্য, সন্ন্যাসী ও পুরোহিতদের সাদা দাড়ি, গরীব দুঃখী ও তপশ্চর্যারত ব্যক্তিদের অপরিষ্কার দাড়ি, ঋষিদের রোমশা দাড়ি ও রাজা, রাজপুরুষ, সম্ভ্রান্ত ও বিলাসী ব্যক্তিদের জন্য বিচিত্র দাড়ি ব্যবহার করা হত।

এই সব ছাড়াও বিভিন্ন ভয়াল ভূমিকানুযায়ী মুখোস প্রভৃতিও ব্যবহার করা হত।

। বাচিক অভিনয়।

কাব্য, সাহিত্য ও নাটকের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে

অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এর উৎস ঋগবেদ; ভাব সঞ্চারী।

সাধারণ ভাবে নৃত্যকলায় আঙ্গিকাভিনয়ের মাধ্যমেই কাব্যের ও নাটকের ভাষা ও ভাব রূপায়িত হয়, সেজন্য বাচিক অভিনয় প্রধানতঃ নাট্যাংশের উপজীব্য। কণ্ঠস্বরের যথোচিত ব্যবহার ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রে বিস্তৃত আলোচনা আছে। প্রাচীনকালে নট-নটীদের আবৃত্তি অংশে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য আনার জন্য সঙ্গীত ব্যবহার করা হত। এবং বাক্যের অন্তর্গত অর্থ, রস ও ভাবের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন স্বর, স্থান ও বর্ণের প্রয়োগ হত। নৃত্যকলার প্রসঙ্গে বাহুল্য বোধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল না।

। সাত্ত্বিক অভিনয়।

মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে বিভিন্ন শারীরিক অবস্থার (সাত্ত্বিক ভাবসমূহের দ্বারা) সাহায্যে প্রকাশের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব বিপাস্থায়ী।

নাট্যশাস্ত্রের মতে 'দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং' অর্থাৎ সত্ত্ব হচ্ছে দেহ-মূলক বস্তু। নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণের মতে সাত্ত্বিকভাব আটটি যথা স্তম্ভ, স্বেদ, কম্প, অশ্রু, বিবর্ণতা, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ ও মূর্ছা।

স্তম্ভ বলতে শারীরিক ক্রিয়ার সাময়িক বিলোপ বুঝায়। হর্ষ, ভয়, রোগ, বিপদ, বিস্ময়, ক্রোধ প্রভৃতি থেকে এই ভাবের উৎপত্তি। সংজ্ঞাহীন, নিঃস্পন্দ, শূন্যজড়াকৃতি অবস্থায় স্তম্ভের অভিনয় হয়।

শ্রম, ব্যায়ামজনিত ক্লান্তি, দৃঢ় নিপীড়ন, ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, দুঃখ, রোগ, তাপ, আঘাত প্রভৃতির ফলে শরীরে স্বেদ দেখা দেয়। রতিভাব ও শারীরিক শ্রম প্রধানতঃ স্বেদবিন্দু উদ্গত করে। ব্যজন গ্রহণের দ্বারা, ঘর্মমার্জনা, বায়ুসেবনের ইচ্ছা প্রভৃতি বুঝিয়ে এই অভিনয় হয়।

রোমগুলি শরীরের উপর কণ্টকিত হয়ে ওঠার নাম রোমাঞ্চ।

ভয়, শৈত্য, হর্ষ, ক্রোধ, রোগ প্রভৃতি থেকে এই ভাবের উৎপত্তি। শরীর কণ্টকিত, রোমহর্ষণ, পুলকোদ্গম প্রভৃতির মাধ্যমে এই ভাবের অভিনয় হয়।

ভয়, হর্ষ, জরা, ক্রোধ, রুক্ষতা, রোগ, গর্ব, প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত বিস্বর ভাবকে স্বরভঙ্গ বলে। অভিভূত গদগদ ভাবের অভিনয়।

শীত, ভয়, হর্ষ, রোষ, পীড়া, অনুরাগ, দ্বেষ ও পরিশ্রম প্রভৃতি থেকে কম্পভাবের উৎপত্তি। অবিরাম স্ফুরণ ও কম্পনের মাধ্যমে এই ভাবের অভিনয় হয়।

শীত, ক্রোধ, ভয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রোগ, ক্লান্তি, তাপ, বিষাদ, রোষ প্রভৃতি থেকে বিবর্ণতা ভাবের উৎপত্তি। মুখরাগের পরিবর্তন, দেহের বর্ণান্তর ধারণ প্রভৃতির মাধ্যমে এই অভিনয় হয়। ভয়ে, শোকে, অনিমেষ দৃষ্টিপাতে, আনন্দে, ক্রোধাতিশয্যে, চোখে ধূম্র বা অঞ্জন লাগলে অশ্রু উদ্গত হয়।

চোখের জল ফেলা, চক্ষুমার্জনা, ছলছল ভাব প্রভৃতির মাধ্যমে এই অভিনয় হয়।

সুখ দুঃখের দ্বারা জ্ঞানের লোপ হলে তাকে মূর্ছা বলে। ভূমিতে পতন, নিশ্চেষ্ট ভাব, নিষ্কম্পতা, শ্বাসরোধ প্রভৃতির মাধ্যমে এর অভিনয় হয়। যে সব যৌবনসুলভ ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে রমণীরা লোকচিত্ত আকর্ষণ করতে পারে সেই সব যোষিদলঙ্কারগুলিও সাত্ত্বিক অভিনয়ের অঙ্গ।

এই সাত্ত্বিক যোষিদলঙ্কারগুলির মধ্যে ভাব, হাব, হেলা, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য, ধৈর্য, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলি প্রধান। অঙ্গজাত ও স্বভাবজাত এই সাত্ত্বিক অলঙ্কারগুলি অভিনয়ে অপরিহার্য।

জন্ম থেকে নির্বিকার—এমন মনে সদ্য উদ্ভূত প্রথম বিকারকে

'ভাব' বলে। ভ্রূ চোখ প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশক ভাবের বিকার অল্প দৃষ্টিগোচর হলে তাকে 'হাব' বলে। আবার এই বিকার যখন প্রকট হয়ে লক্ষ্যগোচর হয় তখন তাকে বলে 'হেলা'। রূপ, যৌবন, লালিত্য, ভোগ প্রভৃতি অঙ্গভূষণকে 'শোভা' বলা হয়। কামোন্মেষের ফলে শোভার দ্যুতি উজ্জ্বলতর হলে তাকে 'কান্তি' বলে। কান্তি উজ্জ্বলতর হলে তাকে 'দীপ্তি' বলা হয়। যে রমণীয়তা সকল অবস্থাতেই অম্লান থাকে তাকে 'মাধুর্য' বলে। ভীতিশূন্যতাকে 'প্রগল্‌ভতা' বলা হয়। সর্বদা বিনয়ী ও মধুর ভাবকে 'ঔদার্য' বলে। আত্মশ্লাঘামুক্ত অচঞ্চল মনোবৃত্তিই হচ্ছে 'ধৈর্য'। দেহ, বসনভূষণ, প্রেমালাপ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রীতিবশত প্রিয়তমের অনুকরণকে 'লীলা' বলা হয়। অভীষ্ট ব্যক্তিকে দর্শন করার ফলে চারিদিকে অকারণ ঘোরাফেরা, দাঁড়ান, বসা প্রভৃতি এবং মুখ, চোখ প্রভৃতির ভঙ্গীর যে বৈচিত্র্য তাকে 'বিলাস' বলে। যে প্রসাধন ও বেশবিন্যাস স্বল্প হলেও কান্তিকে দীপ্ত করে তাকে 'বিচ্ছিত্তি' বলে। গর্বিত অবস্থায় অভীষ্ট বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অনাদরের ভাবকে 'বিব্বোক' বলা হয়। অভীষ্টতম ব্যক্তিকে কাছে পাওয়ার আনন্দের উত্তেজনাবশত ঈষৎ হাস্য, শুষ্ক রোদন, ত্রাস, ক্রোধ, শ্রম প্রভৃতির যে মিশ্রণ তাকে 'কিলকিঞ্চিত' বলে। প্রিয়জন প্রসঙ্গে আলোচনার সময় প্রিয়ভাবনায় তন্ময়চিত্তা নারীর কান চুলকান, মাথার চুল ধরে নাড়া প্রভৃতি কাজগুলিকে 'মোট্টায়িত' বলা হয়। কেশ, স্তন, অধর প্রভৃতি স্পর্শিত হলে আনন্দ সত্ত্বেও মাথা ও হাত নেড়ে অসম্মতির ভাবটিকে 'কুট্টমিত' বলে। প্রিয় আগমনে আনন্দোচ্ছ্বাসে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে দেহের এক স্থানের অলঙ্কার অন্য স্থানে পরাকে 'বিভ্রম' বলে। সৌকুমার্যের সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসকে 'ললিত' বলা হয়। সৌভাগ্য, যৌবন প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অহঙ্কারের ফলে যে চিত্তবিকার হয় তাহাকে 'মদ' বলে। কথা বলার সময়ে ব্রীড়াবশতঃ যে নীরবতা তাকে 'বিকৃত' বলে। প্রিয়-

বিচ্ছেদে কামাবেশজনিত আচরণকে 'তপন' বলা হয়। প্রিয়তমের কাছে কপটভাবে না জানার ভান করে জানা জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করাকে 'মৌগ্ধ্য' বলা হয়। রমণীয় বস্তু দর্শনের ফলে যে চিত্তচাঞ্চল্য তাকে 'কুতূহল' বলে। যৌবনের আবির্ভাবে অকারণ হাসিকে 'হসিত' বলে। সামান্য কারণে অথবা অকারণে প্রিয়তমের কাছে যে ব্যস্ততা তাই 'চকিত'। প্রিয়তমের সাথে বিহারকালে যে ক্রীড়া তাকেই 'কেলি' বলা হয়।

এইসব অঙ্গজাত ও স্বভাবজাত অলঙ্কারগুলি সাত্ত্বিক অভিনয়ে উৎকর্ষ ও শোভাসম্পাদন করে।

৮

রসনিষ্পত্তি

নৃত্যকলার আত্মারূপে রস ও ভাবই স্বীকৃত। রসনিষ্পত্তি না হলে কোন শিল্পসৃষ্টিই শিল্প আখ্যা লাভ করতে পারে না। যেমন লাবণ্যযুক্ত না চলে রমণীদেহ শত অলঙ্কার ও বসনভূষণ প্রসাধনে বহিরঙ্গে উজ্জ্বল হলেও প্রাণহীন মনে হয়। ঠিক তেমনই নৃত্যকলা আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য অভিনয়ে সমৃদ্ধ হয়ে প্রদর্শিত হলেও তার রস-উদ্বোধন না হলে সার্থকতা লাভ করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে শিল্পকলার ও রসানুভবের প্রতি বিভিন্ন আচার্যেরা পরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। উপনিষদের ঋষি পরমপুরুষ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"রসো বৈ সঃ" অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। রসনিষ্পত্তি সম্পর্কে এই উচ্চ আদর্শ কল্পনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রসভাবব্যঞ্জনা দ্বারা আনন্দবিধান, উপদেশদান ও মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদন এর যে তত্ত্ব নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে সেই তত্ত্বটি আরো সুপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল।

নাট্যশাস্ত্রের মতে রস হচ্ছে আস্বাদন। এবং রস ও ভাবের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। রস ও ভাবে জন্য জনক বা কার্যকারণ সম্বন্ধ। অবশ্য এই রসতত্ত্ব সম্পর্কে পরবর্তীকালে বিভিন্ন

ভাষ্যকারদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবের সাহায্যে রসনিষ্পত্তি হয়। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব সহযোগে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব সহৃদয়ে ব্যক্ত হলেই রসতা প্রাপ্ত হয়।

রসের মানসিক উপাদান হচ্ছে মনের ভাব অর্থাৎ বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি বা 'ইমোশন'গুলি। লৌকিক দশায় প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে অনাস্বাদ্য থাকিবার পর যা বাচিক অভিনয় প্রক্রিয়ারূঢ় হয়ে নিজেকে আস্বাদ্য (রসরূপে) পরিণত করে তাই ভাব।

মানুষের মনে ভাব অসংখ্য। কারণ এই চিত্তবৃত্তিগুলি শুধুমাত্র সুখদুঃখের অনুভূতি নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন চিত্তবৃত্তিগুলি একটি সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা (Complete Psychosis), বিভিন্ন লক্ষণ-যুক্ত চিন্তার পরিবর্তনে ভাবেরও পরিবর্তন ঘটে। এই অসংখ্য ভাবগুলির মধ্যে নয়টি ভাবকে স্থায়ীভাবরূপে স্বীকার করা হয়।

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম এই নয়টি স্থায়ীভাব। ভাব হচ্ছে চিত্তবৃত্তি ; সুতরাং এর উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। কিন্তু এই ভাবগুলি স্বরূপতঃ বিনষ্ট বলে বোধ হলেও সংস্কাররূপে এ চিরকাল বিদ্যমান থাকে এবং প্রতীতিকালে এর অনুসন্ধান পাওয়া যায়—এইজন্যই একে স্থায়ীভাব বলা হয়। আলঙ্কারিকরা বলেন, ভাবরূপ বহু ভাবের মধ্যে যে ভাবগুলি বহুলরূপে পরিলক্ষিত হয় সেগুলিকে স্থায়ীভাব বলে।

এই নয়টি স্থায়ী ভাব বিভাবও অনুভাবের সংযোগে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত এই নয়টি রসে পরিণত হয়।

এই ভাবগুলি ছাড়াও মানুষের মনে আরো তেত্রিশটি ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় যথা—নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্তি, জাগরণ, অমর্ষ,

অবহিত্থ, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক। এই ভাবগুলি স্বতন্ত্র থাকতে পারে না। এগুলি অন্যান্য স্থায়ী ভাব-গুলির অভিমুখে মনকে চালিত করে। এই চরণশীলতার জন্য এই ভাবগুলিকে সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ভাব বলা হয়। ভরতের মতে, রসের প্রতি বিবিধ প্রকারে অভিমুখভাবে চরণশীল ভাবই ব্যাভিচারী; ইহারা অস্থায়ী। সমুদ্রজলে তরঙ্গের মত রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের উপর ইহারা কখনও আবির্ভূত কখনও বা তিরোভূত হয়। রসসৃষ্টির প্রয়োজনে এদের আবির্ভাব, কার্যনিষ্পত্তির পরেই অন্তর্ধান, সঞ্চারীভাবের এই হল প্রধান বিশেষত্ব।

ভাবগুলিকে আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন ভাগে ভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের মতে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, অশ্রু, বিবর্ণতা ও প্রলয় এই আটটিকেই সাত্ত্বিক ভাব বলা হয়।

রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের যা উদ্বোধক, কারণ বা হেতু তাকে বিভাব বলে। বিভাবের সাহায্যেই আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।

"স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা।
বহে মম শিরে শিরে এ কী দাহ, কি প্রবাহ
চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িৎলতা"

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ এখানে নায়িকার চিত্তে রতিভাবের উদ্বোধন করে তার প্রেমানুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। আবার

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে
নয়নে নয়নে।"

সহৃদয় দর্শকের চিত্তে এই দৃশ্যে সেই ভাব পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে।

বিভাব দু রকমের—আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। যাকে অবলম্বন করে রতি প্রভৃতি ভাব মনে জেগে ওঠে তাকে আলম্বন বিভাব বলে। সাধারণত নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতিকে অবলম্বন করেই রসোদ্‌গম হয়।

অর্জুন। "কাহারে হেরিলাম! আহা!
সে কি সত্য, সে কি মায়া!
সে কি কায়া,
সে কি সুবর্ণকিরণে রঞ্জিত ছায়া!
(চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ)
এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও, নও স্বপন নও।
অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা
বহে সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা॥"

এখানে চিত্রাঙ্গদাকে অবলম্বন করে অর্জুনের মনে রতিভাবের উদ্বোধন ঘটছে।

যা রসকে উদ্দীপিত করে তাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। বেশ, ভূষা, রূপ, দেশ, কাল, চন্দ্র, চন্দন, কোকিলালাপ, ভ্রমরঝঙ্কার, মলয়, পবন, প্রকৃতি প্রভৃতি উদ্দীপনের প্রধান সহায়ক।

চিত্রাঙ্গদা। "কুঞ্জদ্বারে বনমল্লিকা
সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,
সারা দিন-রজনী অনিমিখা
কার পথ চেয়ে জাগে।"

এখানে চিত্রাঙ্গদার চিত্তে বহিঃপ্রকৃতি প্রেমকে উদ্দীপনা দান করছে।

অবলম্বন ও উদ্দীপন কারণসমূহের দ্বারা উদ্বুদ্ধ রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের বহিঃপ্রকাশ যা লোকজগতে কার্যরূপে পরিচিত তাকে অনুভাব বলে। অনুভাবের সাহায্যেই স্থায়ীভাব সহৃদয় দর্শকসমাজে অনুভাবিত বা প্রকাশিত হয়। কটাক্ষ, ভ্রূবিক্ষেপ, হাস্য, বাহু প্রভৃতি অঙ্গ বিক্ষেপের মাধ্যমে অনুভাব প্রকাশিত হয়। বিভাব ও অনুভাবে নিত্যসম্বন্ধ। বিভাব হচ্ছে কারণ আর অনুভাব হচ্ছে কার্য। অর্থাৎ বলা যেতে পারে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে অনুভাবের উৎপত্তি হয়। অনুভাবের মধ্য দিয়েই ভাবটিকে চেনা যায়।

"কোন দেবতা সে কি পরিহাসে ভাসালো মায়ার ভেলায়
স্বপ্নের সাথি, এসো মোরা মাতি স্বর্গের কৌতুকখেলায়।
সুরের প্রবাহে হাসির তরঙ্গে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।"

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে এই ছবিটি অনুভাবের উপাদানে সমৃদ্ধ এবং ভাবটির প্রকাশক।

এখন বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সহযোগে রসনিষ্পত্তি। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীভাব স্থায়ীভাবকে রসতা দান করে। রসের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে স্থায়ীভাব সমুদ্র ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব হচ্ছে তরঙ্গ। ব্যভিচারীভাবগুলি স্থায়ীকে আশ্রয় করেই থাকে এবং পারস্পরিক ফলন-প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে স্থায়ীভাবকে আস্বাদ্য রসে পরিণত করে।

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটিকেই রস বলে প্রথমে গণ্য করা হত। পরবর্তী কালে শান্তকেও রসরূপে গণ্য করে নবরস-এর কথা বলা হয়েছে।

"শৃংগারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ রসা স্মৃতাঃ॥'

নবরস।

শিল্পী : কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি

মোহিনীআট্যম
শিল্পী : শ্রীমতী থাঙ্কমনি কুট্টি।

শৃঙ্গার ঃ শৃঙ্গ শব্দের অর্থ কামোদ্রেক। স্বভাবতই কামোদ্রেকের কারণস্বরূপ যে রসের প্রকৃতি উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বল তাকে শৃঙ্গার বলে। শৃঙ্গারের স্থায়ীভাব রতি। এই রস শ্যামবর্ণ এবং এর দেবতা বিষ্ণু।

এই রসের দুটি অধিষ্ঠান--সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। রতি যেখানে অত্যন্ত প্রবল অথচ অভীষ্ট ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না সেই অবস্থাকে বিপ্রলম্ভ বলে। বিপ্রলম্ভ অবস্থায় অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে নির্বেদ, শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া, শ্রম, মদ, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, জড়তা, বিষাদ, আবেগ, উৎকণ্ঠা, নিদ্রা, স্বপ্ন, অবহিত্যা, অমর্ষ, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক।

যখন বিলাসী ও অনুরক্ত নায়ক নায়িকা সাক্ষাৎকার, স্পর্শ প্রভৃতির মাধ্যমে পরস্পরকে উপভোগ করে সেই অবস্থাকে সম্ভোগ বলে। সম্ভোগ অবস্থায় অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ও অশ্রু। মন-ব্যভিচার হচ্ছে গ্লানি, মদ, ধৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, নিদ্রা, উন্মাদ। শৃঙ্গারকে আদিরস বলা হয়।

হাস্য ঃ চেহারা, অঙ্গভঙ্গী, পোশাক, আচার আচরণ ইত্যাদির বিকৃতি থেকে কৌতুক সৃষ্টি হলে হাস্যরস হয়। হাস্যের স্থায়ীভাব হাস। রঙ শাদা ও দেবতা প্রমথ। এর দুটি প্রকাশ—আত্মস্থ ও পরস্থ। নিজে হাসলে হয় আত্মস্থ ও পরকে হাসালে হয় পরস্থ।

হাস্যের ছটি ভেদ, যথা—স্মিত, হসিত, বিহসিত, অব-হসিত, অপহসিত ও অতিহসিত। যে হাস্যে চোখদুটি

সামান্য বিকশিত ও অধর স্পন্দিত হয় তাকে স্মিত হাসি বলে। সামান্য দাঁত দেখা গেলে তাকে বলে হসিত। মধুর স্বরযুক্ত হাস্যকে বিহসিত বলা হয়। কাঁধ ও মাথা কম্পিত হলে সেই হাস্যকে অবহসিত বলে। যে হাসিতে চোখে জল আসে তাকে অপহসিত বলা হয়। হাসির সঙ্গে অঙ্গবিক্ষেপ ঘটলে তাকে অতিহসিত বলে।

হাস্যের অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে বিবর্ণ, হাস, স্বরভঙ্গ। মন- ব্যভিচার হচ্ছে মদ, স্মৃতি, হর্ষ, চপলতা, গর্ব, আবেগ, মতি, বিতর্ক।

করুণ ঃ অনিষ্ট ও শোকের ফলে করুণরসের উৎপত্তি। বর্ণ কপোত ও দেবতা যম। স্থায়ীভাব শোক।

অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ, বিবর্ণ ও অশ্রু। মন-ব্যভিচার হচ্ছে শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, উৎকণ্ঠা, স্বপ্ন, অবহিত্যা, ব্যাধি, মরণ ও ত্রাস।

রৌদ্র ঃ রৌদ্ররসের স্থায়ীভাব ক্রোধ। বর্ণ রক্ত ও দেবতা রুদ্র।

আলম্বনবিভাব হচ্ছে শত্রু ও তার চেষ্টাতেই উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে অসূয়া, মদ, স্মৃতি, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ ও বিতর্ক।

বীর ঃ বীররসের প্রকৃতি উত্তম এবং এর স্থায়ীভাব উৎসাহ।
বর্ণ হেম ও দেবতা মহেন্দ্র।
দান, ধর্ম, যুদ্ধ ও দয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই রসের চার প্রকার ভেদ হয়। অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, বিবর্ণ, অশ্রু ও সংমোহ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, স্মৃতি, ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ ও বিতর্ক।

ভয়ানক ঃ ভয়ানকরসের স্থায়ীভাব ভয়, বর্ণ কৃষ্ণ ও দেবতা কাল।
অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু, প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে শঙ্কা, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, আবেগ, অপস্মার ও ত্রাস।

বীভৎস ঃ বীভৎসরসের স্থায়ীভাব জুগুপ্সা। দোষ দেখা ইত্যাদির ফলে কোন বিষয় থেকে যে ঘৃণার উদ্ভব হয় তাকে জুগুপ্সা বলে। বীভৎসরসের বর্ণ নীল এবং দেবতা মহাকাল।
অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে রোমাঞ্চ ও প্রলাপ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে মদ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা ও ব্যাধি।

অদ্ভুত ঃ অদ্ভুতরসের স্থায়ীভাব বিস্ময়। বর্ণ পীত ও দেবতা ব্রহ্মা।
অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও বিবর্ণ। মন-ব্যভিচার হচ্ছে অসূয়া,

দৈন্য, চিন্তা, হর্ষ, জড়তা, আবেগ ও মতি।

শান্ত ঃ শান্তরসের স্থায়ীভাব শম এবং প্রকৃতি উত্তম। এর বর্ণ কুন্দেন্দুসুন্দর এবং দেবতা শ্রীনারায়ণ। অনিভ্যতা উপলব্ধি থেকে আলম্বন করেই এই রস।

অনুভাব ও তনু-ব্যভিচার হচ্ছে স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, অশ্রু। মন-ব্যভিচার হচ্ছে নির্বেদ, হর্ষ, স্মৃতি, মতি, ধৃতি, নিদ্রা প্রভৃতি।

নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিবোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব, মরণ, অলসতা, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসুক্য, উন্মাদ, শঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি, সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা ও বিতর্ক- এই ব্যভিচারী ভাবগুলির উৎস ও লক্ষণ সম্পর্কে নৃত্যশিল্পীদের বিশেষ ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

নির্বেদ ঃ আপদ, ঈর্ষা, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির ফলে যে আত্মাবমাননা, তাকে নির্বেদ বলে। এর থেকে দৈন্য, চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বিবর্ণতা, উৎ-শ্বাস প্রভৃতি তনু-ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়।

আবেগ ঃ আবেগ অর্থে সাধারণভাবে ব্যস্ততা বোঝায়। বিভিন্ন আবেগে বিভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন বৃষ্টিজাত আবেগে দেহ কুঁকড়ে যায়, আবার অগ্নিজাত আবেগে আসে বিহ্বলতা। আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেলে যেমন আসে আনন্দ আবার না পেলে শোক। এর তনু-ব্যভিচার অসংখ্য।

দৈন্য ঃ দুর্দশার জন্য যে নিস্তেজভাব, তাকে দৈন্য বলে। দৈন্য মলিনতা প্রভৃতি তনু-ব্যভিচার সৃষ্টি করে।

শ্রম ঃ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ, রতিক্রিয়া প্রভৃতির ফলে যে ক্লান্তি আসে তাকে শ্রম বলে। ঘন ঘন শ্বাস, নিদ্রা প্রভৃতি তনু-ব্যভিচার শ্রম সৃষ্টি করে।

মদ ঃ মদ্যপানজনিত প্রভাব ও আনন্দের সংমিশ্রণে যে অবস্থা তাকে মদ বলা হয়। এর থেকে স্তম্ভ, কম্প, অশ্রু প্রভৃতি তনু-ব্যভিচার সৃষ্টি হয়।

জড়তা ঃ আকাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা অকল্পনীয় কিছু হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হলে যে কর্তব্যবিমূঢ়তা আসে তাকে জড়তা বলে। এর থেকে নির্ণিমেষ নিরীক্ষণ, স্তব্ধতা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

উগ্রতা ঃ বীরত্ব অথবা অন্যায় আচরণ প্রভৃতির জন্যে মেজাজ খুব গরম হলে সেই অবস্থাকে উগ্রতা বলে। স্বেদ, শিরঃকম্পন, তর্জন, তাড়ন প্রভৃতি এর ফলে সৃষ্ট হয়।

মোহ ঃ দুঃখ, শোক, আবেগ, ভয় ও অতিরিক্ত চিন্তার ফলে যে চিত্তবৈকল্য আসে তাকে মোহ বলে। এর থেকে ঘূর্ণমান চক্ষু, ভূমিতে পতন, ভ্রমণ, অচেতন ভাব প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।

বিবোধ ঃ ঘুম ভেঙে যাবার পর চেতনার যে অবস্থা হয় তাকে

বিবোধ বলে। এর ফলে হাই তোলা, আড়মোড়া ভাঙা, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শয়নকক্ষের চার পাশ দেখা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

স্বপ্ন : নিদ্রামগ্ন অবস্থায় মানুষের যে বিষয়ানুভূতি তাকে স্বপ্ন বলে। এর থেকে ক্রোধ, আবেগ, ভয়, গ্লানি, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জন্মে।

অপস্মার : গ্রহাদির প্রভাবে অথবা স্নায়ুবিকারজনিত রোগে মনের যে বিকলতা জন্মায় তাকে অপস্মার বলে। এর ফলে স্বেদ, স্তম্ভ, কম্পন প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

গর্ব : বিদ্যা, রূপ, বংশকৌলিন্য প্রভৃতি থেকে যে অহঙ্কার জন্মে সেই মানসিক অবস্থাকে গর্ব বলে। এর ফলে বিনয়ের অভাব, অবজ্ঞা প্রদর্শন, উন্নাসিকতা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

মরণ : আঘাত প্রাপ্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলে মরণ ঘটে। এর ফলে শীতলতা, কাঠিন্য, ভূমিতে পতন প্রভৃতি অবস্থা সৃষ্ট হয়।

আলস্য : পরিশ্রম, গর্ভধারণ প্রভৃতির ফলে যে জড়তা দেখা যায় তাকে আলস্য বলে। এর ফলে হাই ওঠা, বসে থাকা, নিদ্রাবেশ প্রভৃতি অবস্থার উদ্ভব হয়।

অমর্ষ : অপমান, আক্ষেপ, নিন্দা প্রভৃতির ফলে মনের যে অভিনিবিষ্টতা তাকে অমর্ষ বলে। এর থেকে

শিরঃকম্পন, ভ্রূকুঞ্চন, শাসন, তাড়ন, রক্তবর্ণচক্ষু প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

নিদ্রা ঃ অবসাদ, পরিশ্রম, মদমত্ততা প্রভৃতির ফলে মনের যে নিষ্ক্রিয় অবস্থা আসে তাকে নিদ্রা বলে। উৎ-শ্বাস, আলস্য, হাই তোলা প্রভৃতি অবস্থা এর থেকে সৃষ্ট হয়।

অবহিত্থা ঃ লজ্জা, গৌরব, ভয়, গুপ্তপ্রণয় প্রভৃতির ফলে আনন্দের ভাবটিকে গোপন করার প্রচেষ্টার ভাবকে অবহিত্থা বলে। এর ফলে ব্যস্ততা, হঠাৎ অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ, অস্ফুটকণ্ঠে কথা বলা, মাটির দিকে চেয়ে থাকা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ঔৎসুক্য ঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুগুলি না পাওয়ার ফলে কালক্ষেপ-জনিত যে অসহিষ্ণুতা ঘটে তাকে ঔৎসুক্য বলে। এর থেকে স্বেদ, ব্যস্ততা, দীর্ঘনিশ্বাস, চিত্তসন্তাপ প্রভৃতির উদ্ভব হয়।

উন্মাদ ঃ কাম, ভয়, শোক প্রভৃতির কারণে যে চিত্ত-সম্মোহ জন্মে তাকে উন্মাদ বলা হয়। এর ফলে প্রলাপ, হাসি, কান্না প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

শঙ্কা ঃ নিজের ত্রুটি, শত্রুর ক্রূরতা প্রভৃতি থেকে বিপদের যে ভাবনা তাকে শঙ্কা বলে। বিবর্ণতা, কম্পন, স্বরবিকৃতি প্রভৃতি এর ফলে সৃষ্টি হয়।

স্মৃতি ঃ চিন্তা, কোন কিছুর সাদৃশ্যবোধ প্রভৃতি কারণে পূর্ব

অনুভূত বিষয় সম্পর্কে যে বোধ তাকে স্মৃতি বলে। ভ্রূ তোলা প্রভৃতি অবস্থা এর থেকে সৃষ্ট হয়।

মাত ঃ উচিত অনুচিত বিবেচনা করে কোন বিষয় নির্ধারণ করাকে মতি বলে। এর থেকে ধৈর্য, সন্তোষ, হাসি, নিজের উপর অত্যন্ত আস্থা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ব্যাধি ঃ স্নায়বিক দুর্বলতা, বাত প্রভৃতির ফলে জ্বর প্রভৃতি হলে তাকে ব্যাধি বলে। এর থেকে কম্পন, মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ত্রাস ঃ উল্কাপাত, বজ্রপাত, বিদ্যুত, প্রচণ্ড ঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ত্রাস-এর উৎপত্তি হয়। কম্পন এর প্রধান অবস্থা।

ব্রীড়া ঃ ধৃষ্টতার অভাবকে ব্রীড়া বলে। মাথা নত করে থাকা এর প্রধান লক্ষণ।

হর্ষ ঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করার ফলে যে মানসিক সন্তোষ তাকে হর্ষ বলে। অশ্রু, অস্ফুট গদগদভাষ প্রভৃতি এর লক্ষণ।

অসূয়া ঃ অপরের গুণ, সমৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে অহঙ্কারজনিত অসহিষ্ণুতাকে অসূয়া বলে। পরচর্চা, ভ্রূকুটি, অবজ্ঞা, ক্রোধভাব প্রভৃতি এর ফলে উদ্ভূত হয়।

বিষাদ ঃ কোন বিষয় থেকে নিষ্কৃতির উপায়ের অভাবজনিত

উদ্যমহীনতাকে বিষাদ বলে। চিত্তসন্তাপ, উৎ-শ্বাস, দীর্ঘনিশ্বাস, সাহায্য অন্বেষণ প্রভৃতি এর থেকে উদ্ভূত হয়।

ধৃতি : জ্ঞানচর্চা, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আগমন প্রভৃতির ফলে কামনাচরিতার্থতাকে ধৃতি বলে। উল্লাস, সপ্রতিভতা, হাস্যময়তা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

চপলতা : মাৎসর্য, অনুরাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত অস্থিরতাকে চপলতা বলে। ভৎসনা, স্বচ্ছন্দ আচরণ, লঘুতা, পরুষভাব প্রভৃতি এর লক্ষণ।

গ্লানি : রতি; মনস্তাপ, ক্ষুধা, পিপাসা, পরিশ্রম প্রভৃতির ফলে উদ্ভূত নিষ্প্রাণতাকে গ্লানি বলে। কম্পন, বিবর্ণতা, কৃশতা, অবসাদ, উদ্যমহীনতা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

চিন্তা : প্রয়োজনীয় এবং হিতকরবস্তু না পাওয়ার ফলে যে মানসিক ভাবনা তাকেই চিন্তা বলে। শূন্যতা, দীর্ঘনিশ্বাস, অন্তর্জালা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

বিতর্ক : কোন বিষয়ে মতের ঐক্য না হলে, সন্দেহ থাকলে হাত পা মাথা সঞ্চালন করে বিচার করাকে বিতর্ক বলে। ভ্রূকুঞ্চন, শির, হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতির সঞ্চালন এর লক্ষণ।

নাট্যশাস্ত্রের মতে মূলরস হচ্ছে শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস। এদের মূল ভাব থেকেই সকল ভাব জন্মগ্রহণ করে। শৃঙ্গার থেকে

হাস্যের উৎপত্তি, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত ও বীভৎস থেকে ভয়ানক এর সৃষ্টি। করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানকের সঙ্গে শৃঙ্গাররস বিরোধী। ভয়ানক ও করুণের সঙ্গে বিরোধী হাস্যরস। হাস্য ও শৃঙ্গারের বিরোধী করুণরস। হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানকরসের বিরোধী রৌদ্ররস। ভয়ানক ও শান্তরসের বিরোধী বীররস। এবং শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্তরসের বিরোধী ভয়ানক রস। বীর, শৃঙ্গার, রৌদ্র, হাস্য ও ভয়ানকের বিরোধী শান্তরস। শৃঙ্গারের সাথে বীভৎসের বিরোধিতা।

বিভিন্ন ভাবের আভাস, উপশম, উদয়, সন্ধি ও মিশ্রণে এই রসনিষ্পত্তি নৃত্যকলা ও সকল শিল্পের আত্মা ও প্রাণ এবং সার্থকতার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ, কারণ হিন্দু মনোবিজ্ঞানীরা অন্তঃকরণ বা মনকে মানুষ ও প্রাণীর নিয়ামক বলে মনে করেন।

পূর্বরঙ্গ

অন্যান্য মহৎ শিল্পের মত নৃত্যকলারও অন্যতম উদ্দেশ্য মানবমনের অন্তর্নিহিত কল্পনাশক্তি ও ছন্দোবোধকে ক্রিয়াশীল করে তোলা। তাই শুধুমাত্র স্বাভাবিকতার দিকে বেশী জোর না দিয়ে, তার যথাযোগ্য ভাব বজায় রেখে, বিভিন্ন বিচিত্র পদ্ধতিতে ছন্দ সৃষ্টি করে দর্শকমনকে রঞ্জিত ও সরস করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

নাট্যদর্শকবৃন্দ যাতে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তিকে বাহ্য জগতের প্রভাব মুক্ত করে রসাস্বাদনের অনুকূল অবস্থায় আসতে পারেন সেজন্য নাট্যারম্ভের প্রাক্‌কালে পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানের অয়োজন।

নাট্যশাস্ত্রমতে যেহেতু রঙ্গপ্রয়োগের এই অংশটি পূর্বেই প্রযুক্ত হয় তাই এর নাম পূর্বরঙ্গ। নৃত্যের সুচনার আগে যে নমস্কারক্রিয়া, যাকে পুষ্পাঞ্জলি বলা হয় তাও পূর্বরঙ্গ। অভিনয়দর্পণে এই প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা আছে তা উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

> "বিঘ্নানাং নাশনং কর্তুং ভূতানাং রক্ষণায় চ।
> দেবানাং তুষ্টয়ে চাপি প্রেক্ষকাণাং বিভূতয়ে ॥
> শ্রেয়সে নায়কস্যাত্র পাত্রসংরক্ষণায় চ।
> আচার্যশিক্ষাসিদ্ধ্যর্থং পুষ্পাঞ্জলিমথারভেৎ ॥

এবং কৃত্বা পূর্বরঙ্গং নৃত্যং কার্যং ততঃ পরম্।
নৃত্যং গীতাভিনয়নভাবতালযুতং ভবেৎ ॥
আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ ॥
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ ॥"

বিঘ্ন নাশের জন্য, প্রাণীগণের রক্ষাবিধানের জন্য, দেবতাদের তুষ্টির জন্য, দর্শকবৃন্দের বিভূতিলাভের জন্য, নায়কের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির জন্য, পাত্রের রক্ষণের জন্য ও গুরুপ্রদত্ত শিক্ষায় সিদ্ধিলাভের জন্য পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা কর্তব্য। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতেও নাট্যবস্তু প্রয়োগের পূর্বে রঙ্গবিঘ্নশান্তির জন্য নটনটী, কুশীলবগণ যে অনুষ্ঠানটি করেন তাই পূর্বরঙ্গ। আবার উপরোক্ত শ্লোক থেকে দেখা যাচ্ছে যে নৃত্যের আনুষঙ্গিক অন্তর্ছন্দের সাহায্যে রূপদান করার জন্য পূর্বরঙ্গে শোভাসম্পাদক নৃত্যের বিধি ছিল। এই নৃত্য-গীত ও অভিনয় ভাব ও তালযুক্ত। বদনের মাধ্যমে গীতের অবলম্বন, হস্তের দ্বারা গীতের অর্থ প্রদর্শন, নয়নে ভাব প্রকাশ এবং পদদ্বয়ে তালরক্ষা। আবার যেখানে হস্ত, সেখানেই নয়ন এবং যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি এবং যেখানে মন সেখানেই ভাব আর যেখানে ভাব সেখানেই রস।

যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে তার সাথে পূর্বরঙ্গের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। পূর্বরঙ্গের সাহায্যে আবহপরিমণ্ডলের সৃষ্টি করা হত। এককথায় পূর্বরঙ্গ দর্শকবৃন্দের রঞ্জনের পূর্বকৃত্যের আয়োজন। এই পর্যায়ে অভিনয় আরম্ভের আগে গীত, তাল, নৃত্য, পাঠ্য প্রভৃতির ব্যস্ত বা সমস্তভাবে যে প্রয়োগ তাই হচ্ছে পূর্বরঙ্গ।

নাট্যশাস্ত্রের মতে পূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গ। এদের মধ্যে প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবনা, বক্ত্রপানি, পরিঘট্টনা, পরিবন্দনা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসরিত ও আসরিতক্রিয়া এই নয়টি

যবনিকার অন্তরালে অনুষ্ঠিত হয়। গীতক, উত্থাপন, পরিবর্ত্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত ও প্ররোচনা এই দশটি যবনিকা উত্তোলিত করে বাইরে অনুষ্ঠিত হয়।

এই পূর্বরঙ্গ আবার চতুরস্র, ত্রস্র, চিত্র ও শুদ্ধ এই চার পর্যায়ে বিভক্ত। পূর্বরঙ্গের 'গীতক' অংশ হচ্ছে গীতবিধি, এর বিষয় হচ্ছে দেবস্তুতিকীর্তন। এই গীত অঙ্গসঞ্চালন বাদ দিয়ে প্রয়োগ হলে সেটা হচ্ছে শুদ্ধপূর্বরঙ্গ আর যদি নৃত্ত সংমিশ্রিত হয়ে প্রযুক্ত হয় তাহলে সেটা হবে চিত্রপূর্বরঙ্গ। উদ্ধতপূর্বরঙ্গে মহাদেব প্রবর্তিত উদ্ধত করণ ও অঙ্গহারের প্রয়োগ হয় এবং সুকুমারপূর্বরঙ্গে পার্বতী প্রবর্তিত সুকুমার অঙ্গহার ও করণ অর্থাৎ লাস্যভঙ্গীর প্রয়োগ হয়।

'জর্জর' দণ্ড হাতে নৃত্যের পর মহাচারী নৃত্যের অনুষ্ঠান শেষে সূত্রধার সর্বশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিগত পর্যায়ে অভিনয়ারম্ভের সূচনা করতেন।

দর্শকবৃন্দের কল্পনাকে ক্রিয়াশীল করে তুলে রস উদ্বোধনের এই প্রক্রিয়া 'পূর্বরঙ্গ' ভারতীয় নাট্যকলার এক অভিনব প্রকাশ।

। **পূর্বরঙ্গবিধি** ।

পূর্বরঙ্গ	যবনিকার অন্তরালে প্রযোজ্য	যবনিকার বাহিরে প্রযোজ্য
(ক) চতুরস্র (খ) ত্রস্র (গ) চিত্র (ঘ) শুদ্ধ (ঙ) মিশ্র	প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিবন্দনা বা পরিঘট্টনা সঙ্ঘোটনা বা সঙ্ঘোটনা, মার্গাসারিত ও আসারিত ক্রিয়াসমূহ।	গীতক (বর্ধমানাদি গীত বিধি), উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা (ধ্রুবা), রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত ও প্ররোচনা।

। নবরস ।

সংখ্যা	রস	ভাব	বর্ণ	অধিদেবতা
১	শৃঙ্গার	রতি	শ্যাম	বিষ্ণু
২	হাস্য	হাস	শুক্ল	প্রমথ
৩	করুণ	শোক	কপোত	যম
৪	রৌদ্র	ক্রোধ	রক্ত	রুদ্র
৫	বীর	উৎসাহ	হেম	মহেন্দ্র
৬	ভয়ানক	ভয়	কৃষ্ণ	কাল
৭	বীভৎস	জুগুপ্সা	নীল	মহাকাল
৮	অদ্ভুত	বিস্ময়	পীত	ব্রহ্মা
৯	শান্ত	শম	কুন্দেন্দুসুন্দর	শ্রীনারায়ণ

কথাকলি

কথাকলি

নাগানৃত্য

১০

দৃশ্যকাব্য কথাকলি

কেরলের সম্পদ কথাকলি নৃত্য। পশ্চিমে অনন্ত গর্জনশীল চিরসংক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগর উচ্চারণ করছে গতির মহামন্ত্র, আর পূর্বে নদীমালাশোভিত শ্যামলসুন্দর ধ্যানগম্ভীর পর্বতবিন্যস্ত স্নিগ্ধচ্ছায়া বনপ্রান্তর। কোমলে কঠোরে মধুরে ভয়ঙ্করে পূর্ণপ্রাণ মালাবারের জনজীবনের সংস্কৃতির পূর্ণবিন্দু রূপায়িত হয়েছে কথাকলি নৃত্যে। প্রকৃতির মুক্ত লীলাভূমিতে যে সহজ সরল সাধারণ মানুষগুলি বাস করে ছোটবড় গ্রামগুলিতে, পাহাড়তলীতে, বনপ্রান্তরের আড়ালে আড়ালে, কৃষ্ণচ্ছায়া নারিকেলকুঞ্জের মর্মরিত জীবনস্পন্দনের ছন্দে ছন্দে, তাদের স্বতস্ফূর্ত শিল্পীপ্রাণ সমস্ত সৌকুমার্য নিয়ে যেন লীলায়িত হয়েছে এই কথাকলি নৃত্যে।

কিংবদন্তী থেকে জানা যায় বিষ্ণুর অবতার ঋষি ভার্গব পরশুরাম কেরলরাজ্য সৃষ্টি করেন। মাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হবার জন্ম তিনি গোকর্ণ থেকে তার কুঠার সবেগে নিক্ষেপ করলে তা ভারত মহাসাগরে পতিত হয়। যেখানে কুঠার পড়ে সেখান থেকে সমুদ্র সরে গিয়ে যে স্থলভাগের সৃষ্টি হয় তা তিনি মাতৃহত্যার পাপস্খালনের জন্য ব্রাহ্মণদের দান করেন। এই কাহিনী সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে

ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূর্বতন দ্রাবিড় সভ্যতার অবদানকে অস্বীকার করার জন্য রচিত হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই মালাবার উপকূলে গ্রীক, রোমান, ফিনিসীয়, আরবদেশের বণিকদের বাণিজ্যসূত্রে যাতায়াত ছিল। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা মালাবার উপকূলেই অবতরণ করেন। খৃষ্টধর্মের ভারতে প্রথম আবির্ভাবও মালাবারেই ঘটে। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির সমন্বয়ে মালাবার বহির্জগতের সহিত যোগসূত্রের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে শ্রী ভারত আয়ার বলেছেন ঃ

"Thus the western sea-board of Malabar with its belt of sleepy lagoons remained for a long time the most conspicuous gate-way of India. Many strange influences filtered through. The cross of Christ was planted on Indian soil first in Malabar. According to local Christian tradition St. Thomas was the earliest evangelist to arrive; and much of the missionary work of St. Xavier is also associated with this land. After the second sack of their temple at Jerusalem, the Jews, a much persecuted race, sought asylam at Mazuris. They too, like the early Christians, enjoyed the patronage and protection of the ruling chiefs. The sea-faring Arabs who came later, settled down in the coastal regions. The Muslims of Kerala known as Moplahs are said to be descended from these Arab traders. Thus the jew, Christian and Muslim met here. In a mystic setting, as it were, of their new homeland they forgot old rivalries and for over a thousand years they have

lived side by side in amity and have ever been treated kindly by the sons of the land. Tc-day they are an integral part of the society and inherit and share a common culture and way of life, unmistakably Malayali in tone and texture". মালাবারের শিল্প-সংস্কৃতি আলোচনায় এই তত্ত্ব মনে রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

কেরলের প্রাচীন অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড় জাতীয়। পরে আর্য সভ্যতার প্রসার হয়। আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার মিশ্রণেই এখানকার শিল্পসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। কথাকলি নৃত্য তার অন্যতম নিদর্শন। দীর্ঘকাল ধরে মালাবারে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণরাই শাসনকার্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বারো বৎসর অন্তর মিলিত হয়ে চোল অথবা পাণ্ড্য বংশের কোন রাজপুত্রকে রাজা নির্বাচিত করতেন। এই নির্বাচিত রাজা 'পেরুমল' নামে খ্যাত হতেন। পরবর্তীকালে নায়ার-সম্প্রদায়ের আধিপত্য দেখা যায়। অবশ্য নায়ার-সম্প্রদায় ও নাম্বুদ্রি-সম্প্রদায়ের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে মর্যাদার লড়াই হয়নি। কারণ নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ-গণই সমাজে প্রধান নাগরিক হিসাবে সম্মানিত হতেন। এবং বংশের প্রথম সন্তান ছাড়া অন্যান্য সকলেই নায়ার-সম্প্রদায়ে বিবাহাদি করতে পারতেন। এর ফলে নাম্বুদ্রি ও নায়ার-সম্প্রদায়ের সামাজিক যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ হয়। নাম্বুদ্রি-সম্প্রদায় অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সংস্কৃতচর্চার অনুরাগী ছিলেন। ভগবতী বা দুর্গার উপাসনা, তান্ত্রিক আচার, সর্পপূজা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। কবিতার প্রতি অনুরাগ মালয়ালী সম্প্রদায়ের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কবিতা পাঠের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

কেরলে প্রাচীনকাল থেকেই নৃত্য ও নাট্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ সমারোহ দেখা যায়। তার মধ্যে 'মুতিয়েট্টুকে' প্রাচীনতম বলা যায়। এ হল বিজয়োৎসবসূচক নৃত্য। ভগবতী কর্তৃক দারিকাসুর বধের আখ্যান

নিয়ে এর নৃত্যাংশ অভিনীত হত। 'চাক্কিয়ার কুথুর' কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাক্কিয়ার হচ্ছে অভিনেতা ও কথক-সম্প্রদায়। এরা পুরাণে বর্ণিত 'সুত' সম্প্রদায়ের বংশধর বলে নিজেদের দাবী করত। চাক্কিয়ারদের অম্বলাবাসী গোষ্ঠীর অর্থাৎ নাম্বুদ্রি ও নায়ার-সম্প্রদায়ের অন্তবর্তী গোষ্ঠী মনে করা হত। এরা মন্দিরে বাস করত। কথিত আছে নাম্বুদ্রি-সম্প্রদায়ের কোন স্ত্রীলোককে অসতী বলে মনে করা হলে ব্রাহ্মণেরা তার বিচার করতেন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে জাতিচ্যুত করা হত। এই সময়ে তার পুত্রসন্তান হলে তাকে চাক্কিয়ার এবং কন্যাসন্তান হলে তাকে নাঙ্গিয়ার বলা হত। এইভাবে চাক্কিয়ার-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই সন্তানরা সমাজে স্বীকৃত হত, তাদের কোন শাস্তি হত না। তারা নটবৃত্তি গ্রহণ করত। বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থ 'শিলপ্পদিকারম্'এ চাক্কিয়ার এর উল্লেখ আছে। 'শিলপ্পদিকারম্' একটি তামিল নাটক, রচয়িতা ইলাঙ্গের আদিগল। এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রসঙ্গ আছে। এই প্রসঙ্গে শ্রী আয়ারের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

"The Cakkyars, it seems, were practising their dramatic art in the early centuries of the christian era. This is evident from a reference in the Silappadhikaram, a Tamil classic whose date is assigned to the 2nd cent. A. D (?). A Cakkyar from Parur near Tiruvancikulam, where it is believed the poem was composed, is mentioned as having executed a Siva Tandava dance before king Cenguttuvan while he was encamped at the Nilgiris. The description of this dance resembles in a remarkable way the theme of a Kangra painting which Dr. Coomaraswamy has reproduced in his Indian Drawings, where the

Mula-Prakriti or Parvati the consort of Siva is depicted as seated looking at her form in a mirror as if absolutely unaffected by the cosmic dance. The Silappadhikaram describes the dance as follows: when Siva danced, his anklets jingled, the damaru (drum) in his quick moving hands sounded, his red eyes reflected a thousand indications (moods, ideas) and his whirling Jata swept the four quarters. And Uma sat—not even her anklets, bangles or be-jewelled belt whispered, neither her bosom nor her ear-drops or coiffure moved."

এই সুপ্রাচীন তামিল গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের নাট্য ও নৃত্যকলার বিশদ তথ্য পাওয়া যায়। এই কাহিনীর নায়িকা মাধবী নৃত্যকলায় পারদর্শিনী। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী রাজা ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের এক মহতী সমাবেশে কাবেরীপুষ্পত্তিনম্ নগরে মাধবী নৃত্যকলার এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করেন। মাধবীর নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে ১০০১ স্বর্ণমুদ্রা ও নিজ কণ্ঠের পুষ্পমাল্য উপহার দেন। মাধবীর সহচরীরা ঐ পুষ্পমাল্য অভিজাত সম্প্রদায়ের দরবারে নিয়ে ঘোষণা করেন যে যিনি ১০০১ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ঐ মালা কিনবেন তিনিই মাধবীর প্রণয়ভাজন হবেন। কোভলন নামে এক বণিক যুবক ঐ মালা কিনলেন এবং তিনি মাধবীর রূপলাবণ্য ও নৃত্যকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে নিজ স্ত্রী, পুত্র ও সংসারের দায়িত্ব ভুলে গেলেন। এই ঘটনার পরিণতিই বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

এই কাহিনী অবশ্য আর একটি পরিবর্তিত রূপেও প্রচলিত আছে। নৃত্যশিল্পী মাধবীকে শহরের অন্যতম প্রধান শ্রেষ্ঠীপুত্র কোভলন ও কান্নাকাই এর বিবাহ উৎসবে নৃত্য প্রদর্শনের জন্য

আমন্ত্রণ করা হয়। মাধবী একটি শর্তে নৃত্য প্রদর্শনে সম্মত হলেন। তিনি বললেন যে নৃত্যের শেষে তিনি তার কণ্ঠের মুক্তামালা ছুঁড়ে দেবেন। ঐ মালা যার কণ্ঠলগ্ন হবে সেই পুরুষকে তাকে গ্রহণ করতে হবে। শ্রেষ্ঠী সম্মত হলে বিবাহসভায় নৃত্যের শেষ পর্যায়ে ঘটনাচক্রে মাধবীর মুক্তামালা কোভলন এর কণ্ঠলগ্ন হল। মাধবী তখন সেই সদ্যবিবাহিত পুরুষকে শর্ত অনুযায়ী দাবী করলেন। এই ঘটনা থেকেই কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিণতি সূচিত হয়।

যাই হোক, ভারতের নৃত্যকলা, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতের নৃত্য ধারা সম্পর্কে "শিলাপ্পদিকরম্" সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ।

চাক্কিয়ার কুথু,—প্রবন্ধম্ কুথু ও কুটিয়াট্টম্ এই দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হত। প্রবন্ধম্ কুথু অনুষ্ঠানে মূলতঃ চাক্কিয়ার সম্প্রদায়ের কথকতা ও কাহিনী বর্ণনা কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা বাচিক অভিনয় সমৃদ্ধ। কাহিনীকে স্পষ্ট করার জন্য কিছু ভাবভঙ্গী ছাড়া এর মধ্যে নৃত্যের অংশ বিশেষ কিছুই ছিল না। পুরাণের কাহিনীই সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে অভিনীত হত।

কুটিয়াট্টম্ অভিনয়-প্রধান। এতে স্ত্রী ও পুরুষ অর্থাৎ চাক্কিয়ার ও নাঙ্গিয়ার উভয়েই অংশগ্রহণ করত। এক-একটি নাটক এত দীর্ঘ হত যে অনেক সময় পুরো নাটকের অভিনয় শেষ হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগতো। পেরুমলগণ এই শিল্পকলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিশেষভাবে ভাস্কর রবিবর্মা পেরুমল, চেরামন পেরুমল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরিত্র অনুযায়ী রূপসজ্জা ও রঙের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, যার প্রভাব পরবর্তীকালে কথাকলি নৃত্যধারায় দেখা যায়।

এছাড়া পতাকম্ নৃত্য প্রচলিত ছিল। চাক্কিয়ার কুথু, কুটিয়াট্টম, পতাকম্ প্রভৃতি নৃত্যধারা আর্যসভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও এগুলি পূর্বতন দ্রাবিড় সংস্কৃতিপুষ্ট মুটিয়েট্টু, তিরায়াট্টম্ প্রভৃতি

ভগবতী অর্চনামূলক নৃত্যধারা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

কথাকলি নৃত্য সম্পর্কে একটি প্রচলিত তথ্য হল পরমবৈষ্ণব কালিকটের জামুরিন বংশীয় মানবদেবরাজ কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষ্ণনাট্যম্ নৃত্যনাট্যের উন্নততম রূপই পরবর্তীকালে কথাকলি রূপে পরিচিত। কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের আখ্যান অবলম্বনে অষ্টাপদী আট্যম্ নামে একপ্রকার লোকনৃত্যের ভিত্তিতে আনুমানিক ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনাট্যম্ প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণনাট্যম্ এর কাহিনী অংশ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে রচিত এবং রাজসভা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই এর প্রসার সীমায়িত ছিল। কৃষ্ণনাট্যম্-এ কাঠের মুখোস ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়।

কথিত আছে যে কোট্টারাকারার রাজা বীর কেরালাবর্মা রাজ পরিবারের বিবাহ উপলক্ষে কালিকটের জামুরিনের নিকট কৃষ্ণনাট্যম্ অভিনয়ের একটি দলকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করেন। জামুরিন এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে জানালেন যে গভীর ভাবসম্পদ পূর্ণ, সাহিত্যধর্মী ও উন্নত আভিজাত্যসম্পন্ন আঙ্গিক সমৃদ্ধ এই কৃষ্ণনাট্যম্ উপভোগ করার মত সুধীজন দক্ষিণ দেশে নেই। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করে কোট্টারাকারার রাজা নিজ দেশে একটি নতুন নৃত্যনাট্যের প্রবর্তন করলেন। এরই নাম রামনাট্যম্। কথিত আছে যে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে কোট্টারাকারার গণেশ মন্দিরপ্রাঙ্গণে রামনাট্যম্ সর্বপ্রথম অভিনীত হয় এবং পরবর্তীকালে কথাকলি শিল্পীগণের প্রথম প্রদর্শনী এই মন্দিরে গণেশদেবের আরাধনা হিসাবে অনুষ্ঠানের প্রথারূপে প্রচলিত হয়। কোট্টারাকারার রাজা কৃষ্ণনাট্যমের আড়ম্বর পূর্ণ সাজসজ্জা বর্জন করে রামনাট্যমে অনাড়ম্বর প্রাচীন পোশাক ব্যবহার করেন। রামনাট্যম্‌কেই কথাকলি নৃত্যের উৎস ও প্রাথমিক স্তর বলে মনে করা হয়। আঙ্গিক, ভাবসম্পদ, গভীরতা ও কলাসৌকর্যে রামনাট্যম এক অনুপম সৃষ্টি। আকৃতি, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে কথাকলি রামনাট্যম্-এর

অনুরূপ। মূলতঃ পুরাতন লোকনৃত্যের আঙ্গিকের বিস্ময়কর বৈপ্লবিক নবরূপায়ণ। কৃষ্ণনাট্যমের ভাষা সংস্কৃত ছিল বলে তা সাধারণের বোধগম্য ছিল না। কোট্টারাকারার রাজা মালয়ালী ভাষায় রামনাট্যম্ রচনা করেন। তার ফলে জনজীবনের সঙ্গে এই নৃত্যনাট্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্যের আখ্যানভাগ রচিত হত বলে এই নৃত্যনাট্য রামনাট্যম্ নামে অভিহিত হয়। কোট্টারাকারার রাজা পরে মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেও এই নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন। ১৬৬৫ থেকে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার রাজত্বকালে তিনি এই শিল্পকলার এক গৌরবময় ভূমিকা সৃষ্টি করেন। নাট্যকার, প্রযোজক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে তার আদর্শ পরবর্তীকালের শিল্পীদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করে। কৃষ্ণনাট্যম্-এর মত রামনাট্যম্ ও আটরাত্রি ধরে অভিনীত হত। এবং রামনাট্যমেও কাঠের মুখোসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দৃশ্যকাব্য কথাকলি তার বর্তমান রূপে আসার আগে এতগুলি স্তর অতিক্রম করেছে।

কেরলের প্রাচীন লোকনৃত্যধারা, পেরুমল যুগের চাক্কিয়ার কুথু, কুটিয়াট্যম্ ও পরবর্তীকালে কৃষ্ণনাট্যম্ ও রামনাট্যম্-এর স্তর অতিক্রম করে এই বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর অফুরন্ত জীবনীশক্তি, ছন্দোময়তা ও উদ্দামতা, তান্ত্রিক পূজাপাঠের আভিচারিক পদ্ধতি কথাকলি নৃত্যে এক বিচিত্র সজীবতা সৃষ্টি করেছে।

কথাকলি-শিল্পকলা কথাকলি-সাহিত্য অপেক্ষাও প্রাচীন। কথাকলি-সাহিত্য চারশত বৎসরের পুরোনো কিন্তু কথাকলি-শিল্পকলা প্রায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত। কথাকলি নৃত্যনাট্যগুলি গভীর ভাবসম্পদ ও নাটকীয়তাপূর্ণ। ইহা সাধারণত গদ্য ও কবিতা উভয় পর্যায়ে রচিত। সংলাপ-অংশ মালয়ালম্ ভাষায় রচিত কিন্তু দৃশ্যান্তরস্থ কবিতাংশ সংস্কৃত ও মালয়ালম্ উভয় ভাষাতেই রচিত হয়। কথাকলি সাহিত্য শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়

দীর্ঘকালের শ্রম ও অনুশীলনের ফলে বিশেষ ঐতিহ্যসম্পন্ন। পুরাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যানমালাকে ভিত্তি করে গভীর ভাব-সম্পদপূর্ণ ও সুললিত ছন্দোবদ্ধ কথাকলি সাহিত্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

কথাকলি-সাহিত্য ও শিল্পকলার বিকাশে কেরলের রাজন্যবর্গের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোট্টারাকারার রাজা বীর কেরালাবর্মা রামচন্দ্রের জন্ম থেকে রাবণবধের পর সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে আটটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। কোট্টায়ামের রাজা থাম্পুরণ বকবধ, কালকেয় বধ, কৃমিরা বধ ও কল্যাণ সৌগন্ধিকম এই চারটি নৃত্যনাট্য মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা কার্তিক থিরুমল (১৭২৪-১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ) সুভদ্রাহরণম, নরকাসুর বধ, গন্ধর্ব-বিজয়ম্, রাজসূয়ম্, বকবধ, পাঞ্চালী স্বয়ংবরম ও কল্যাণ সৌগন্ধিকম্ নামে সাতটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। তিনি নাট্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বলরাম ভরতম্ নামে নাট্যশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। রাজা অশ্বথী থিরুমল পুতনা মোক্ষম, অম্বরীষ চরিতম্, পুণ্ডরীক বধ ও রুক্মিণী স্বয়ংবরম্ এই চারটি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা স্বাথী থিরুমল রামবর্মা (১৮১৩-১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ) তার রাজত্বকালে কথাকলি সঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রসারের জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তিনি কথাকলি নৃত্যনাট্যের জন্য পঁচাত্তরটি সুললিত পদ রচনা করেন। তার রাজত্বকালেই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ইরিয়াম্মান থাম্পি (১৭৮৩-১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ) কীচক বধ, দক্ষযজ্ঞম্ ও উত্তরা স্বয়ংবরম্ এই তিনটি শ্রেষ্ঠ কথাকলি নৃত্যনাট্য রচনা করেন। ইরিয়াম্মান থাম্পির কন্যা শ্রীমতী থাংকাচি রচিত শ্রীমতী স্বয়ংবরম্, পার্বতী স্বয়ংবরম্ ও মিত্রসহ মোক্ষম নাট্যগুলিও উল্লেখযোগ্য। কবি উন্নায়ি ওয়ারিয়র রচিত "নল চরিতম" অন্যতম উল্লেখ্যযোগ্য সৃষ্টি।

বিভিন্ন পদ বা শ্লোকের সাহায্যেই অভিনেতাদের পরিচয় করিয়ে

দেওয়া হয়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে সঙ্গীত ও কাব্যরসসমৃদ্ধ সুললিত ছন্দে রচিত কথাকলি নৃত্যনাট্যে মালাবার অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে সাহিত্য শিল্পাশ্রয়ী। তাই অধিকাংশ কথাকলি নৃত্যনাট্য রচয়িতারা এই শিল্পকলার আঙ্গিকে নিপুণ ছিলেন। এই নৈপুণ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। এ প্রসঙ্গে ডাঃ এস. কে. নায়ার বলেছেন ঃ

"The stage, curtain, actors and various other aspects connected with drama, make the playwright conscious of the innumerable technicalities to be followed at the time of production, and, therefore, a theme very successfully handled by a novelist or verse writer finds difficulties in the hands of a playwright. As Aatta katha (kathakali play) is almost alike to a play, the writer has to be very careful in composing one. His main job is to write a play for "kathakali stage", which puts restrictions on the free play of his imagination. He has to allow full justice to the actors in their interpretation of the situations of the play, only by means of gestural and facial expression."

কথাকলি একটি সুপরিকল্পিত বিশেষ অঙ্গাভিনয় ও মুদ্রাসমন্বয়ে ভাবরসে উচ্ছল দৃশ্যকাব্য তাই এর নাট্যরচনা ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাসে কথাকলি এক প্রাচীন ঐতিহ্য বহনকারী শিল্প যা প্রায় সম্পূর্ণ বিদেশীয় প্রভাবমুক্ত। কথাকলি মূলতঃ দৃশ্যকাব্য, এতে বাদক ও সঙ্গীতশিল্পীর গীতি মিলিতভাবে

পরিবেশিত হয়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাবব্যঞ্জক মূকাভিনয় সমন্বিত দৃশ্যকাব্য এই কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে একমাত্র জাভা দ্বীপের ছায়ানাট্য ও ছায়ানৃত্যের তুলনা চলে। এর কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে বলি দ্বীপের অম্বুরাজা ত্রিবাঙ্কুর থেকে কয়েকজন শিল্পীকে বন্দী করে নিয়ে যান। পরবর্তী কালে সেই বন্দী শিল্পীদের মাধ্যমে জাভা ও বলি দ্বীপে কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ সাদৃশ্যপূর্ণ নৃত্যের প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী- কালে এই দৃশ্যকাব্য কেরলের প্রাচীন লোকনৃত্য ও পেরুমল যুগের শাস্ত্রীয় চাক্কিয়ার কুথু ও কুটিয়াট্যম্ নৃত্যধারার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যের সুসংবদ্ধ প্রকাশভঙ্গী ও লোকনৃত্যের প্রাণময় উদ্দামতা কথাকলি নৃত্যনাট্যে স্বতস্ফূর্ত সজীবতা সৃষ্টি করেছে।

আদিম যুগে মানুষ আকারে ইঙ্গিতে ও হাত মুখের নানারূপ ভঙ্গীতে নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করত। এই বিভিন্ন প্রকার প্রতীকধর্মী ভঙ্গী ও মুদ্রাগুলিরই সংস্কৃতরূপ পরবর্তীকালে নৃত্য ও অভিনয়কলার প্রধান বাহন হয়ে উঠেছে। কথাকলি অনুষ্ঠানের বিশেষ রীতির মধ্যেই এই দৃশ্যকাব্য পরিকল্পনার গাম্ভীর্য ও বৈশিষ্টের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলাঘর কেরলের গ্রামে গ্রামে, মন্দির প্রাঙ্গণে সারারাত্রিব্যাপী কথাকলি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। কথাকলি নৃত্যানু- ষ্ঠানের পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে এর ধর্মপ্রবণতা, ভাবগাম্ভীর্য ও বৈচিত্র্যের পরিচয়। কথাকলি অভিনয় কখনো দিবাভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। সাধারণতঃ পনের থেকে পঁচিশজন শিল্পী সমন্বয়ে কথাকলি নৃত্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। কথাকলি সম্প্রদায়ে সাধারণতঃ কোন মহিলা শিল্পী অংশগ্রহণ করে না, পুরুষেরাই স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করে। সাধারণভাবে এই তথ্য সত্য হলেও মহিলা শিল্পীরাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছেন।

অপরাহ্ণের সূর্য যখন আরব সাগরের ব্যাকুল আহ্বানে মিলন অভিসারের আরক্তিম লজ্জায় লোহিত হয়ে মালাবারের শ্যামল পাহাড়ের নীরব গাম্ভীর্যকেও সলজ্জ রক্তিম করে তোলে তখন চতুর্যন্ত্রের মহামন্দ্র ঐকতানে কথাকলি অনুষ্ঠানের সুদূরসঞ্চারী আহ্বান ঘোষিত হয়। চতুর্বাদ্যের এই অমোঘ আহ্বানে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ কথাকলি নৃত্য মহামণ্ডপে সমবেত হয়। এই প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের নাম কেলি।

রাত্রি আটটার পর কথাকলি নৃত্যের সূচনা এবং পরদিন সকালে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি। মুক্তাঙ্গন অভিনয়-মঞ্চ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় ষোল ফুট। চারিদিকে চারটি স্তম্ভাকৃতি দণ্ডের সঙ্গে সামিয়ানা বেঁধে তৈরী হয় মঞ্চের উপরিভাগের আচ্ছাদন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মঞ্চের জন্য কোন বিশেষ প্ল্যাটফর্ম তৈরী করা হয় না। জমির ওপরেই আচ্ছাদন দেওয়া হয়। সবুজ পাতা ও ফুল দিয়ে মঞ্চসজ্জা করা হয়। চার থেকে পাঁচফুট লম্বা একটি বিরাট পিতলের পিলসুজের ওপর একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করার সঙ্গে সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ। এই সময় চাণ্ডা, মাদলম, চ্যাংগালা ও কাইমনি বাজানো হয়ে থাকে। একে বলা হয় আরঙ্গকেলি।

এই প্রদীপের আলোর এই অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শ্রীআয়ার বলেছেন: "The tall, massive, shining metal lamp is the only lighting. Fed by an abundant supply of coconut oil, the two thick clusters of wicks-the thicker one facing the stage and the other the audience create a small magic power of light. The area close to the lamp is brilliantly lit against the surrounding darkness. The lamp is the focal poient of the actor. This oil fed lamp has a distinct personality and

fun ction in the drama. It vivifies and subdues, an effect, that can hardly be achieved by the most scientific lighting scheme. The dancing flame of the lamp now leaping, now flickering, pulsates with a live and intelligent energy, reacting to the rhythmic cadences and moods of the play."

আরঙ্গকেলি শেষ হবার সাথে সাথে দুজন শিল্পী অভিনয় প্রাঙ্গণে একটি পর্দা ধরে দাঁড়ায়। এই পর্দাটিকে তেরেশিলা বলা হয়। তেরেশিলার অন্তরালে দুজন শিল্পী একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে দেবতাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এর নাম পূর্বরঙ্গম বা তোড়েয়াম্। তেরেশিলা সাধারণতঃ বারোফুট লম্বা ও আট ফুট চওড়া গাঢ় রঙের সিল্ক বা সাটিনে তৈরী এবং এর মাঝখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম আঁকা থাকে।

তোড়েয়াম্-এর সমাপ্তিতে বন্দনাশ্লোকম্ গীত হয়। তারপর পুরপ্পাড। এই অনুষ্ঠানের সময় মঞ্চ হতে ধীরে ধীরে তেরেশিলা অপসারিত করা হয়। কাহিনীর প্রধান দুই চরিত্র পুরপ্পাড নৃত্যের মাধ্যমে মঞ্চবন্দনা করেন। এই সময় ভাবাভিনয় ও কলাশমের ছন্দের মাধ্যমে দেহভঙ্গির সুষম সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। কলাশম মূলত তালাশ্রয়ী নৃত্য।

পুরপ্পাডের পর অনুষ্ঠিত হয় মঞ্জুথ্থারা বা মালাপদম্। এ হচ্ছে পুরপ্পাডের সমাপ্তি ও মূল নাট্যকাহিনী আরম্ভের পূর্বে অনুষ্ঠিত এক সাঙ্গীতিক বিস্কম্ভক বিশেষ। এখন মঞ্চের ওপর পূর্বোক্ত চতুর্বাদ্যযন্ত্রীর একাধিপত্য, এই সময় যন্ত্র ও কণ্ঠশিল্পীগণ প্রায় প্রতিযোগিতাপূর্ণ-ভাবে তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। মঞ্জুথ্থারায় গীতগোবিন্দ হতে সংস্কৃত গীতিমাল্য পরিবেশিত হয়। এই সকল অনুষ্ঠানের পর আরম্ভ হয় মূল কাহিনীর অভিনয়। সাধারণভাবে কথাকলি নৃত্যনাট্যের প্রথম দৃশ্যে প্রমোদোদ্যানে নায়ক ও নায়িকাকে দেখা যায়।

কথাকলি নৃত্যনাট্য আঙ্গিক, বাচিক, সাত্বিক ও আহার্য এই চারপ্রকার অভিনয় সমৃদ্ধ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিভঙ্গীর যে চলন তাকে আঙ্গিক অভিনয় বলে। এই অভিনয়ের উৎস যজুর্বেদ, ভাব স্থায়ী। কাব্য নাটক ও সাহিত্যের ভাষা নিয়ে ভাবের মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে বাচিক অভিনয় বলে। এর উৎস ঋগ্‌বেদ, ভাব সঞ্চারী। নাটকের চরিত্রানুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টিতে চরিত্র অলঙ্করণের অঙ্গসজ্জা, বসনভূষণ, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির মাধ্যমে যে অভিনয় তাকে আহার্য অভিনয় বলে। এর উৎস সামবেদ, ভাব বিপাস্থায়ী। মনের বিভিন্ন অভিব্যক্তি ও মানসিকতাকে সত্ত্বভাবে সমাহিতকরণের নাম সাত্বিক আভনয়। এই অভিনয়ের উৎস অথর্ববেদ, ভাব অস্থায়ী। কথাকলি নৃত্যে আহার্য অভিনয় একটি প্রধান ও অন্যতম উপকরণ।

আহার্য অভিনয়াংশে কথাকলি রূপসজ্জা ও পোশাক ভারতীয় নৃত্যকলার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী প্রাচীন নাট্যকলায় মুখোস ও গাঢ় উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। কথাকলি নৃত্যে বর্ণবৈচিত্র্য ও মুখোসের ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত।

বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি বিচিত্র রঙের খেলাঘর। নাট্যশাস্ত্রেও বিভিন্ন ভাব ও রসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রঙ নির্বাচন ও ব্যবহারের নির্দেশ আছে। আহার্য অভিনয় প্রধান কথাকলি নৃত্যে সাত্বিক, তামসিক ও রাজসিক এই তিনটি মূল ভাবকে কেন্দ্র করে চরিত্রগুলির রূপসজ্জার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অভিনবত্বে অতুলনীয়, পৃথিবীতে অনুরূপ কোন মডেল নেই। তিনটি মূল ভাবকে অবলম্বন করে কথাকলি নৃত্যে রূপসজ্জা অনুযায়ী চরিত্রগুলিকে পাচ্চা, কাত্তি, তাড়ি, কারি ও মিনিক্ক৮ এই পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

পাচ্চা চরিত্র রূপসজ্জার মূল রঙ সবুজ। এই চরিত্রে সাদা

চুট্টির বিপরীতে মুখে সবুজ এবং তাকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য লাল ঠোঁট ও কালো রঙের চোখ ও ভুরু আঁকা হয়। কপালে আঁকা হয় চাঁপা রঙের তিলক। এই প্রসাধনে ইন্দ্র, রাম, অর্জুন, কৃষ্ণ, নল প্রভৃতি বীর ও সাত্ত্বিক চরিত্র রূপায়িত হয়। পাচ্চার মূল রস বীর ও শৃঙ্গার।

কাত্তি চরিত্রে মুখে সবুজ রঙের উপরে লাল এবং তাকে আরো উজ্জ্বল করার জন্য সাদা বর্ডার দেওয়া হয়। নাকে ও কপালে দুটি সোলার বল হিংস্রতাকে প্রকট করে। এই প্রসাধন রাবণ, কীচক, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি চরিত্রের অসাধুতা ও উগ্রতা প্রকাশ করে। কাত্তি চরিত্রের মূল রস বীর ও রৌদ্র।

তাড়ি চরিত্রে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও প্রকট প্রসাধন ব্যবহার হয়। চরিত্রের গুণ অনুযায়ী লাল, কালো ও সাদা এই তিনপ্রকার তাড়ির রূপসজ্জা প্রচলিত। দুঃশাসন, বকাসুর প্রভৃতি চরিত্রের ভয়াল ও শয়তান রূপ প্রকাশের জন্য লালতাড়ি এবং ব্যাধ, শিকারী প্রভৃতি ধংসাত্মক চরিত্র প্রকাশের জন্য কালো তাড়ি ব্যবহৃত হয়। এর মূল রস বীভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক। হনুমান চরিত্রে বীর ও হাস্য ভাব প্রকাশের জন্য সাদা তাড়ি ব্যবহার হয়।

কারি চরিত্র রূপসজ্জার মূল রঙ কালো। পুতনা, তাড়কা, শূর্পণখা প্রভৃতি কুটিল চরিত্র প্রকাশে এই প্রসাধন এর ব্যবহার হয়। এই চরিত্রের পোশাক-এর রঙও সম্পূর্ণ কাল। এর মূল রস রৌদ্র ও বীভৎস।

মিনিক্কু চরিত্রের প্রসাধন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই প্রসাধনে বিশেষ উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার হয় না। সাধারণভাবে দ্রৌপদী, দয়মন্তী, সাধু প্রভৃতি চরিত্র রূপায়ণে এই মসৃণ ও স্বল্পোজ্জ্বল রূপসজ্জা ব্যবহার হয়। মূল রস শান্ত ও শৃঙ্গার।

কথাকলি নৃত্যে পোশাকও রূপসজ্জার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচিত হয়েছে। এই পোশাক সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত

আছে। যখন কালিকটের জামুরিন বংশীয় মানবদেবরাজ কৃষ্ণনাট্যম্ সৃষ্টি করেন, তখন একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যেন সমুদ্রে এক একটি ঢেউ সরে যাচ্ছে আর কথাকলি নৃত্যের পোশাক ও প্রসাধনের অপরূপ রঙ প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সেইজন্য কথাকলি অনুষ্ঠানের পুরপ্পাডের সময় তেরেশিলা ধীরে ধীরে অপসারিত করা হয় ও শিল্পীর পোশাক ও রূপসজ্জার বর্ণবৈচিত্র্য অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

কথাকলি নৃত্যে পুরুষ চরিত্রাভিনেতার মস্তকাভরণ 'কিরীটম' এক অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন। কানের পাশে কাঠের গোল দুইটি বড় অলঙ্কার, ইহাকে 'তোড়া' বলে। কানের ছোট দুটি অলঙ্কারকে 'চেভিপুরু' বলা হয়। মুকুটের নীচে কপালের উপর যে লাল কাপড়ের বন্ধনী তাকে 'চুট্টিতুনি' বলে। চুট্টিতুনির ওপর মোতির বা পুঁতির কাজ করা যে ফিতা থাকে তাহাকে 'নারা' বলা হয়। পিঠে যে লম্বা কালো রঙের নকল চুল থাকে তাকে 'চামরম্' বলে।

চরিত্রানুযায়ী কথাকলি নৃত্যশিল্পীরা ঊর্ধ্বাঙ্গে যে বিভিন্ন রঙের জামা পরেন তাকে 'কুপ্পায়াম' বলে। উপর হাতে যে কাঠের গহনা পরা হয় তাহার নাম 'তোলপুট।' তোলপুটের ঠিক নীচেই যে কাঠের অলঙ্কার তাকে 'ভর্ত্তিকামণি' বলা হয়। নীচের হাতের কাঠের গহনার নাম 'ভালাই'। ভালাই-এর নীচে ব্রেসলেটের মত কাঠের গহনাকে 'হস্তকটকম্' বলা হয়। গলার পুঁতির মালার নাম 'কাজুহারম'। গলা থেকে ঝোলান চাদরের দুপাশে দুটি আয়না থাকে। একে 'উত্তরীয়ম' বলে। কথাকলিশিল্পীরা যে ঘাঘরা পরেন তাকে 'উরুতেকেট্টা' বলে। ঘাঘরার ওপর দিয়ে দুই পাশে যে দুটি লালরঙের কাপড়ের ফালি ঝোলান থাকে তাহাকে 'পাটু-ওয়াল' বলে! ঘাঘরার সামনের দিকে রূপার কাজ করা কোঁচাকে 'মুণ্ডি' বলা হয়। কোমরের উপর অর্ধবৃত্তাকার সোনালী ঝালরটিকে 'পাড়িএরেজানম' বলে। পায়ের গোড়ালিতে লালরঙের দড়ি দিয়ে

তৈরী যে আভরণ তাকে 'তাণ্ডপদম' বলে। কথাকলি নৃত্যের ঘুঙুরকে 'গোচামণি' বলে।

মহিলা শিল্পীরা মাথায় যে উড়নী ব্যবহার করে তাকে 'উরুমণ' বলা হয়। উড়নীর ভিতরের পরচুলাটিকে 'কোণ্ডা' বলা হয়। মহিলা চরিত্রের শিল্পীরা 'উত্তরীয়ম' ব্যবহার করে না। এ ছাড়া অন্যান্য অলঙ্কার পুরুষ চরিত্রের অনুরূপ। চরিত্র অনুযায়ী মাথায় বিভিন্ন প্রকারের 'মুড়ি' ব্যবহার প্রচলিত।

কথাকলি নৃত্যে বাচিক অভিনয়ের অংশ অত্যন্ত গৌণ। নেপথ্যে সঙ্গীতের সঙ্গে মুদ্রা ও ভাবের মাধ্যমে অভিনয় হয়। শ্রীআয়ার-এর মতে: "The Nayacharyas of kathakali stage took the view that the spoken word was a needless burden on the actor and that it was imperfectly equipped to discharge the function it was called upon to bear in the drama."

আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের মাধ্যমে ত্রিবিধভাবে প্রকাশিত হয়। কথাকলি নৃত্য আঙ্গিক অভিনয় সমৃদ্ধ। শির, হস্তদ্বয়, বক্ষোদেশ, পার্শ্বদ্বয়, কটিতট ও পদদ্বয় এই ছয়টিকে অঙ্গ বলা হয়। অনেকে গ্রীবাকেও অঙ্গ বলেন। স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় এগুলি প্রত্যঙ্গ। নেত্র, ভ্রূ, অক্ষিপুট, অক্ষিতারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, অধর, দন্তপঙ্ক্তি, জিহ্বা, চিবুক, মুখ এগুলিকে উপাঙ্গ বলে। এই অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের অভিনয়ের মাধ্যমে কথাকলি নৃত্যশিল্পীরা নাট্যের মর্মকথা বিধৃত করেন।

"আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ॥
যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥"

অর্থাৎ বদনের মাধ্যমে গীত অবলম্বন করা কর্তব্য ; হস্তের দ্বারা গীতের অর্থ নির্দেশ, নেত্রদ্বয়ে ভাব প্রদর্শন ও পদদ্বয়ে তালরক্ষা করা উচিত। যেখানে হস্ত সেখানেই দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানেই মনের গতি, যেখানে মন সেখানেই ভাব আর যেখানে ভাব সেখানেই রসোৎপত্তি। এই রস নিষ্পত্তিই কলা সাধনার চরম উৎকর্ষ।

আঙ্গিক অভিনয়ের এই চরম উৎকর্ষ কথাকলি নৃত্যধারায় বিস্ময়কর রূপ এনেছে। প্রকাশিতব্য সমস্ত ভাব ও রূপকল্পকে এই কথাকলি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রস্ফুট করা যায়। এ সম্পর্কে কয়েকটি উদ্ধৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বলেছেন ঃ "It is a beautiful pantomimic art that can portray every emotion and every gesture of human life in countless ways, by the raising of an eye-brow, turning of the knees, raising of the shoulders and movements of the hands and fingers." কথাকলির হস্তমুদ্রাগুলিকে প্রতীক-ধর্মী ভাষা বলা যেতে পারে। Georgette Boner বলেছেন ঃ "At any rate the mudras of kathakali as an independent language do not require the support of the spoken word." এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণা প্রয়োজন এবং কথাকলি মুদ্রার একটি অভিধান রচনা একান্ত আবশ্যক। কারণ বৈদিক যুগের ধ্যানমুদ্রা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাব ও ভাষার বাহন এই নতুন আঙ্গিক নিঃসন্দেহে মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

কথাকলি নৃত্যে মূল চব্বিশটি হস্ত প্রচলিত। (১) পতাকা, (২) মুদ্রাক্ষম্ (৩) কটকম্ (৪) মুষ্টি (৫) কর্তরীমুখ (৬) সুখতুণ্ড (৭) কপিথ (৮) হংসপক্ষ (৯) শিখর (১০) হংসাস্য (১১) অঞ্জলি (১২) অর্ধচন্দ্র (১৩) মুকুরম্ (১৪) ভ্রমর (১৫) সূচীমুখ (১৬) পল্লব (১৭) ত্রিপতাকা (১৮) মৃগশীর্ষঃ (১৯) সর্পশির্ষ (২০) বর্ধমানকম্

(২১) অরাল (২২) উর্ণনাভ (২৩) মুকুল (২৪) কটকামুখ। এই হস্তগুলি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশে সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়। গুরু গোপীনাথের মতে সুখতুণ্ড, কপিত্থ, শিখর, ত্রিপতাকা, মৃগশির্ষ, অরাল, উর্ণনাভ, মুকুল, কটকামুখ এই নয়টি হস্তের অসংযুক্ত ব্যবহার হয় না।

পতাকা : "নমিতা অনামিকা যস্য পতাকাঃ সঃ করস্মৃতঃ"

অনামিকাকে নীচু করে মাটির সমান্তরাল করলে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলিকে সংলগ্ন রাখলে যে হস্ত হয় তাকে পতাকা বলে। পতাকা সংযুক্ত হস্তে সূর্য, রাজা, গজ, সিংহ, বৃষ, প্রাসাদ, সন্ধ্যা প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত হস্তে জিহ্বা, দেহ, দূত, যাওয়া প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

মুদ্রাক্ষম্ : "অঙ্গুষ্ঠগুতুঃ তর্জন্যা যস্যগ্রে মিলিতো ভবেত,
শেষাঃ বিশ্লষিতা যস্য মুদ্রাক্ষঃ সঃ করস্মৃতঃ।"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রের সহিত তর্জনী এসে মিলিত হলে এবং বাকী অঙ্গুলিগুলি সংলগ্ন অবস্থায় উর্ধ্বমুখী থাকলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে বলে মুদ্রাক্ষম্। মুদ্রাক্ষম্ সংযুক্ত হস্তে স্বর্গ, সমুদ্র, তপস্যা, মৃত্যু, বিস্মৃতি, সর্প প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত অবস্থায় মন, চিন্তা, বাসনা, আত্ম, জ্ঞান, সৃষ্টি, চিন্তা, স্মৃতি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

কটকম্ : "অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিমূলম্ তু সম্স্পৃশেদ্যদি মধ্যমা
মুদ্রাভিধানহস্তস্তু কটকাক্ষম্ ব্রজেৎ তদা।"

মুদ্রাক্ষম্ হস্ত করে মধ্যমা যদি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের তলভাগ স্পর্শ করে তাহলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে কটকম্ বলে। কটকম্ সংযুক্ত অবস্থার বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বলরাম, স্বর্ণ, রৌপ্য, নিদ্রা, বীণা, মালা, রথ প্রভৃতি ও অসংযুক্ত অবস্থায় ফুল, দর্পণ, স্ত্রী, সুগন্ধ, ত্যাগ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

মুষ্টি : "অঙ্গুষ্ঠাস্তর্জনী পার্শ্বমাশ্রিতহঙ্গুলয়ঃ পরাঃ
আকুঞ্চিতাশ্চ যস্য স্যুঃ স হস্তো মুষ্টি।"

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুঠার মধ্যে রাখলে অন্য অঙ্গুলিগুলি সংলগ্ন হয়ে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় থাকলে যে হস্ত হয় তাকে মুষ্টি বলে। মুষ্টি সংযুক্ত অবস্থায় যম, ঔষধ, অভিশাপ, দান, বন্ধন, মেধা প্রভৃতি ও অসংযুক্ত অবস্থায় মন্ত্রী, জয়, ধনু, বার্ধক্য, আহার্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

কর্তরীমুখ : "কনিয়স্‌শূন্যতা যত্র তিস্র স্যুঃ সংনতা পরাঃ
অঙ্গুষ্ঠস্তর্জনীপার্শ্বম্ সম্স্পৃশেত্তরতর্যভঃ
কর্তরীমুখম্ ইত্যাহুঃ আচার্যা ভরতর্যভ।"

কনিষ্ঠা ঊর্ধ্বমুখে থাকলে, তর্জনী, মধ্যমা অনামিকা কুঞ্চিত হয়ে মাটির সমান্তরাল হলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তর্জনীকে স্পর্শ করলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে বলে কর্তরীমুখ। কর্তরীমুখ সংযুক্ত অবস্থায় পাপ, ব্রাহ্মণ, যশ, মস্তক, গৃহ, জাতি, সমাপ্তি প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত অবস্থায় মুখমণ্ডল, শিশু, সময়, মানুষ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

সুখতুণ্ড : "ভ্রূলতেবা যদা বক্রা তর্জন্যঙ্গুষ্ঠ সংযুতা
নমিতানামিকাশেষে কুঞ্চিতোদাঞ্চিতে তদা ॥
স্যখতুণ্ডম্ ইত্যাহুঃ আচার্য্যো ভরতর্যভ।"

ভ্রূর মত তর্জনী বাঁকা থাকবে, কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা মোড়া থাকবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মোড়া অঙ্গুলির উপরে থাকবে—হস্তের এই অবস্থানকে সুখতুণ্ড বলে। সুখতুণ্ড সংযুক্ত হস্তে অঙ্কুশ, পাখী প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। সুখতুণ্ডের অসংযুক্তরূপে প্রয়োগ হয় না।

কপিত্থ : "নমিতানামিকাপৃষ্ঠমঙ্গুষ্ঠো যদি সম্পৃশেৎ

কনিষ্ঠিকা স্থনস্রা চ যস্মিস্ত স করঃস্মৃত
কপিথক্ষশ্চ বিদুভি নৃত্যশাস্ত্রবিশারদৈঃ।"

কনিষ্ঠা ও অনামিকা মোড়া থাকবে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ওদের উপর এসে সংযুক্ত হবে এবং তর্জনী ও মধ্যমার মাঝে অল্প ফাঁক থাকা অবস্থায় উর্ধ্ব মুখী হলে হস্তের যে রূপ হয় তাকে কপিত্থ বলে। সংযুক্ত অবস্থায় কপিত্থ স্পর্শ, সন্দেহ, পান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। কপিত্থেরও অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

হংসপক্ষ ঃ "অঙ্গুল্যশ্চ যথাপূর্বং সমস্থিতা যদি তস্যতু
স হস্তো হংসপক্ষাস্ত্যো ভপ্যতে ভরতাদিভিঃ।"

আঙ্গুলগুলি যে যার নিজের জায়গায় সমভাবে অবস্থান করলে তাকে হংসপক্ষ হস্ত বলে। সংযুক্ত রূপে হংসপক্ষ চন্দ্র, দেবগণ, কামদেব, মৎস, পর্বত, শয্যা বস্ত্র, কেশ, পাদুকা প্রভৃতি এবং অসংযুক্ত রূপে তুমি, আমি, শিবের কুঠার, অসি প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

শিখর ঃ "পুরতো মধ্যমং চাপি পৃষ্ঠতস্তর্জনীং নয়েৎ
কপিত্থহস্তস্ত তদা প্রাপ্নুয়াশিখরাভিধাম্।"

তর্জনী ও মধ্যমা দুটি কাঁচির মত অবস্থায় থাকবে। কনিষ্ঠা, অনামিকা সংশ্লিষ্ট হয়ে নীচের দিকে এবং অঙ্গুষ্ঠ এসে কনিষ্ঠা ও অনামিকার সাথে যুক্ত হলে হাতের যে রূপ তাকে শিখর বলে। সংযুক্ত হস্তে শিখর পদদ্বয়, চক্ষু, পথ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং শিখরের অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

হংসাস্য ঃ "সন্নতাশ্চলদগ্রাস্যস্তর্জন্যাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমাঃ
ইতরৌ চোন্নতৌ যত্র হংসাস্যম্ তদুদীরিতম্।"

তর্জনী, মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠ তিনটি একত্রে যুক্ত হয়ে কনিষ্ঠা ও অনামিকার উপরের দিকে উঁচু হয়ে থাকলে হংসাস্য হস্ত হয়। সংযুক্ত-

রূপে হংসাস্য হস্ত অক্ষিগোলক, সহানুভূতি, শ্বেত প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে বর্ষণারম্ভ, কেশ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

অঞ্জলি ঃ "করশাখাশ্চ বিশ্লিষ্টা মধ্যং হস্ততলস্য তু।
কিঞ্চিদকুঞ্চিতং যস্য লুটিতম সোহঞ্জলিঃ করঃ।"

পঞ্চ অঙ্গুলি একটু কুঞ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট হবে এবং সংলগ্ন থাকবে এবং তালুও সামান্য কুঞ্চিত অবস্থায় থাকলে অঞ্জলি হস্ত হবে। সংযুক্তরূপে অঞ্জলি অগ্নি, বমন, অশ্ব, নদী, শোণিত প্রভৃতি এবং অসংযুক্তরূপে বৃক্ষশাখা, ক্রোধ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

অর্দ্ধচন্দ্র ঃ "অঙ্গুষ্ঠং তর্জনীং চাপি বর্জয়িত্বেতরা ক্রমাৎ
ঈষদাকুঞ্চিতা যত্র সোহর্ধচন্দ্রকরাঃ স্মৃতাঃ।"

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনীকে ঘুরিয়ে একটু ওপরের দিকে করলেও অঙ্গুষ্ঠকে কিছু পিছনে রাখলে হাতের যে রূপ হয় তাকে অর্ধচন্দ্র হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে ঈশ্বর, আকাশ, ক্লান্তি প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে হাস্য, ঘৃণা প্রভৃতি অর্থ অর্ধচন্দ্র হস্ত প্রকাশ করে।

মুকুর ঃ "মধ্যমানামিকানগ্রে অঙ্গুষ্ঠোহপি পরস্পরম্
যদ্যারভেরন্থু স্পর্শায় মুকুরঃ স করঃ স্মৃত।"

মধ্যমা অনামিকাকে নীচু করে এবং অঙ্গুষ্ঠা এদের সামনাসামান কুঞ্চিত অবস্থায় উর্ধ্বমুখী হলে এবং তর্জনী ও কনিষ্ঠা কুঞ্চিত হয়ে ওপরের দিকে মুখ করে থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মুকুর বলে। সংযুক্তরূপে মুকুর মেদ, স্তম্ভ, ভ্রাতা, শয়তান, বিচ্ছেদ প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে শত্রু, ক্রোধ, গ্রীবা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

ভ্রমর ঃ "নমিতা তর্জনী যস্য স হস্তো ভ্রমরাহয়ঃ"

তর্জনীকে নীচু করলে হাতের যে রূপ হয় তাকে ভ্রমর হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে ছাতা, পাখা, সঙ্গীত, জল প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে গন্ধর্ব, জন্ম, ভীতি, রোদন প্রভৃতি অর্থ ভ্রমর হস্ত প্রকাশ করে।

সূচীমুখ ঃ "মধ্যমানামিকা পৃষ্ঠমঙ্গুষ্ঠো যদি সংস্পৃশেৎ
কনিষ্ঠিকা কুঞ্চিতা চ সূচীমুখকরস্তু সঃ।"

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা তিনটি কুঞ্চিত থাকলে এবং অঙ্গুষ্ঠ এসে যুক্ত হলে এবং তর্জনী সোজা হয়ে উর্ধ্বমুখী হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে সূচীমুখ বলে। সূচীমুখ সংযুক্তরূপে লক্ষণ, উর্ধ্বলম্ফন, পৃথিবী প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে মৃতদেহ, কর্ণ, রাজ্য, সাক্ষ্যদাতা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

পল্লব ঃ "মূলম্ চানামিকাঙ্গুল্যা অঙ্গুষ্ঠো যদি সম্পৃশেৎ
স পল্লবকরঃ প্রোক্তো নৃত্যকর্মবিশারদৈঃ।"

অনামিকার নীচে এসে অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত হলে পল্লব হস্ত হয়। সংযুক্ত-রূপে পল্লব হস্ত ইন্দ্রায়ুধ, গিরিশিখর, মহিষ প্রভৃতি এবং অসংযুক্তরূপে দূরত্ব, ধূম্র, ধান্য, যবাদি শস্য প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

ত্রিপতাক ঃ "অঙ্গুষ্ঠঃ কুঞ্চিতাকারস্তর্জনী মূলমাশ্রিতঃ
যদি স্যাৎস করঃ প্রোক্ত ত্রিপতাকো মুনীশ্বরৈঃ।"

অঙ্গুষ্ঠকে কুঞ্চিত করে তর্জনীর মূলদেশ স্পর্শ করলে হাতের যে রূপ হয় তাহাকে ত্রিপতাক হস্ত বলে। কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী উর্ধ্বমুখী হবে। সংযুক্তরূপে ত্রিপতাক সূর্যাস্ত, দেহ, ভিক্ষা প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। ইহার কোন অসংযুক্তরূপে প্রয়োগ হয় না।

মৃগশীর্ষ ঃ "মধ্যমানামিকামধ্যমঙ্গুষ্ঠো যদি সংস্পৃশেৎ
মৃগশির্ষকহস্তোহয়ম্ কথিতো মুনিপুঙ্গবৈঃ।"

মধ্যমা, অনামিকা কুঞ্চিত হয়ে অঙ্গুষ্ঠের সাথে যুক্ত হবে এবং কনিষ্ঠা ও তর্জনী সোজা থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মৃগশীর্ষ বলে। সংযুক্তরূপে মৃগ, স্বর্গীয় বস্তু প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং মৃগশীর্ষ হস্তের কোন অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

সর্পশীর্ষ : অঙ্গুষ্ঠস্তর্জনী পার্শ্ব সংস্পৃষ্টশ্চ ভাবত্যাদি-
শেষাঃ কিঞ্চিদিনম্রাশ্চেতু সর্পশীর্ষ করঃস্মৃত: ।"

অঙ্গুষ্ঠ তর্জনীর পাশে যুক্ত হবে এবং সমস্ত অঙ্গুলিগুলি সংলগ্ন হয়ে সামনের দিকে অল্প কুঞ্চিত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে সর্পশীর্ষ বলে। সংযুক্তরূপে সর্পশীর্ষ হস্ত সর্প, প্রদান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। এর কোন অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

বর্ধমানক : "স্পৃশেৎ প্রদেশিনী যত্র রেখামঙ্গুষ্ঠমধ্যগাম্
কিঞ্চিতোদঞ্চিতা শেষা স হস্তো বর্ধমানকঃ ।"

চারি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ ও অঙ্গুষ্ঠ সোজা হয়ে ওপর দিকে থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাকে বর্ধমানক হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে এই হস্ত যোগী, মাহুত, ভেরী, মুক্তামালা প্রভৃতি ও অসংযুক্তরূপে কূপ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

অরাল : "তর্জনী মধ্যমাম্ রেখাম্ অঙ্গুষ্ঠো যদি সংস্পৃশেৎ
কুঞ্চিতোদঞ্চিতাশ্চান্যা অরালঃ স করঃ স্মৃতঃ ।"

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা এই তিনটি অঙ্গুলি কুঞ্চিত হয়ে মুষ্টির মত হবে এবং তর্জনী সোজা হয়ে সামনের দিকে থাকবে এবং অঙ্গুষ্ঠ তর্জনীর মধ্যভাগ স্পর্শ করবে, তাহলে হাতের যে রূপ হবে তা অরাল হস্ত। এই হস্ত সংযুক্তরূপে নির্বোধ, কুঁড়ি, নখন্ন প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোন অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

উর্ণনাভ ঃ "উর্ণনাভপদাকারাঃ পঞ্চাঙ্গুল্যশ্চ যত্র হি।
উর্ণনাভাভিধঃ প্রোক্তঃ স হস্তো মুনিপুঙ্গবৈঃ।"

হাতের পঞ্চাঙ্গুলি কুঞ্চিত হয়ে সামনের দিকে থাকলে হাতের যে রূপ হয় তাহাকে উর্ণনাভ বলে। সংযুক্তরূপে এই হস্ত অশ্ব, ব্যাঘ্র, পদ্ম, ফল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোন অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

মুকুল ঃ "পঞ্চানামঙ্গুলিনাম্ চ যদগ্রে মিলিতো ভবেৎ
সুষ্ঠম্ যত্র চ বিজ্ঞেয়ো মুকুলাস্ত্যঃ কর স্মৃতঃ।"

পঞ্চাঙ্গুলি কুঞ্চিত হয়ে এক জায়গায় এসে মিলিত হলে হাতের যে রূপ হয় তাকে মুকুল হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে এই হস্ত শৃগাল, হনুমান প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোন অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

কটকামুখ ঃ "মধ্যমানামিকামধ্যম্ অঙ্গুষ্ঠা প্রবিশেদ্যাদি
শেষাঃ সন্নমিতাঃ যত্র স হস্তঃ কটকামুখঃ।"

অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ মধ্যমা ও অনামিকার মধ্য দিয়ে বাইরে চলে আসা অবস্থায় হাতের যে মুষ্টিবদ্ধ রূপ তাকে কটকামুখ হস্ত বলে। সংযুক্তরূপে ভৃত্য, বীর, অস্ত্রাগার, মল্ল প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে এবং এর কোন অসংযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

এই সকল মূল হস্তগুলি সংযুক্ত ও অসংযুক্ত মুদ্রা ছাড়াও সমমুদ্রা ও মিশ্রমুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এই মুদ্রাগুলি আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, বিবর্তিত ও পরিবর্তিত এই চার প্রকার পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়া পদার্থাভিনয়াত্মক অর্থাৎ বাক্যের অর্থ প্রকাশক।

কথাকলি নৃত্যে সম, আলোকিত, সাচী, প্রলোকিত, মিলিত,

উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত এই আট প্রকার দৃষ্টি অর্থভেদে ব্যবহৃত হয়।

অক্ষিপুটেরও উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিত, সম, বিবর্তিত, স্ফুরিত, পিহিত, বিলোলিত এই নয় প্রকার গতিতে প্রযুক্ত হয়। উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রূকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত, সহজ এই সাত প্রকার ভ্রূকর্ম কথাকলি নৃত্যে ব্যবহৃত হয়। ভ্রমণ, বালন, পাতন, সম্প্রবেশ, নির্বতন, সমুদ্ধৃতম নিষ্ক্রাম, প্রাকৃত ও চলন এই নয় প্রকার অক্ষিগোলকের প্রয়োগ প্রচলিত।

সম, উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত এই নয় প্রকার শিরঃকর্ম কথাকলি নৃত্যে প্রয়োগ হয়।

নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছ্বাসা বিক্রণিতা, স্বাভাবিকী এই ছয় প্রকার নাসাকর্ম ও ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ, কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম এই ছয় প্রকার গণ্ডকর্ম কথাকলি নৃত্যে প্রয়োগ হয়।

কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চিকিত, লেহন, সম, দষ্ট এই সাতপ্রকার চিবুককর্ম ও সমা, নতা, উন্নতা, ত্রস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা ও নিবৃত্তা এই নয় প্রকার কণ্ঠ কথাকলি নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

এ ছাড়া বিকর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগুহন, সংদষ্ট, সমুদ্রক, এই ছয় প্রকার অধরকর্ম ও স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত, ও সাম্য এই চার প্রকার মুখরাগ প্রচলিত।

রসাভিনয় কথাকলি নৃত্যনাট্যের কঠিনতম ও শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ। নাট্যশাস্ত্রের মতে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রস মন ও অনুভূতির সংঘাতে সৃষ্ট। রসই স্থায়ীভাবের উৎস। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় এই আটটি স্থায়ীভাব। পরবর্তীকালে 'শান্ত'কে নবম রসরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কথাকলি নৃত্যে নবরসেরই প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই রসনিষ্পত্তিই শিল্পকলার উন্নততম পর্যায়।

কথাকলি নৃত্যশিল্পীর ভাবাভিনয়ে ও রসাভিনয়ে যে উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর।

কথাকলি অভিনয় পদ্ধতি পৃথিবীতে অতুলনীয়। মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জায় কোন পরিবেশ তৈরী করা হয় না। শুধুমাত্র অভিনয় কুশলতায় ও শিল্পকর্মের উৎকর্ষে নাট্যের রূপকল্প ও চিত্রকল্পকে প্রস্ফুট করা হয়। বিভিন্ন পৌরাণিক চরিত্র রূপায়ণের সময় শিল্পীদের যেন এক অন্য জগতের ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন যোগী বলে ভ্রম হয়।

এই প্রসঙ্গে Dr. Jung এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য : "It is not the world of the senses, the body, color and sound, or human passions, which are born anew in transfigured form, through the creative power of the Indian soul : but it seems as if there were an 'underworld' or an 'overworld' of a metaphysical nature, out of which strange forms emerge into the familiar earthly world. If one observes closely the tremendously impressive impersonation of the gods, performed by the Southern Indian Kathakali dancers, there is not a single natural gesture to be seen. Everything is bizarre, both subhuman and superhuman The dancer-gods do not walk like people—they glide ; they do not seem to think with their heads—but with their hands. Even the human faces disappear behind enamelled masks. Our own world offers nothing which can be compared to such grotesque grandeur. When watching out of these spectacles one is transported into the world of

dreams, for that is the only place where we might conceivably meet anything similar. The representations of the kathakali dancers, or those depicted in the temple pictures, are however no nocturnal phantasms. They are tensely dynamic figures, logically constructed with the finest details, or as if they had grown organically,. These are no shadows or likenesses of a former reality, thay are more like realities which have not yet been, potential realities, which can step at any moment over the threshold of existense."

কথাকলি অভিনয় সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ছবি এই উদ্ধৃতি থেকে পাওয়া যায়। কথাকলি নাট্যে দুটি প্রধান ভাগ। একটি তালাশ্রয়ী বা ছন্দবহুল অপরটি অভিনয়বহুল। মূলতঃ দৃশ্যকাব্য বলে কথাকলি অভিনয়প্রধান। আঙ্গিকাভিনয় ও রসাভিনয়ের মাধ্যমে কথাকলিশিল্পীরা নাট্যের সকল অভিব্যক্তি দর্শকদের সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে সক্ষম। বেগুনফুলের ভিতরের অংশ রস করে শুকিয়ে চোখের নীচের পাতায় দিয়ে চোখের ভিতরের অংশ লাল করা হয় কারণ লাল চক্ষু ভাবপ্রকাশে অধিক সাহায্য করে। এবং প্রসাধনের বিভিন্ন রঙের উপকরণের অনিষ্টকারী ক্ষমতাকে এই রস নষ্ট করে, চোখ ও মুখের চামড়াকে সুস্থ রাখে।

কথাকলি নৃত্যে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কথাকলি গীতি পদম, শ্লোকম্ ও দণ্ডকম তিন পর্যায়ে গীত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ ও রাগিণী ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীতশিল্পীরা সোপান ভঙ্গীতে গীতি পরিবেশন করেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে অষ্টপদীগুলি কথাকলি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কথাকলি নৃত্যনাট্যে সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে যিনি প্রধান তাকে

'পোন্নান' বলা হয়। অপর শিল্পী যিনি প্রধান গায়ক কর্তৃক গীত হবার পর তার পুনরাবৃত্তি করেন তাকে 'সংকেটি' বলা হয়। কথাকলি নৃত্যে চাণ্ডা, মাদ্‌লম্, চাংগালা ও এলাতালম বা কাইমনি এ চতুর্যন্ত্রই প্রধান। পোন্নান স্বয়ং চাংগালা এবং সংকেটি 'কাইমনী' বাজান। লক্ষণীয় যে তালযন্ত্রের প্রাধান্যই বিদ্যমান কারণ এগুলি সবই তালযন্ত্র। কথাকলি সঙ্গীতশিল্পীদের মধ্যে কেশবন নায়ার, গোপালকৃষ্ণ ভগবতার, নীলকান্ত নাম্বেশন, মাধবন নায়ার, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কেশবন নাম্বৃদ্রি প্রভৃতি ৰিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কথাকলিতে মূলতঃ পাঁচটি তাল প্রচলিত। যথা—চাম্বাড়া, চাম্পা, আড়ান্দা, ত্রিপাড়া ও পাঞ্চারী। কলাশম্ তালাশ্রয়ী নৃত্য, এই নৃত্যের দেহভঙ্গী ও পাদবিন্যাসগুলি বিচিত্র তালগুচ্ছ সহযোগে সুপরিস্ফুট হয়। এই তালগুচ্ছের প্রধান তাল গুচ্ছবিন্যাসের স্তরে স্তরে বিভিন্ন গুণারোপিত হয়ে একাধিকবার আবির্ভূত হয়ে যখন সমে এসে শেষ হয় তখন সমগ্র নৃত্যের এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক তৈরী হয়। সাধারণতঃ পদমের শেষেও অন্য পদম্ আরম্ভের আগে কলাশম্ ব্যবহৃত হয়। এডা কলাশম্, অষ্ট কলাশম, এডিন্থ কলাশম, ওয়াট্টাম, বেচ্চা কলাশম্ প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে কলাশম ব্যবহৃত হয়।

সারি কথাকলি নৃত্যের লাস্য ধরণের নৃত্যচ্ছন্দ। এই নৃত্যে নারী-চরিত্র অথবা চরিত্রগুলি কোন উদ্যানে নৃত্যের মাধ্যমে আত্মবিনোদন করে। রাজদরবারের দৃশ্যেও এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সারি শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ চারীর সঙ্গে সম্পর্কিত। নাট্যশাস্ত্রের মতে একে হস্ত চালনা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষম ভঙ্গী রচনা বলা যেতে পারে। ললিতা, চিত্রলেখা, ঊষা, রম্ভা প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্রে শিল্পীরা সারি নৃত্য করে থাকেন। সারি নৃত্যে মাদলম্, চ্যাংগালা ও কাইমনি ব্যবহৃত হয়। চান্দা এই নৃত্যে ব্যবহার হয় না। সারি নৃত্যে চাম্বাড়া (আট মাত্রা) তাল ব্যবহৃত হয়।

মিনিক্‌ জাতীয় রূপসজ্জা। স্ত্রীলোকের ভূমিকার উপযোগী লোক-নৃত্যের ভিত্তিতে সৃষ্ট লাস্য ধরণের সমবেত নৃত্য কুম্মি ও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সাধারণভাবে কথাগুলি নৃত্যশৈলীতে তাণ্ডব লক্ষণ-ই অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রযুক্ত হয়। যে জন্য এই নৃত্য নিঃসন্দেহে পুরুষ শিল্পীদের অধিকতর উপযোগী।

তামিলনাদের প্রচলিত একক নৃত্য ভরতনাট্যমের মত কেরলের মোহিনীআট্যম নৃত্য মহিলাশিল্পীদের অনুষ্ঠানের জন্য সৃষ্ট। কেউ বলেন প্রখ্যাতা অপ্সরা মোহিনী যিনি শিবেরও তপোভঙ্গ করেছিলেন তিনি এই নৃত্য সৃষ্টি করেন। আবার কারো কারো মতে বিষ্ণু ভস্মাসুর বধের জন্য মোহিনী মূর্তি ধারণ করে নৃত্যের প্রতিযোগিতায় যে নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন তাই মোহিনীআট্যম্‌। শৃঙ্গাররসাত্মক লাস্য নৃত্য মোহিনীআট্যমের সাথে ভরতনাট্যমের অনেক সাদৃশ্য আছে। এই নৃত্যে সাধারণ রূপসজ্জা ও অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়।

কথাকলি নৃত্যের অনুরূপ অথচ আড়ম্বরহীন ওট্টান তুল্লাল, কালী আট্যম্‌ প্রভৃতি নৃত্য কেরলে প্রচলিত। তুল্লালে শিল্পীরাই গান করে। কথাকলির মুদ্রাগুলি ব্যবহৃত হয়। পাচ্চা ধরণের রূপসজ্জা ব্যবহৃত হয়। শিল্পীর মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার মুকুট থাকে। শ্রীকুঞ্জন নাম্বিয়ার এই নৃত্যশৈলীর প্রবর্তক। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই নৃত্যশৈলী অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কথাকলি নৃত্য শিক্ষাদানের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত। এই অনুশীলন পদ্ধতির মধ্যেও এই নৃত্যকলার বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এগার থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক ছাত্ররা কালারীতে (গুরুর আশ্রম) গিয়ে গুরুকে অর্থ ও বস্ত্র দক্ষিণা দিয়ে ছয় হাত লম্বা ও ছয় ইঞ্চি চওড়া মোটা কাপড়ের 'কাচ্চা' ও তৈল গ্রহণ করে। প্রত্যুষে চোখে তেল লাগিয়ে দুই ঘণ্টা ধরে অবিরাম দৃষ্টিকর্ম অভ্যাস করতে হয়। তারপরে সমস্ত দেহে ভাল করে তেল মাখতে হয়। তারপর

বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্র ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হবার পর গুরু পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ছাত্রের দেহের গ্রন্থিসমূহ মালিশ করে দেন। এতে মাংসপেশী ও গ্রন্থিসমূহের নমনীয়তা ও সঞ্চালন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর পর স্নান ও প্রাতরাশ গ্রহণের পর ছন্দের তালে তালে নৃত্যশিক্ষা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয় চক্ষু, অক্ষিপুট ভ্রূ, গ্রীবা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন পদ্ধতি। তৃতীয় পর্যায়ে মুদ্রা, ভাবাভিনয় ও বিভিন্ন ভঙ্গী প্রকাশের শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যায়ে চতুর্বাদ্যের সঙ্গে অনুশীলন করানো হয়। এই সব শিক্ষা সমাপ্ত হলে ছাত্রের অধ্যবসায় ও দক্ষতা অনুসারে তাকে কথাকলি অনুষ্ঠানের মহড়ায় উপস্থিত করা হয়। এই শিক্ষা ক্রমের মোট সময় অন্যূন এগার বৎসর। এই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস অনুশীলন পদ্ধতিই কথাকলি শিল্পীদের প্রাণবন্ত অভিনেতায় পরিণত করে।

কথাকলি শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ও বিকাশের ক্ষেত্রে মহাকবি ভাল্লাথোল নারায়ণ মেননের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির এই লুপ্ত প্রায় মহান ধারাটিকে নবজীবন দান করেছেন। নিরলস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জীবনের দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর কেরালা কলামণ্ডলম স্থাপন করে এই মহান সাধনায় আত্মদান করেছেন। তার নেতৃত্বে মালয়, চীন, সিংহল ও সোভিয়েট ইউনিয়নে কথাকলি শিল্পীসম্প্রদায় এর অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়েছে।

প্রখ্যাত কথাকলি নৃত্যগুরুদের মধ্যে চেঙ্গানুর রমন পিল্লাই, কুঞ্জ কুরূপ, কৃষ্ণান নায়ার, কুঞ্জনায়ার, রামন কুটি নায়ার, কৃষ্ণকুট্টি, চম্পাকুলম পাচু পিল্লাই প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীউদয় শঙ্করের কথাকলি নৃত্যগুরু শঙ্করণ নাম্বুদ্রি কথাকলি অভিনয়মের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী রূপে স্বীকৃত। বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় আচার্য গুরু গোপীনাথ কথাকলি নৃত্যধারার সংস্কারসাধনের অগ্রদূত। এই প্রাচীন নৃত্যকলার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে যুগোপযোগী

পরিমার্জিত নবরূপায়ণে এই ধারাটিকে সার্থক প্রয়োগে সাম্প্রতিক কালে কলামণ্ডলম গোবিন্দন কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন, কেলু নায়ার প্রভৃতি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন।

মণিপুরী

১১
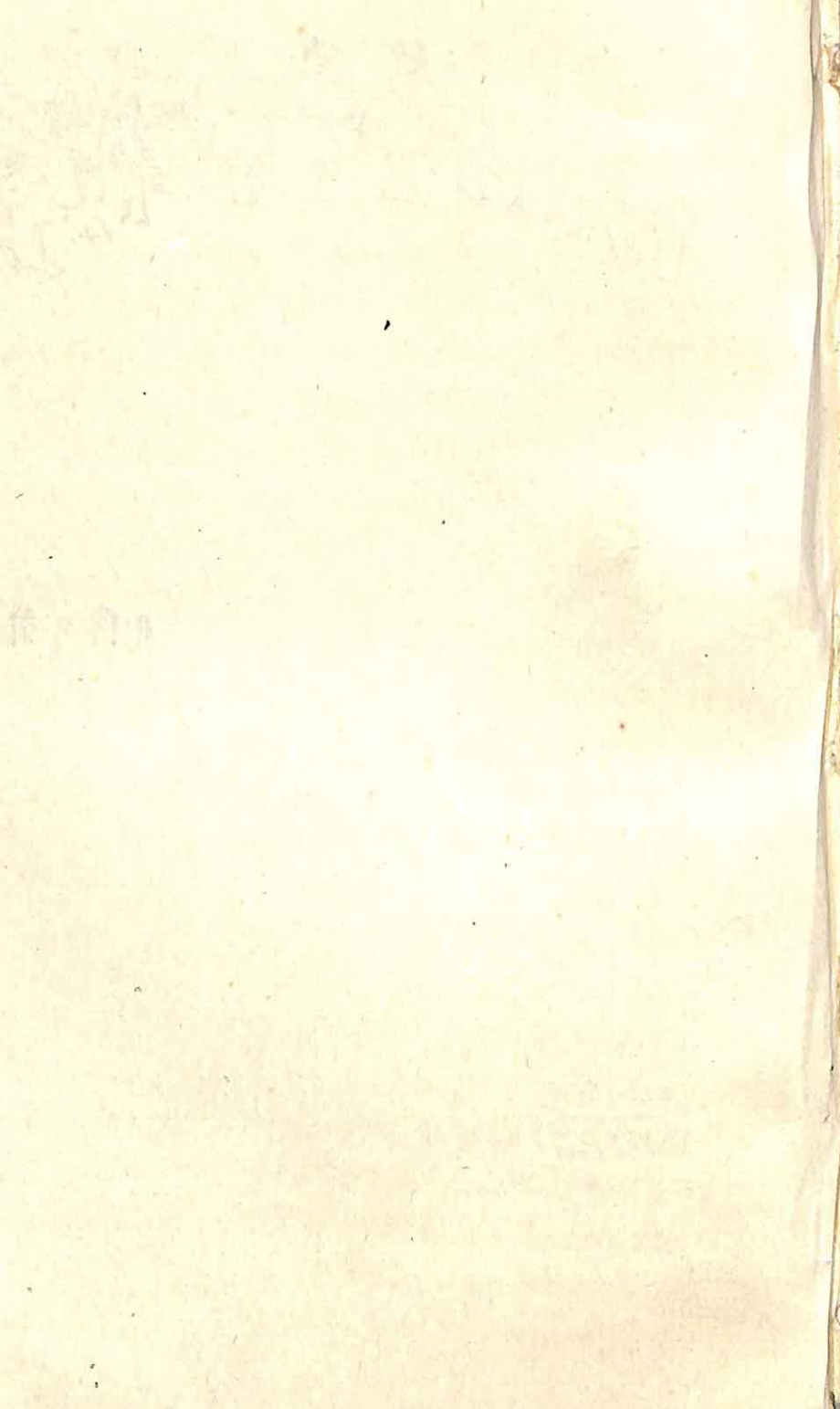
মণিপুরী নৃত্য

সৌন্দর্যের লীলাভূমি ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র মণিপুর রাজ্য স্মরণাতীত কাল থেকেই সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট গৌরবময় স্থানের অধিকারী। পর্বতমালাবেষ্টিত এই ক্ষুদ্ররাজ্যটি বিচিত্র মানস সংস্কৃতির সম্পদে, সহজাত শিল্প ও সৌন্দর্যবোধের দীপ্তিতে রূপময় ভারতসংস্কৃতির অনির্বান শিখাটিকে উজ্জ্বলতর করেছে। সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় এরকম জাতিগত প্রবনতা ভারতের অন্য কোন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় না। মণিপুরী সংস্কৃতির বিকাশের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি নৃত্যকলায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। সমষ্টিগত ভাবে একে মণিপুরী নর্তন বা 'মৈতৈ জগোই' বলা হয়।

মণিপুর রাজ্যের উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনীটিও নিঃসন্দেহে মণিপুরীদের সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুরাগের পরিচয় বহন করে। মণিপুর রাজ্যে প্রচলিত বহু প্রাচীন গাথা ও পৌরাণিক উপকথাতেও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—মণিপুর অধিবাসীদের সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। মণিপুর রাজ্য ও তার সঙ্গীত ও নৃত্যকলার উৎপত্তি সম্পর্কে একটি কাহিনী বহুল প্রচলিত।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিয়ে একটি নির্জন স্থানে রাসলীলার অনুষ্ঠান করেন। শিব রাসলীলা দেখতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে রাসমণ্ডলীর দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করেন। শিব যখন দ্বাররক্ষীরূপে রাসলীলার

সুললিত সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত, তখন সেখানে পার্বতী এসে উপস্থিত হলেন। পার্বতী শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করে রাসমণ্ডলীর দ্বার খুলে তার কৌতূহল নিবৃত্ত করেন। এই রাসলীলা দেখবার পর হতেই তিনি শিবের সাথে রাসনৃত্য করবার জন্য অধীর হয়ে শিবকে তাদের রাসলীলা করবার উপযোগী একটি স্থান নির্বাচন করতে বলেন। শিব ও পার্বতী তখন পৃথিবী পরিভ্রমণ করে হিমালয়ের পাদদেশে মণিপুরে অবতীর্ণ হলেন।

কথিত আছে শিবের ইচ্ছায় মণিপুরে স্বর্গ থেকে সাতজন দেবতা বা 'সানাজিঙ' আবির্ভূত হয়েছিলেন। এরাই হলেন সপ্তগ্রহ অর্থাৎ 'নোঙমাইজিঙ' বা সূর্য, 'নিঙথোউকাবা' বা চন্দ্র, লেইপাক্‌পোকু বা মঙ্গল, য়ুম-সাইকে-সা বা বুধ, 'সাগোলসেল' বা বৃহস্পতি, 'ইরাই' বা শুক্র ও 'থাঙ্‌জা' বা শনি। শিব ও পার্বতী 'কোউব্রু' বা কুমার পর্বতকে তাদের রাসলীলার উপযোগী স্থান হিসাবে নির্বাচন করলেন। পর্বতের পাদদেশ জলমগ্ন। তখন শিব শ্রীকৃষ্ণকে স্থানটিকে রাসনৃত্যের উপযোগী জলশূন্য শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করার জন্য অনুরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন 'হাওবা শোরারেল' বা ইন্দ্র, 'মারজিঙ' বা কুবের, 'রাঙব্রেল' বা যম, 'খোরিকাবা' বা বরুণ, 'ইরুম্‌-নিংখৌ' বা অগ্নি, 'থাঙজিঙ' বা অশ্বিনী-কুমার, 'চিংখেই-নিঙথোই' বা ঈশান, 'লোইয়া লাকপা' বা বায়ু, 'নোঙসাবা' ও 'কোঙবা-মেইরোম্‌বা'—এই দশজন দেবতার সাহায্যে দেশটিকে জলশূন্য, পরিস্কৃত ও সুসংস্কৃত করলেন। এখানে সাতদিন সাতরাত্রি ধরে শিবপার্বতীর রাসলীলা অনুষ্ঠিত হল। গন্ধর্ব ও অন্যান্য দেবতাগণ হলেন সঙ্গীত সহযোগী। পাতালের নাগদেবতা অনন্তনাগ তাঁর মাথায় উজ্বল মণির সাহায্যে স্থানটিকে আলোকিত করলেন। নাগদেবতার মণির আলোকে উজ্জ্বল বলে এই দেশের নাম হল মণিপুর।

অনন্তনাগই প্রথমে মণিপুরের রাজা হন। তার পরে রাজপদে অভিষিক্ত হন গন্ধর্ব চিত্রভানু। মণিপুরীরা নিজেদের এই নৃত্যগীতি কুশল গন্ধর্বদের বংশধর বলে পরিচয় দেয়। এবং প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের বীর অর্জুন ও গন্ধর্বরাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার কাহিনীর উল্লেখ করে। সর্পমূর্ত্তিযুক্ত মণিপুরের পতাকা মণিপুরের প্রথম রাজা অনন্তনাগের পরিচয় বহন করে।

এ-ছাড়াও বহু বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনী থেকে হিন্দু-পূর্ব যুগের মৈতৈ জাতির উৎপত্তির ইতিহাস পাওয়া যায়। জর্জ গ্রিয়ার্সন, চার্লস লয়েল, ডঃ ব্রাউন, টি. সি. হডসন প্রভৃতি প্রখ্যাত নৃতাত্বিক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে মণিপুরীরা মোঙ্গোলীয় কুকি-চিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও এদের কিরাতশ্রেণীর মানুষের অন্তর্ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেছেন। যজুর্বেদ ও অথর্ববেদে কিরাতদের কথা পাওয়া যায়।

মণিপুরী সংস্কৃতি সম্পর্কে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ "মণিপুরীরা এখন হিন্দু, ইহারা নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যতদূর জানা যায়, খ্রীষ্টিয় ১৫০০র পূর্বেই ইহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রসারলাভ করে। মণিপুরের রাজারা ও অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ করেন; আবার নিজেদের আদিকালের ধর্ম ও দেবতাবাদ এবং নানা অনুষ্ঠানও বজায় রাখেন; এই উভয়ের সংমিশ্রণে মণিপুরী হিন্দুধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মণিপুরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট হইতে আগত বাঙ্গালী হিন্দুরাও এই ধর্মের প্রচারে সহায়ক হইয়াছিলেন; ইহাদের অধ্যুষিত বিষ্ণুপুর নগর, মণিপুরে হিন্দুসংস্কৃতির একটি প্রাচীন কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। মণিপুরী (বা মেইতেই) জাতি, বিরাট কিরাত-জাতির ভোট-ব্রহ্ম-শাখার অন্তর্গত কুকি (বা চিন, অথবা কুকি-চিন) প্রশাখার একটি বিশিষ্ট উপজাতি।

সৌন্দর্যবোধে এবং কর্মকুশলতায়, তথা চিন্তাশীলতায় ও মানসিক শক্তিতে, ইহারা সমগ্র কিরাত জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজেদের প্রাচীন দেবকথা ইহারা পরিত্যাগ করে নাই; ইহা একাধারে ইহাদের রক্ষণশীলতার ও জাতীয়তাবোধের এবং তাহার আনুষঙ্গিক আত্মসম্মানজ্ঞানের ও নিজ জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচায়ক। আবার ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হিন্দু পুরাণের সঙ্গে নিজেদের পুরাণকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টাতেও, অজ্ঞাতসারে আর্য্যানার্য্য-সম্মেলনের মহৎ কাজে ইহাদের অংশগ্রহণের পরিচয়ও পাওয়া যায়।"

প্রকৃতপক্ষে জাতি ও ধর্মের এই বৈচিত্রপূর্ণ সমন্বয়ের ফলেই মণিপুরের উন্নত আর্য-কিরাত সংস্কৃতি মহত্তর হয়েছে। যে কোন জাতির সংস্কৃতির রূপই তার সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। মণিপুরী সমাজের গঠন ও সংস্কৃতির বিকাশ এর কারণ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়ঃ "কিন্তু তাহারই অন্যতম আঞ্চলিক শাখা মণিপুরীদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। যে কোন কারণেই হউক, একদিন নাগাজাতির মূলশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ইহা একটি বিশিষ্ট সামাজিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সামাজিক জীবনের একটি প্রধান ধর্ম এই ছিল যে, ইহা নিজের মধ্যে নিশ্ছিদ্র হইয়া বাস করে নাই; যে সকল উপকরণ দ্বারা সমাজের স্বাস্থ্য পুষ্ট ও আয়ু বর্ধিত হইতে পারে, তাহা ইহা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে—তাহার ফলে ইহার প্রাণশক্তি ও অঙ্গসৌষ্ঠব দুই-ই বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ইহার আকৃতি ও প্রকৃতির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয় নাই। মণিপুর একদা ব্রহ্মদেশের অধীন ছিল; সেই সময় ইহা ব্রহ্মদেশীয় সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; তারপর একদিন যখন বাংলাদেশ হইতে বৈষ্ণবধর্ম গিয়া যেখানে প্রচারলাভ করিয়াছিল, সেইদিনও সে তাহার সমাজ জীবনের মধ্যে তাহা বরণ

করিয়া লইয়াছে; কিন্তু ধর্মপালনের তাহার যে নিজস্ব আঙ্গিক, তাহাই ইহার উপর আরোপ করিয়া লইয়াছে। এইখানেই মণিপুর অন্যের উপকরণ গ্রহণ করিয়াও স্বকীয়তা রক্ষা করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ কিংবা বাংলার সংস্কৃতি ইহার সংস্কৃতি গ্রাস করিতে পারে নাই, বরং উভয়ের নিকট হইতে দুইহাত পাতিয়া ইহা যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে নিজের মত করিয়াই ব্যবহার করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে সব চাইতে বড় কথা এই যে, ইহাদের চাপে পড়িয়া সে তাহার নিজস্ব সংস্কৃতির মৌলিক প্রকৃতি বিসর্জন দেয় নাই। সেইজন্য মণিপুরবাসীগণ অর্জ্জুনের বংশধর বলিয়া দাবী করিলেও মহাভারতের সংস্কৃতির মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া নাই, উৎসবে পার্বণে তাহারা নিজেদের জাতীয় চরিত্রসমূহের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে; রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী অপেক্ষাও মণিপুরে থৈবী ও খাম্বার প্রেমকাহিনী অধিকতর জনপ্রিয়। সঙ্গীতে ও নৃত্যে একদিক দিয়া ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী যেমন তাহারা নিজেদের মত করিয়া রূপায়িত করিতেছে, আবার তেমনই নিজেদের জাতীয় আখ্যায়িকা সমূহকেও তাহাদের মধ্য দিয়া রূপ দিতেছে। অতএব মণিপুরীর সমাজ একটি আদর্শ সংহত সমাজ, অর্থাৎ ইহাই যথার্থ লোক সংস্কৃতি (folk culture) তথা লোক সাহিত্যের জন্মস্থান হইতে পারে।”

এই উন্নত সামাজিক পরিবেশে উদ্ভূত বলেই শুধুমাত্র মণিপুরী নৃত্যকলা নয়—সকল মণিপুরী শিল্পকর্মই আদিম সারল্যপূর্ণ অথচ পরিশীলিত রুচিস্নিগ্ধ রূপময়তা ও রসসম্পদে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সৃষ্টি করে।

পুরাণ ও প্রাচীনগাথার কথা বাদ দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে মণিপুরের কোন নির্ভরযোগ্য প্রামানিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৫৪ খৃষ্টাব্দের একটি তাম্রফলক মণিপুরের সংস্কৃতির সবথেকে প্রাচীনতম নিদর্শন। ঐ তাম্রফলকে রাজা কোয়াই-থম্পককে সঙ্গীত ও নৃত্যের একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে ৭০৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজা খো-লো-ফেঙ মণিপুর রাজ্য অধিকার করেন এবং তিনি আসাম ও মণিপুরের নৃত্যশিল্পীদের সমন্বয়ে একটি শিল্পীদল চীনদেশে পাঠান। কথিত আছে ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা লয়াম্বা খাম্বাথৈবীর প্রেমের করুণ কাহিনী অবলম্বনে 'লাইহারাউবা' নৃত্যের প্রচলন করেন। আনুমানিক ১২৫০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর চীন সংঘর্ষে মণিপুরীরা জয়লাভ করেন। সেই যুদ্ধে ধৃত বন্দীদের অনেকে মণিপুর উপত্যকার সুসারামেঙ নামক স্থানে বসবাস করে। এদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মণিপুরীগণ শিক্ষালাভ করেন। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে মণিপুরের রাজা কয়াম্বার রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশের রাজা পঙ মণিপুর থেকে সুদক্ষ নৃত্যশিল্পী ও মৃদঙ্গবাদক ব্রহ্মদেশে নিয়ে যান। তার বিনিময়ে ব্রহ্মদেশীয় রণশিঙ্গাবাদক মণিপুরে আসে। রাজা কয়াম্বার সময় মণিপুরে শৈব ও বৈষ্ণব এই উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে রাজা পামহৈবার রাজত্বকাল থেকেই মণিপুরের আধুনিক ইতিহাসের সূচনা। এবং এর পূর্বের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। এর অন্যতম কারণ রাজা পামহৈবা যখন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন তখন পূর্বতন সমস্ত ঐতিহাসিক নথিপত্র ধ্বংস করে ফেলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই মণিপুর রাজ্যের ইতিহাসের কিছু কিছু প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। রাজা পামহৈবা গোস্বামী শান্তিদাস অধিকারীর প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। এই বৈষ্ণবধর্ম ছিল রামানন্দী ভাবাদর্শে প্রভাবিত। বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাবের ফলে মণিপুর রাজ্যের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। রাজা পামহৈবা প্রজাদের মধ্যে মৈতৈ ব্রাত্যধর্মের পরিবর্তে বৈষ্ণবধর্মের প্রচলনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং তদনুযায়ী গুরু গোস্বামী শান্তিদাসের নির্দেশে মৈতৈ ধর্ম ও ইতিহাস সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র বিনষ্ট করা হয়। তিনি মৈতৈ দেবদেবীদের পূজা, মৈতৈ ভাষা ও বর্ণমালার প্রচলন

নিষিদ্ধ করেন। স্বভাবতই ইহা মৈতৈ শিল্প সংস্কৃতির উপর বিশেষ আঘাত হানে। এর পর থেকেই মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। রাজা পামহৈবা 'গরীব নেওয়াজ' বা দরিদ্রের আশ্রয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে বৈষ্ণবধর্মকে মণিপুরের জাতীয় ধর্মে পরিণত করেন।

রাজা পামহৈবার পৌত্র চিঙ সাঙ্ খম্বা অথবা ভাগ্যচন্দ্র জয়সিংহ "কর্তা মহারাজা" নামে পরিচিত। ১৭৬৪ খৃঃ থেকে ১৭৮৯ খৃঃ পর্যন্ত তার রাজত্বকাল মণিপুরী সংস্কৃতির বিকাশের স্বর্ণযুগ। রাজা ভাগ্যচন্দ্র কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং তার রাজত্বকালে বাংলাদেশ থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য প্রেমানন্দ ঠাকুর মণিপুরে আসেন। ফলে ক্রমশঃ রামানন্দী ভাবাদর্শের পরিবর্তে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে প্রসার লাভ করে। এবং কালক্রমে মৈতৈ বর্ণমালার পরিবর্তে বাংলা বর্ণমালা মণিপুরে প্রচলিত হয়। মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় এর প্রভাব পড়ে। এবং চৈতন্য, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের পদাবলী মণিপুরী সঙ্গীত ও নৃত্যে অনুসৃত হতে থাকে।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র যে কেবলমাত্র বীর ও সুশাসক ছিলেন তাই নয় তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তার রাজত্বকালে বার বার ব্রহ্মরাজের আক্রমণ প্রতিহত করেন। রাজা ভাগ্যচন্দ্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁর সময়েই মণিপুরে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপক প্রসার হয়। রাজা ভাগ্যচন্দ্রই মণিপুরের বিখ্যাত রাস-নৃত্যের প্রবর্তক। তিনি নিজেও সঙ্গীত ও নৃত্যের একজন কুশলী ও দক্ষশিল্পী ছিলেন। রাসনৃত্যের প্রচলন সম্পর্কে মণিপুরে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

ভাগ্যচন্দ্রের রাজত্বকালে মণিপুর রাজ্য ব্রহ্মদেশের রাজা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং রাজা ভাগ্যচন্দ্র পরাজিত হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে

আত্মগোপন করে বেড়ান। তিনি যখন আসামের রাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তখন মণিপুর রাজ্য হতে আসাম অধিপতির নিকট এক রাজকীয় সংবাদ এল যে, তিনি পত্র প্রাপ্তিমাত্র যদি ভাগ্যচন্দ্রকে হত্যা অথবা রাজ্য হতে বিতাড়িত না করেন তবে তার রাজ্যের সমূহ বিপদ উপস্থিত হবে। আসামের রাজা তখন মহাবিপদে পড়লেন। একদিকে তার মান্যবর অতিথি অপরদিকে নিরীহ প্রজার মঙ্গল। রাজা গোপনে মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে ভাগ্যচন্দ্রকে ডেকে বললেন যে তার রাজ্যে এক মত্তহস্তী প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করছে। যদি বীরশ্রেষ্ঠ ভাগ্যচন্দ্র এই হস্তীটিকে বিনাশ করেন তবে রাজা বড়ই বাধিত হবেন। ভাগ্যচন্দ্র সবই বুঝতে পারলেন। কিন্তু তিনি নিজের বীরত্বের মর্যাদা ক্ষুন্ন করলেন না। অবশেষে হস্তী শিকারের দিন সমাগত। আর মাত্র একদিন বাকী। ভাগ্যচন্দ্র অহরহ শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করতে আরম্ভ করেন। ঐদিন রাত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্ন দেখলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলছেন—"বৎস, তুমি ভয় পেও না। প্রভাতে হস্তীর নিকট যাবার সময় তুমি আমার কণ্ঠের এই তুলসী-মালা নিয়ে হস্তীর সামনে উপস্থিত হবে। দেখবে তখন সে তোমাকে নতমস্তকে অভিবাদন করে নিজস্কন্ধে তুলে নেবে। সেই হস্তীপৃষ্ঠে চড়ে তুমি মণিপুর রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে তা পুনরুদ্ধার করবে। তারপর কেয়ান পর্বতে যে কাঁঠাল বৃক্ষ আছে তার কাণ্ডের দ্বারা আমার মূর্তি নির্মাণ করে মর্তে আমার পূজার প্রচার করবে।"

পরদিন প্রাতে রাজা ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী হাতীর সামনে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত তুলসীমালা নিয়ে উপস্থিত হলেন। হাতী তাকে দেখবামাত্র শুঁড় নেড়ে অভিবাদন করে নিজস্কন্ধে বসাল। প্রজামণ্ডলী তা দেখে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। রাজা ভাগ্যচন্দ্র হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে মণিপুর রাজ্য উদ্ধার করলেন। শ্রীকৃষ্ণের

মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কেয়ান পর্বতের কাঁঠাল বৃক্ষের কাণ্ড আনিয়ে শিল্পীকে মূর্তি নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু শিল্পী বললেন শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি কিরূপ তা তিনি জানেন না। যদি রাজা ভাগ্যচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ রূপবর্ণনা করেন তা হলে তিনি মূর্তি নির্মাণ করতে পারেন। তখন রাজা ভাগ্যচন্দ্র সুললিত সঙ্গীতে শ্রীকৃষ্ণ রূপবর্ণনা করলে শিল্পী সেই বর্ণিতরূপ কাঠের মধ্যে জীবন্ত করে তুললেন।

মণিপুরে তখন ব্রাহ্মণ জাতি প্রায় বিলুপ্ত। সেজন্য শ্রীকৃষ্ণের পূজা কিভাবে হবে এই সমস্যা উপস্থিত হল। ঐদিন রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে পুনরায় স্বপ্নাদেশ দিলেন যে রাজার কন্যাকে শ্রীরাধা সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের" মূর্তি মণ্ডলীর মধ্যে রেখে রাসনৃত্যের মাধ্যমেই তার পূজা ও প্রচার হবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রত্যহ রাত্রে রাজা ভাগ্যচন্দ্রকে রাসনৃত্য প্রদর্শন করেন এবং পরদিন প্রাতে রাজা তার কন্যাকে তা শিক্ষা দেন। এইরূপে মণিপুরে রাসনৃত্যের সৃষ্টি ও প্রচার হল।

এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে কোন সঠিক প্রমাণ নেই। তবে একথা সত্য যে রাজা ভাগ্যচন্দ্রই রাসনৃত্যের প্রবর্তক এবং তার কন্যা আজীবন কৃষ্ণপ্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করেন। মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত বহু গ্রন্থ আছে। ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা লাইরেম্বী অথবা বিম্ববতীমঞ্জরী নবদ্বীপধামে অনুপ্রভু মন্দিরে তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র আসামের সাত্রা, বাঙলার কীর্তন ও মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যের সমন্বয়ে ও সংমিশ্রণে রাসনৃত্য নবরূপে পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করেন। এবং গুরু স্বরূপানন্দ ও রসানন্দ ঠাকুরের নির্দেশে রাজ্যের নৃত্যগুরুদের সহযোগিতায় রাসনৃত্যের আঙ্গিক, পোশাক, সঙ্গীত ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। ভাগ্যচন্দ্রই মহারাস, বসন্তরাস ও কুঞ্জরাস ও ভঙ্গীপারেঙ প্রবর্তন করেন।

রাজা ভাগ্যচন্দ্রের পরবর্তীকালে তাঁর পৌত্র চন্দ্রকীর্তি সিংও ছিলেন মণিপুরী নৃত্যগীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এককথায় বলা যেতে পারে রাজা ভাগ্যচন্দ্রের সময় হতে চন্দ্রকীর্তি সিং-এর সময় পর্যন্ত এই একশত বৎসর মণিপুরী সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ। চন্দ্রকীর্তি সিং নর্ত্তনরাস-এর প্রবর্তক। মণিপুরী নৃত্যের প্রাচীনতম ধারা 'লাইহারাউবা'র পুনরুজ্জীবনে চন্দ্রকীর্তি সিং-এর অবদান অসামান্য।

'লাইহারাউবা' শব্দের অর্থ দেবগণের উৎসব। লাই অর্থে দেবতা ও হারাউবা অর্থে আনন্দনৃত্য বুঝায়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তনের আগে মণিপুরে শৈবধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনার প্রচলন ছিল। লাই শব্দটি লিঙ্গ পূজার প্রতীক হিসাবেই ব্যবহার হয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও মণিপুরী সমাজে প্রাকবৈষ্ণব যুগের দেবদেবীদের সমাদর ও আদিম ধর্মানুষ্ঠানের প্রচলন ব্যহত হয়নি। হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে মৈতৈ দেবদেবীরাও সমান আসন লাভ করেছেন। বিভিন্ন পূজাপদ্ধতি ও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে তান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির সাদৃশ্যও অনেক সময় চোখে পড়ে। লাইহারাউবা মৈতৈ নৃত্যধারার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্টপূর্ণ ও সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। লাইহারাউবা শিবপার্বতীর মহিমা প্রচারের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বন করে অনুষ্ঠিত হয়। মণিপুরী অধিবাসীদের বিশ্বাস যে হরপার্বতীর পূজায় ভক্তিভরে নৃত্য করতে পারলে দেবতাগণ তুষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে লাইহারাউবার বিন্যাস নৃত্যনাট্যের মত। 'মৈরাঙ লাইহারাউবা' ও 'উমঙ লাইহারাউবা' এই দুই শ্রেণীতে খাম্বাথৈবী, নঙপক্নিঙথু-পানথৈবী, থানজিঙ লাইরেম্বী প্রভৃতি কাহিনী অবলম্বনে লাইহারাউবা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়। লাইহারাউবা নৃত্যে তাণ্ডব ও লাস্য এই উভয় ধারাই প্রযুক্ত হয়। ইহা মূলতঃ শৈব নৃত্য হলেও পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই নৃত্যপদ্ধতিতে রাসনৃত্যের অন্যতম উপাদান ভঙ্গীপারেঙ-এর

প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেক বৎসর চৈত্র-বৈশাখমাসে পনেরদিন ব্যাপী এক বিরাট লাইহারাউবা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মৈরাঙ পূর্বার কাহিনী অবলম্বনে একক, দ্বৈত ও সমবেত—এই তিন পর্যায়ে এই নৃত্যনাট্যের রূপবন্ধ ও নৃত্যছক রচনা করা হয়।

লাইহারাউবা উৎসবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে মণিপুরের দেবদাস ও দেবদাসী সম্প্রদায়ের ভূমিকা জানা বিশেষ প্রয়োজন। মৈতৈ ভাষায় এদের মৈবা ও মৈবী বলা হয়। এরাও শিব-পার্বতীর আরাধনায় উৎসর্গীকৃত কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের দেবদাসী প্রথার সঙ্গে একমাত্র প্রভেদ এই যে মণিপুরে পুরুষেরাও এই জীবন গ্রহণ করে দেবদাস বা মৈবা রূপে গণ্য হতে পারেন। বর্তমানেও মণিপুর প্রাসাদে প্রায় পঞ্চাশজন দেবদাসী আছে। এরা সাধারণতঃ শাদা পোশাক পরে থাকেন। দেবদাসীর লক্ষণ সূচিত হলে তাদের এই সম্প্রদাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অনেক সময় দেবার্চনায় নৃত্যকালে এদের 'ভর' হয়। তখন তাদের মৈবী লাইতোঙবা বলা হয় এবং তারা বাঁহাতে ঘণ্টাধ্বনি করতে করতে দৈবকথা বর্ণনা করেন।

মণিপুরী পুরাণ অনুযায়ী পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে জানা যায় নয় জন 'লাইবুঙথু' বা দেবতা এবং সাতজন 'লাইনুরা' বা দেবী পৃথিবী সৃষ্টি করেন। পৃথিবী তখন জলমগ্ন ছিল, এবং এই সাতজন দেবী জলের উপর নৃত্য করছিলেন। নয়জন দেবতা স্বর্গ হতে মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতে থাকেন এবং দেবীদের নৃত্যছন্দে ঐ মৃত্তিকা থেকে স্থলভাগের উৎপত্তি হয়।

লাইহারাউবা উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানটিকে 'লাইএকাউবা' বলে। গ্রামের প্রধান অধিবাসী ও অন্যান্যদের সাথে মৈবা ও মৈবীগণ হ্রদ বা নদীতীরে গিয়ে জলে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে দৈবীশক্তি প্রার্থনা করে। তারপর শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে জলে ঝাঁপ দেয় এবং ভরগ্রস্ত অবস্থায় নৃত্য করে। এই দ্বিতীয় অংশকে

'লাইথেম্বা' বলা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় 'লাইকাবা' অর্থাৎ দেবদেবীদের আবির্ভাব অংশ। এইবার শোভাযাত্রা গ্রামের দিকে ফিরে আসে। দুটি মাটির কলসীতে করে দুজন দৈবশক্তির প্রতীক নিয়ে আসে। এইবার মৈবীরা নৃত্যছন্দে পূর্বোক্ত নয়জন দেবতা ও সাতজন দেবীকে জাগ্রত করার অভিনয় করে। এই অংশের নাম 'লাইহুন্বা'। কথিত আছে এই সময় চারিদিক থেকে মারজিঙ, থানজিঙ, কোউব্রু ও ওয়াঙবারেন এই চারজন দেবতা অনুষ্ঠান দর্শন ও রক্ষণ করেন।

এর পর দুজন দেরদাসী গ্রামের সামনে ঢিমালয়ে দেববন্দনা নৃত্য করে। একে বলা হয় 'জগোই ওক্পা।' এই নৃত্যে মুষ্টি, হংসাস্য ও অর্দ্ধচন্দ্র মুদ্রাসহ বিভিন্ন করণ ও অঙ্গহার প্রযুক্ত হয়। এর পরে মৈবীরা 'লাইপৌ' বা দেবতার জন্ম এই অংশ অভিনয় করে। বিভিন্ন মুদ্রার সহযোগে এই অংশে সৃষ্টি রহস্য রূপায়িত হয়। স্বর্গীয় নবজাতকের আবির্ভাবে এই অংশের পরিসমাপ্তি।

এর পরের অংশ গৃহনির্মান। দুজন দেবদাসী বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিনয়ের সাহায্যে গৃহনির্মাণের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত রূপায়িত করে। এই গৃহ দেবদেবীদের উৎসর্গ করা হয়। এই অংশে পতাক, সূচী, অঞ্জলি, মুষ্টি, কর্ত্তরী ও অর্দ্ধচন্দ্র প্রভৃতি সংযুক্ত ও অসংযুক্ত হস্তের প্রয়োগ হয়। এরপর শিবের অবতার 'নঙপকনিঙথু' ঐ গৃহ থেকে বেরিয়ে পার্বতীর অংশ 'পানথৈবীর' সাথে মিলিত হন। এই অংশ সঙ্গীত সহযোগে শৃঙ্গাররসাত্মক অভিনয়ে রূপায়িত হয়। এর পরের অংশে তূলা চাষ ও বস্ত্রবয়ণ পদ্ধতি অপূর্বনৈপুন্যের সাথে প্রদর্শিত হয়। এই বস্ত্র দেবতাদের উৎসর্গ করা হয়। এই খানেই শোভাযাত্রার বিরতি ও লাইপৌ অভিনয়-এর সমাপ্তি।

এর পরবর্তী অংশে মৎসশিকার পদ্ধতি রূপায়িত হয়। এই অনুষ্ঠান কয়েকদিন ধরে চলে। অবশেষে সমাপ্তিতে দেবদেবীরা কল্পিত নৌকারোহণ করে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিভিন্ন আঞ্চলিক ধারা অনুসরন করে লাইহারাউবা নৃত্য উৎসবের তিনটি প্রধান রূপ প্রচলিত। এই তিনটি ধারার নাম কঙ্গেলি, মৈরাঙ ও চাকপা। শিব ও পার্বতী প্রত্যেক ধারাতেই বিভিন্ন নামে আবির্ভূত হন। বিভিন্ন ধারায় কিছু কিছু আঞ্চলিক প্রথাপুষ্ট ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠানের সংযোগ দেখা যায়।

মণিপুরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় লোকগাথা খাম্বাথৈবীর কাহিনী অবলম্বনে লাইহারাউবা নৃত্যের অনুষ্ঠান সর্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত। এই খাম্বাথৈবীর উপাখ্যানকে মণিপুরের জাতীয় উপাখ্যান বলা হয়। কথিত আছে রাজা লয়াম্বার রাজত্বকালে (১১২৭-১১৫৪ খৃঃ) খাম্বা ও থৈবী জীবিত ছিলেন। এই কাহিনী মণিপুরের বিখ্যাত মহাকাব্য মৈরাং পূর্বাতে লিপিবদ্ধ আছে। মণিপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি স্বর্গত হিজুম আঙাঙ্‌হাল সিং খাম্বাথৈবীর কাহিনী অবলম্বনে উনচল্লিশ হাজার ছত্রসমন্বিত বৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলে লোককবিদের দ্বারা এই কাহিনীর বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়।

মণিপুর রাজ্যে খাম্বা ও থৈবীকে শিবপার্বতীর অংশরূপে কল্পনা করা হয়। খাম্বা ছিলেন মৈরাঙ গ্রামের এক দরিদ্র ও সাহসী যুবক। থৈবী মৈরাঙ বংশের রাজকন্যা। মৈরাঙ গ্রাম ইম্ফল শহর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজকন্যা থৈবী একদা নির্জন লোগতাক্ হ্রদে সহচরীদের সঙ্গে মৎসশিকারে যান্। রাজার আদেশে ঐ সময়ে ঐ স্থানে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কথিত আছে খাম্বা প্রভু থানজিঙ কতৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেই সময়ে লোগতাক্ হ্রদে গমন করেন। রাজকন্যা থৈবী এই অনিন্দ্যসুন্দর তরুণ যুবাকে দেখে মুগ্ধ হলেন। খাম্বা ও থৈবী প্রথম দর্শনেই পরস্পরের প্রতি গভীর প্রণয়াসক্ত হলেন। উভয়ের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য স্বভাবতই তাদের মিলনের পথে প্রধান অন্তরায় হল। অবশেষে বহু বিপদ ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে হল তাঁদের বহু আকাঙ্ক্ষিত মিলন।

থৈবীকে লাভ করবার জন্য রাজরোষে খাম্বার বহুবার জীবন সংশয় হয় এবং থৈবীকেও কিছুকাল ক্রীতদাসীর জীবন স্বীকার করতে হয়। এই সকল ঘটনায় খাম্বাকে অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করতে হয় এবং অবশেষে রাজা তাদের বিবাহে সম্মত হন। খাম্বা ও থৈবীর এতদিনের স্বপ্ন সার্থক। কিন্তু মানুষের মন বড় বিচিত্র। বিবাহের কিছুকাল পরে থৈবীর প্রেমে খাম্বার সংশয় দেখা দেয়। মণিপুর রাজ্যে স্ত্রীলোকের সতীত্ব পরীক্ষা করবার একটি প্রাচীন প্রথা প্রচলিত আছে। প্রণয়ী পরস্ত্রীর ঘরের মধ্যে তার বর্শার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দেয়। তখন যদি ঐ স্ত্রীলোক বর্শাটি টেনে নিয়ে ঘরের মধ্যে রেখে দেয় তাহলে বুঝতে হবে যে প্রণয়ীর অসৎ প্ররোচনায় সম্মত হতে তার আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীলোকের তাতে আপত্তি থাকে তাহলে সে বর্শাটি বাইরে নিক্ষেপ করে প্রস্তাব প্রত্যাখান করবে।

খাম্বা একদিন থৈবীকে বললেন যে তিনি একটি বিশেষ কাজে গ্রামান্তরে যাবেন এবং পরদিন প্রাতে গৃহে প্রত্যাগমন করবেন। রাত্রে খাম্বা থৈবীর ঘরে তাকে পরীক্ষা করবার জন্য নিজের বর্শার অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়ে দিলেন। থৈবী তা টেনে নিয়ে সজোরে বাইরে নিক্ষেপ করে বললেন, "কোন শয়তান আমার মত সতী নারীকে অসম্মান করতে সাহস করে"। সেই বর্শার আঘাতে বাহিরে খাম্বার দেহ ভূলুণ্ঠিত হল। খাম্বার আর্তস্বর শুনে থৈবী বাইরে এসে শোকান্মত্ত হয়ে ঐ বর্শা নিজবক্ষে বিদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করলেন।

সাধারণত এই কাহিনীর মূল অনুষ্ঠান মৈরাঙ গ্রামে এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লাইহারাউবা নৃত্য উৎসবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীনিসিম এজেকিল-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "The Lai Harauba (Khamba-Thaibi dance) is a dance of forces fully under lyrical control. It demonstrates convincingly how the stately and the
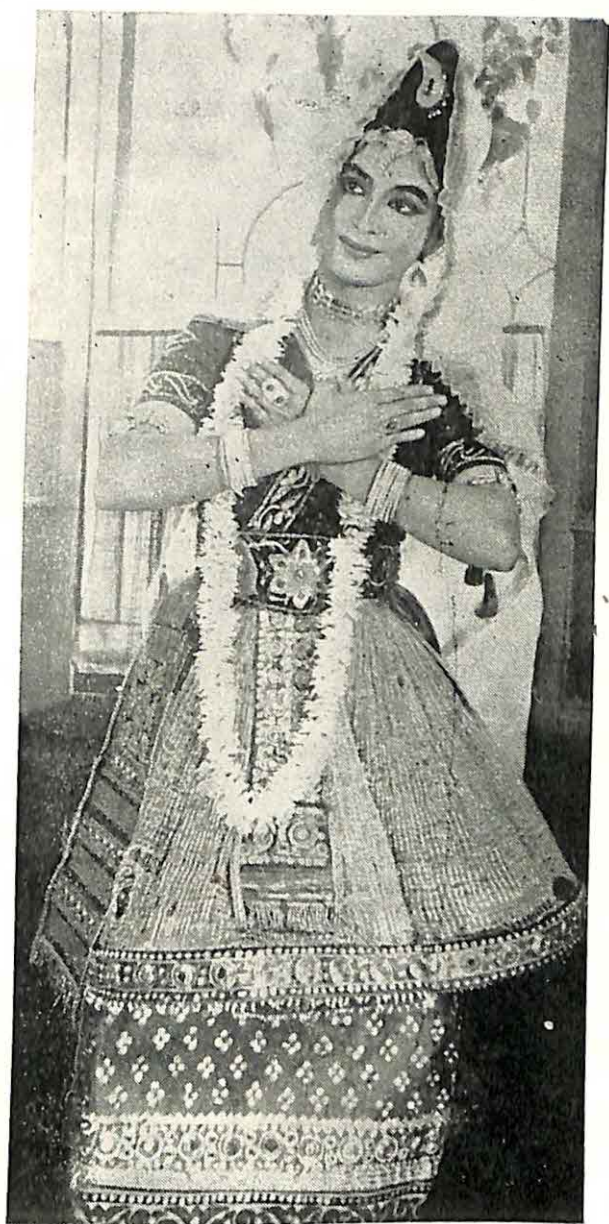
মণিপুরী

সারি

dignified can be controlled with the vigour to produce a human poetic blending of dance impulses which is characteristic of Manipur. It comes closest to the classic manner. The shadow of contemplation falls on it and moves as slowly as the shades of the evening. Yet, nothing is lost in the massive rhythms of sound and colour. Shaking the spectator to the core by an inexhaustible primal appeal. The sweep and surge of emotion is powerful, but miraculously a detached awareness is brought to birth. It is conducive to a subtle pleasure, which is quite astonishingly civilised. A refined element pervades the movements. On this level folk dancing is transformed into art"

যুগযুগান্তরের সংস্কৃতি সমন্বয়ে মণিপুরের লোকচিত্তকে অধিকার করে আছেন অনার্য্যদেবতা কৈলাসপতি শিব ও গোপীবল্লভ বৃন্দাবন বিহারী শ্রীকৃষ্ণ। নৃত্যে, গীতে বিভিন্ন ছন্দে মৈতৈ ও বিষ্ণুপ্রিয় সাধারণ মানুষ বিভিন্ন উৎসবে এই দুই দেবতার অর্ঘ রচনা করেছে। মণিপুরী অধিবাসীদের ধর্মপ্রাণে এই দুই দেবতার আসনই পাশাপাশি পাতা। বৈষ্ণব ও শৈবের ভেদাভেদ ভক্তপ্রাণের মিলনসঙ্গমে বিলীন হয়েছে, নৃত্যছন্দে মূর্ত্ত হয়েছে প্রেম ও ধর্ম।

শিব পার্বতীর সম্মানে ওগ্রিহাঙ্গেল ও উষাদেবীর সম্মানে থাবল-চোংবী নৃত্যও অনুষ্ঠিত হয়। বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রে থাবলচোংবী উৎসব। এই অনুষ্ঠান মূলত নাট্যধর্মী। থাবলচোংবী অনুষ্ঠানে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য এই চারপ্রকার অভিনয়ই প্রযুক্ত হয়। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মণিপুরে এই নাট্য প্রচলিত বলে একে মণিপুরীয় থাবলচোংবী নাট্য বলা হয়। এই অনুষ্ঠানের নৃত্যপদ্ধতিতে উষাকালের আলোকরশ্মি বিকাশের অনুকরণে নৃত্যছক

রচনা করা হয়েছে। এই নাট্যে নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত আঙ্গিকের প্রয়োগ আছে। কিন্তু ইহা নাট্যবেদ সৃষ্টির আগে থেকে প্রচলিত বলে পূর্বরঙ্গ প্রভৃতি নাট্যঅঙ্গের প্রয়োগ নেই। এছাড়া রথযাত্রার উৎসবে খুবাক্ইশৈ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

শাস্ত্রমতে তালরাস, দণ্ডরাস ও মণ্ডলরাস রাসনৃত্যের এই তিনটি প্রধান পর্যায়ই প্রাচীনকাল থেকে মণিপুরে প্রচলিত। বৈষ্ণবধর্মের মণিপুরে অভ্যুদয়ের আগেই শৈবধর্মের যুগে লাইহারাউবা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের বিভিন্ন নৃত্যাংশে রাসপদ্ধতিই অন্যরূপে অনুসৃত হয়েছে। পরে বৈষ্ণবধর্মের প্রসারে 'রাসলীলা' নৃত্যকল্পনা ভক্তি ও রূপময়তায় সুষমান্বিত হয়ে সঙ্গীতে ও ভঙ্গীতে বৃন্দাবনের সেই চিরকিশোরের চরণে নিবেদিত হয়েছে।

হরিবংশের বর্ণনায় আছে ঃ

"চক্রুহ´সন্ত্যশ্চ তথৈব রাসম্
তদ্দেশ-ভাষাকৃতি বেশযুক্তাঃ।
সহস্ততালং ললিতং সলিলং॥
বরাঙ্গনা মঙ্গল সম্ভৃতাঙ্গয়ঃ।"

রাজা ভাগ্যচন্দ্র 'গোবিন্দ সঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থে নাট্যকে রূপক ও রাসক এই দুই পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। রূপক অর্থে প্রাচীন নাট্য ও রাসক অর্থে নৃত্যনাট্য। এই রাসক অধ্যায়ে রাসনৃত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থে বর্ণিত মহারাসক, মঞ্জুরাসক, নিত্যরাসক, নির্বেশরাসক, গোপরাসক—এই পাঁচটি রাসলীলাই বর্তমানে মণিপুরে মহারাস, বসন্তরাস, নিত্যরাস, কুঞ্জরাস, গোপরাস, (গোষ্ঠ) ও উলুখল রাসরূপে প্রচলিত। এছাড়া বর্তমানে মণিপুরে দিবারাস বলে প্রচলিত আর একটি রাসনৃত্য সাধারণতঃ মধ্যাহ্ন কালে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

রাধাকৃষ্ণ ভক্তিমার্গতত্ত্বই মণিপুরে পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব

ধর্মের প্রসারে জনপ্রিয় হয়েছে। সেজন্য জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীকে আশ্রয় করে রাসনৃত্য রূপায়িত হয়েছে। শৃঙ্গার রসসম্ভূত বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ এই দুই পর্যায়ে নায়িকাভেদ অনুযায়ী অভিনয় নির্দেশিত হয়।

মহারাস কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। ভাগবত পুরাণের রাসপঞ্চাধ্যায় অবলম্বনে কৃষ্ণ অভিসার, রাধা-গোপী অভিসার, মণ্ডল সাজন, গোপীগনের রাগ আলাপ, অচ্ছুবা ভঙ্গীপারেঙ, কৃষ্ণনর্ত্তন, রাধানর্ত্তন, গোপিনীদের নর্ত্তন, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, প্রত্যাবর্তন, পুষ্পাঞ্জলি (প্রার্থনা ও আরতি), গৃহগমন এই কয়টি পর্যায়ে মহারাসের উৎসব হয়। অচ্ছুবা ভঙ্গিপারেঙ ও বৃন্দাবন ভঙ্গিপারেঙ এর মূল উপাদান।

বসন্তরাস চৈত্র পূর্ণিমাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে হোলীখেলা, কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর নৃত্য, রাধার ঈর্ষা, ক্রোধ ও প্রস্থান, কৃষ্ণ কতৃক রাধার অনুসন্ধান, ললিতা ও বিশাখাসহ কৃষ্ণের রাধার কুঞ্জে গমন, মানভঞ্জন, খুড়ুম্বা ভঙ্গীপারেঙ, গোপিনীগণের নৃত্য, পুষ্পাঞ্জলি, গৃহগমন অভিনীত হয়। অচ্ছুবা ভঙ্গিপারেঙ ও খুড়ুম্বা ভঙ্গীপারেঙ এর মূল উপাদান।

কুঞ্জরাস আশ্বিন মাসের অষ্টম দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে রাধা, কৃষ্ণ ও সখীদের অভিসার ও কুঞ্জে আগমন অংশ অভিনীত হয়।

গোপরাস বা গোষ্ঠ কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে চৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা গীত হবার পর কৃষ্ণের বাল্যলীলা রূপায়িত হয়। উলুখল রাসও কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণের বাল্যলীলাই রূপায়িত হয়।

নিত্যরাস যে কোন উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। অভিসার ও রাস অংশই অভিনীত হয়।

রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত রাসলীলা প্রসঙ্গ নীচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। এর থেকে রাসনৃত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর ছবি পাওয়া যাবে।

"(জয়) বরজ কামিনা নবীন বালা
চলিল রঙ্গিয়া চন্দ্রকি মালা॥
কুণ্ডল লম্বিত লম্বিত হার
চারু দলিত বেনী মনোহর॥
বিকশিত কুসুম বনমায়ে
আমার বন্ধু গুণ গায়ে গায়ে॥
কমকি কমকি নয়ন চায়
গহন কানন গমন তায়॥
কুঞ্জর সদনে পছিয়া রঙ্গে
পাইলু শ্রীরাধাগোবিন্দ সঙ্গে॥
সখীর অনুগা ললিন মানস
নরপতি ভাগ্যচন্দ্র এই আশ॥ * ॥

আর একটি বর্ণনায়ঃ

"মৃদঙ্গ মুরুজ বাজে তাতাথৈ তাথৈয়া বাজে॥
তাথৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গ মধুর বাজে॥
সবহুঁ যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আরে॥
রাসমণ্ডলী মাঝে গোপাঙ্গনাগণ পদচালে
ভঙ্গি করি আরে।
কিবা সেই ভুরু যে করি চালন মাধুরী।
কিবা সেই অঙ্গভঙ্গি গমন ভঙ্গিমা।
কিবা সেই নেত্রগতি বিজুরী উপমা॥
তাথৈয়া থৈয়া মৃদঙ্গ মধুর বাজে
সবহুঁ যন্ত্র মেলি বাজে করতালি আরে॥"

মণিপুরী নৃত্যে নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত নর্তনকলার এই ত্রিবিধ গুণই বর্তমান। তবে মণিপুরী নৃত্যে নৃত্য অংশই প্রধান। ভাববিভাবের দ্যোতনায় তাণ্ডব ও লাস্য এই দুইকেই সমভাবে প্রকাশের ধারা মণিপুরী নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিকাভিনয় অংশই প্রধান। এই অপরূপ নৃত্যছন্দে তনুদেহ লীলায়িত ব্যঞ্জনায়

দেহভঙ্গির সঙ্গীতে সৌন্দর্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠে। এই সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা অন্য কোন নৃত্যধারায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মদেশীয়, জাপানী ও বলিদ্বীপের প্রচলিত নৃত্যছকের সঙ্গে মণিপুরীদের নৃত্য-পদ্ধতির রূপময়তার কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অবশ্য ব্রহ্মদেশের সাথে মণিপুরের সংযোগের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। অনেক সময় মণিপুরী নৃত্যের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি দেখে আমাদের মনে হয় এই নৃত্য আয়ত্ত করা সহজসাধ্য। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। মণিপুরী নৃত্যের এই সকল জ্যামিতিক বিন্যাস ও দোলন দেহভঙ্গিতে সঞ্চালিত করা অত্যন্ত কঠিন। তার জন্য প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন। দেহরেখার ব্যঞ্জনা, ভাব বিভাবের দ্যোতনা ও তালের সমন্বয়ে, ভক্তিরস মাধুর্যে মণিপুরী নৃত্যছন্দ এমন একটি দুর্লভ সংযম ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত যে তা দর্শক চিত্তে পরিশ্রুত আনন্দের সৃষ্টি করে।

মনিপুরী নৃত্যপদ্ধতিতে এই যে ভঙ্গি ও ভঙ্গিপারেঙ এর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজনীয়। ভঙ্গী শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ভঙ্গ থেকে এবং ভঙ্গিপারেঙ শব্দের অর্থ হচ্ছে ভঙ্গাবলী অর্থাৎ বিভিন্ন ভঙ্গের সমষ্টি।

(১) "আভঙ্গ সমভঙ্গ-ত্রিভঙ্গমিতি ত্রিবিধং ভবতি।"

(২) "সর্ব্বেষাং দেবদেবীনাং ভঙ্গমানমিহোচ্যতে।
আভঙ্গ সমভঙ্গশ্চ অতিভঙ্গস্ত্রিধাজগৎ॥"

শাস্ত্র অনুযায়ী সমভঙ্গ, আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ এই চারিটি ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

সমভঙ্গ ঃ এই ভঙ্গি ঋজু ও স্থিতিশীল। মেরুদণ্ড সম্পূর্ণ খাড়া এবং আবেদন সম্মুখবর্তিতায়। এই ভঙ্গীতে চাঞ্চল্য নেই এবং আত্মিক বা দৈহিক শক্তির পুঞ্জীভূত রূপ প্রকাশ করে সেজন্য এই ভঙ্গীতে ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনা গৌণ।

আভঙ্গ ঃ আন্তর প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশের মুহূর্তে দেহের যে চাঞ্চল্য তা এই ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়। এই ভঙ্গীতে মেরুদণ্ড নমনীয় ও সক্রিয় এবং এই ক্রিয়ার প্রভাব অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চালিত। এই ভঙ্গী দেহকে বিশেষ সৌষ্ঠবযুক্ত করে।

ত্রিভঙ্গ ঃ এই ভঙ্গীতে লাস্যভাব মনোহররূপে প্রকাশিত হয়। মেরুদণ্ডের গতি ক্ষিপ্র এবং এই ক্ষিপ্রতা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও সঞ্চালিত হয়। এই ভঙ্গীতে উচ্ছসিত প্রাণশক্তির ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধারী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী লক্ষ্যনীয়।

অতিভঙ্গ ঃ এই ভঙ্গীতে তাণ্ডবভাব প্রকাশিত হয়। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে উদ্দাম গতির সংঘাত এই ভঙ্গীতে রূপায়িত হয়। ত্রিভঙ্গ অবস্থায় দেহের সামনের দিকে পিছনের জোর পড়লে অতিভঙ্গ ভঙ্গী হয়।

উপরোক্ত চার প্রকার ভঙ্গীর সমন্বয়ে ও মিশ্রনে ভঙ্গীপারেঙ গঠিত হয়েছে। পাঁচটি ভঙ্গীপারেঙ মণিপুরী নৃত্যে প্রযুক্ত হয়। অচ্ছুবা ভঙ্গীপারেঙ। বৃন্দাবন ভঙ্গী ও খুড়ুম্বা ভঙ্গী লাস্যভাব প্রকাশে ব্যবহার হয় ও গোষ্ঠ ভঙ্গী পারেঙ তাণ্ডব ভাব প্রকাশে প্রযুক্ত হয়। 'গোবিন্দ সঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থানুযায়ী লাস্যকে সীমিতাঙ্গ ও স্ফুরিতাঙ্গ এই দুই পর্যায়ে ও তাণ্ডবকে গুণ্ঠন,চলন ও প্রসরণ এই তিন পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। অচ্ছুবা ভঙ্গী পারেঙ ও খুড়ুম্বা ভঙ্গীপারেঙ প্রধানতঃ সাতমাত্রা যুক্ত তাল রাজমেল এর সাহায্যে ও বৃন্দাবন পারেঙ আটমাত্রা যুক্ত তিনতাল অচ্ছুবার সাহায্যে গঠিত হয়েছে। এগুলি লাস্যভাবের সীমিতাঙ্গ রূপ প্রকাশ করে এবং বিলম্বিত লয়ে চলে। সমাপ্তিতে চারমাত্রা যুক্ত তাঞ্চেপ (চতুরস্রজাতি একতাল) অথবা ছয় মাত্রা যুক্ত মেনকূপ (ত্রস্রজাতি একতাল) প্রযুক্ত হয়।

তাণ্ডব ভাব প্রকাশক গোষ্ঠ ভঙ্গীপারেঙ সাত মাত্রা যুক্ত

তাল রাজমেল এর সাহায্যে ও গোষ্ঠ বৃন্দাবনপারেঙ আট মাত্রা যুক্ত তাল তিনতাল অচুবার (তৃতীয়ক) সাহায্যে গঠিত। এরও সমাপ্তিতে তাঞ্চেপ ও মেনকূপ প্রযুক্ত হয়। এই দুটি ভঙ্গী নৃত্যবন্ধ মধ্যলয়ে চলে এবং তাণ্ডব ভাবের গুণ্ঠন রূপ প্রকাশ করে।

মণিপুরী নৃত্য সংগঠনে প্রাচীন ও প্রধানতম অঙ্গরূপে 'চালি'কে গণ্য করা হয়। উপরোক্ত পাঁচটি ভঙ্গীপারেঙ এর গ্রন্থনায় এটি মূল উপাদান।

"কোমলং সবিলাসং চ মধুরং তাললাস্যযুক্তঃ।
নাতিদ্রুত নাতিমন্দ ত্রস্রতা প্রচুরং তথা॥
পাদোরূকটি বাহুনাং যৌগপদ্যেন চালনম্।
চালিঃ সা শৈব্র সাংমুখ্যপ্রায়া চালিবরোভবেৎ॥"

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত চারি নৃত্যপদ্ধতিই মৈতৈ ভাষায় মণিপুরে চালিরূপে প্রচলিত।

"এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া উর্বো কটয়াস্তথৈব চ।
সমান করণাচেষ্টা সা চারীত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ পদ, জঙ্ঘা, উরু ও কটিদেশ—ইহাদিগকে এক সরলরেখায় রাখিবার প্রচেষ্টাকে চারী বলা যায়। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে গতিই চারী, আর স্থিতি অর্থে স্থান, তাই চারী স্থান দ্বারা ব্যাপ্ত।

মণিপুরী নৃত্যগুরুরা এই নৃত্য পরিকল্পনায় চালিকে প্রথম ও প্রধান অঙ্গ বলে মনে করেন। নৃত্যকল্পনাটিকে সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে মূর্ত করে তোলার কাজে চালির মাধ্যমে বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস রচনা করা হয়।

পায়ের গোড়ালী জোড়া থাকবে। পায়ের পাতা এক সমকোনে পরস্পরের থেকে আলাদা করে দাঁড়াতে হবে। এইরূপ দণ্ডায়মান অবস্থায় মেরুদণ্ড, গ্রীবা, মস্তক এক সরলরেখায় থাকবে। দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। এই অবস্থায় পায়ের পাতা ভূমিতে সমকোণে রেখে দাঁড়ালে দেহভঙ্গীতে নৃত্যের ছন্দ স্বতস্ফূর্ত ভাবেই প্রকাশিত

হয়; এক্ষেত্রে নাট্যশাস্ত্রোক্ত সমশির ও সমদৃষ্টি প্রযুক্ত হয়েছে। উভয় হস্তের করতল বক্ষের সম্মুখে বাহিরের দিকে রাখতে হবে। অঙ্গুলী সমূহ পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় উপরের দিকে প্রসারিত থাকবে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ সমকোনে ভেঙ্গে থাকবে। স্কন্ধ হইতে করতলের দূরত্ব ও দুই করতলের মধ্যের ব্যবধান সমান হবে। এইভাবে সমগ্র ভঙ্গীস্থাপনায় একটি সমবাহু চতুর্ভূজ গঠিত হবে। এই অবস্থান থেকে চালি নৃত্য সূচিত হয়। চালি নৃত্য করবার সময় মণ্ডলীর চতুর্দিকে ঘুরিয়া নৃত্য করতে হয় এবং শরীরের বামপার্শ্ব মণ্ডলীর দিকে থাকে। এই নৃত্যের চলন ডান পা দিয়া আরম্ভ হয়।

চালি নৃত্যে প্রধানতঃ চারিটি মুদ্রার ব্যবহার হয়। সূচনায় পতাকা হস্ত ও নৃত্যাংশে অর্দ্ধচন্দ্র, হংসাস্য ও পদ্মকোষ হস্ত প্রযুক্ত হয়। নৃত্যগতিতে কুট্টন ও চাষগতির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ভ্রমরী গতি বিশেষ করে অঙ্গভ্রমরী চালি নৃত্যের প্রধান উপাদান।

"বিতাস্তন্তরিতৌ পাদৌ কৃত্বাঙ্গভ্রমণং তথা।
তিষ্ঠেদ যদি ভবেদঙ্গভ্রমরী ভরতোদিতা॥"

অর্থাৎ দুই পায়ের ব্যবধান এক বিঘৎ অন্তরে রেখে সর্বাঙ্গ ভ্রমিত করে স্থিতি আশ্রয় করলে তাকে অঙ্গভ্রমরী বলে।

ঋগ্বেদে আদিত্যস্তুতিতে বর্ণিত আদিত্য-পরিক্রমণের ধারা অনুসরণ করে মণিপুরী নৃত্যে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে পরিক্রমণ করা হয়। চালি নৃত্যপদ্ধতি ও পাঁচটি ভঙ্গীপারেঙ সমস্ত মণিপুরী নৃত্যের মূল উপাদান। মণিপুরী নৃত্যগুরুরা বিভিন্ন তাল ও লয় আশ্রয় করে নিজ নিজ দক্ষতা অনুযায়ী নৃত্যপরিকল্পনা করতে পারেন কিন্তু এই চালি বা মূল ভঙ্গীগুলি পরিবর্তন করতে পারেন না।

সকল মণিপুরী নৃত্যধারাই কোন না কোন ধর্ম সংক্রান্ত উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মণিপুরীরা নৃত্যকে ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গ বলে মনে করায় নৃত্য অনুষ্ঠানকালে হিন্দু শাস্ত্রে বর্ণিত বিধিনিষেধ পালন

করে। মণিপুরী নৃত্য প্রধানত ভক্তিরসকে আশ্রয় করে রচিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রসারের সাথে সাথে মণিপুরে সংকীর্তন ও চোলম্ এই দুই ভক্তিরসাত্মক নৃত্যধারা প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়। সংকীর্তন বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ রূপে প্রচলিত। প্রকৃত পক্ষে করতালচোলম্ ও পুঙচোলম্ নৃত্যধারাতেই মণিপুরী নৃত্যকলার চরম উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করা যায়। চোলম্ শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ 'চলনম্' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত 'গোবিন্দ সঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থ অনুযায়ী তাণ্ডব এর তিনটি প্রধান পর্যায় গুণ্ঠনম্, চলনম্ ও প্রসর্ণম্। করতালচোলম্ এ করতাল সহযোগে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় এবং পুঙচোলম্ এ মৃদঙ্গ সহযোগে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্যশিল্পীরাই মৃদঙ্গ ও করতাল বাদ্যরত অবস্থায় নৃত্য করেন। পুঙচোলম্ ও করতালচোলম্ এই দুই নৃত্যধারাতেই অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের শাস্ত্রীয় প্রয়োগ পদ্ধতি কঠোর ভাবে অনুসরণ করা হয়। বিভিন্ন স্থান, গতি, মণ্ডল, শিরকর্ম, গ্রীবা, স্কন্ধ, বাহু, কটি, জানু ও পাদকর্মেও শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়। স্থানককে মৈতৈ ভাষায় ফিরেপ. বলা হয়। থঙখঙগাওয়াঙবা, থঙখঙআনেম্বা, করেঞ্চেপতা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রয়োগ করতালচোলম্ ও পুঙচোলম্ এ দেখা যায়।

মৈতৈ ভাষায় শিরকর্মকে কোকলেই বা কোখাই বলে। নিকপা, হৈবা, লৈবা, খটপা প্রভৃতি শিরকর্ম প্রচলিত। মৈতৈ ভাষায় গ্রীবাকর্ম কে নাগক বলে। আখাকপা, আহুনবা, চটপা, আকৈবা, তমিন্নবা, হানবা, থাবা, চেপথা, আথেকপা, সেপচৎনবা প্রভৃতি গ্রীবাকর্ম প্রচলিত। হিকথবা, ইংখটপা, খাপ্পা প্রভৃতি স্কন্ধ বা লেইগুম প্রচলিত। হৈজিঙবা, নম্বা, থাপা, হৈদকপা, হৈবা প্রভৃতি বাহু বা খুথাই প্রচলিত। আরঙবা, আউপ্পা, তবা, চেপ্পা, হুনবা, লৈবা প্রভৃতি বক্ষ বা থৈনমৈতেই প্রচলিত। নম্বা, তিঙবা ও থেকপা এই তিন প্রকার কটি বা খোয়াঙ প্রচলিত। নম্বা, থাঙগৎপা,

খঙগৎনা, লৈবা, নামলেই প্রভৃতি উরুকর্ম বা কৈ প্রচলিত। বকলৈবা ও খুদাক কুনবা এই দুই প্রকার জানু বা খুক্কি প্রচলিত। খঙপক নেৎপা, খঙচেপ, খঙদনকাঙবা, খুনিঙ, প্রভৃতি পাদকর্ম বা খঙ প্রচলিত।

উপরোক্ত তালিকা থেকেই সংকীর্তন ও চোলম নৃত্যধারার আঙ্গিকের জটিলতা ও উৎকর্ষ অনুমান করা যায়। এই অনুষ্ঠানে এক একটি নৃত্যসম্প্রদায়ে অনেক সময় পঞ্চাশজন শিল্পী একত্রে এক-একটি পালা রূপদান করে। সঙ্গীতাংশে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস,গোবিন্দদাস প্রভৃতির সুললিত পদাবলী এবং সংস্কৃত ও মৈতৈ ভাষায় বিভিন্ন ভক্তিরসাত্মক গীতি পরিবেশিত হয়। করতাল চোলম্ ও পুঙচোলম্ এই দুই নৃত্যপদ্ধতিই মূলতঃ তাললয়াশ্রয়। তিন-তাল, মেল (বেদীঘাট, লম্বীঘাট, সেতু, কটা) ও মেনকূপ আশ্রয় করে বিভিন্ন তালগুচ্ছের সমন্বয়ে অপরূপ ছন্দ ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা হয়।

শিল্পীরা অনুষ্ঠানের সময় ধুতি, পাগড়ি, উপবীত ও উত্তরীয় পরিধান করেন। কপালে উর্ধ্ব তিলক ও অনেক সময় পুরুষ শিল্পীগণ শরীরের দ্বাদশস্থানে চন্দনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদাবলী অঙ্কিত করেন।

সুর, তাল, ছন্দ ও লয়ের বিশিষ্ট বিভঙ্গে সাজানো পুঙচোলম্ ও করতাল চোলম্ নৃত্য প্রাণবন্ত ও অখণ্ড যুথবদ্ধ শিল্পসুষমার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। অন্য কোন ভারতীয় নৃত্যধারায় এই ধরণের একই ব্যক্তিকে এক সংগে সঙ্গৎ ও রূপকার্যের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায় না। এই নৃত্য পদ্ধতি ও প্রকরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে একদল সুষম ও গোষ্ঠীবদ্ধ রূপকার একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করে পদাবলীর আবেগ ও ভাবনাটিকে কত অপূর্ব দক্ষতার সাথে দর্শকমনে আস্বাদ্য করে তুলছেন।

মণিপুরে প্রচলিত দুটি গ্রন্থে বিভিন্ন মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'লেইথক লৈখা জগোই' গ্রন্থে লাইহারাউবা ও অন্যান্য নৃত্যে প্রযুক্ত

প্রতীক-ধর্মী আদিম মুদ্রার বর্ণনা আছে। রাজা ভাগ্যচন্দ্র রচিত 'গোবিন্দ সঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থে রাসনৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। 'গোবিন্দসঙ্গীত লীলাবিলাস' গ্রন্থে পতাকা, ত্রিপতাক অর্দ্ধপতাক, কটকামুখ, সন্দংশ, মৃগশীর্ষ, হংসাস্য, অলপল্লব, ভৃঙ্গ, অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র, কোরক, মুষ্টি, অঙ্কুর, শার্দুলাস্য, কাঙ্গুল, ত্রিশূল, কর্তরীমুখ, সূচীমুখ, পদ্মকোশ, শিখর, হংসপক্ষ, অহিতুণ্ড, চতুর ও ধেনু এই পঁচিশটি অসংযুক্ত হস্ত ও শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঞ্জলি, কর্কট, তার্ক্ষ্য সম্পূট, পুষ্পপুট, রম্ভাসুমা, কোকিল, স্বস্তিক ও শুক এই বারটি সংযুক্ত হস্তের বর্ণনা পাওয়া যায়।

মণিপুরে নৃত্যধারায় নৃত্যের সাথে সঙ্গীতের যোগসূত্র অতি নিবিড়। নৃত্যের প্রয়োজনেই সঙ্গীত তার রূপ ও উৎকর্ষ অর্জন করেছে। আবহসঙ্গীতে অনুদ্ধ বা তালযন্ত্রের মধ্যে পুঙ, ইয়াবুঙ, হারাপুঙ, তানাইবুঙ, নাগনা, খোল, ঢোলক, দফত, খঞ্জরী, পাখোয়াজ ও ঢোল ব্যবহৃত হয়। ঘনবাদ্য বা ধাতবযন্ত্রের মধ্যে সেমবুঙ, ঝালারি, মঙগঙ, জাল, মন্দিলা, করতাল, রমতাল ব্যবহৃত হয়। সুষিরবাদ্যের মধ্যে বাঁশী, ময়বুঙ, পেরে ও খঙ ব্যবহৃত হয়। তত বা তারযন্ত্রের মধ্যে মধ্যে পেনা, এস্রাজ, তানপুরা ব্যবহৃত হয়।

নৃত্যে ও সঙ্গীতে তাল ও লয় প্রধান আশ্রয়। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে ঃ

"তালস্তলপ্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘঞি স্মৃতঃ।
গীতংবাদ্যং তথা নৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতম ॥"

শাস্ত্রমতে তাল-এর যে দশটি প্রাণ প্রচলিত মৈতৈ সঙ্গীতেও তা স্বীকৃত। মণিপুরী নৃত্যে প্রধানতঃ তাঞ্চেপ, মেনকূপ, রূপক, দশকোশ, তিনতাল দশকোশ, তিনতাল মাচা, তেবড়া, রাজমেল, দুতাল অছুবা, যাত্রারূপক, তিনতাল অছৌবা, তিনতাল মেল, ভঙ্গদাস, গাজন, মদন, মৈতৈ সুরফাঁক, ঝাপতাল, রাসতাল, চারতাল প্রভৃতি তাল প্রচলিত। চারমাত্রা থেকে আটষট্টি মাত্রা পর্যন্ত বিভিন্ন ভাগে অলঙ্কার

পুংলোল বা প্রস্তর ছন্দিত হয়। দুই বা ততোধিক তাল এবং নৃত্যালঙ্কার সমন্বয়ে তালপ্রবন্ধ ও নৃত্যপ্রবন্ধ গঠিত হয়। মৃদঙ্গের ছন্দ মূল দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করে। প্রথম পদ্ধতিতে বোলগুলিকে সুস্পষ্টরূপে অনুসরণ করে মৃদঙ্গের ছন্দে শব্দিত করা হয় এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ঐভাবে অনুসরণ না করেও বাদক স্বাধীনভাবে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন স্বরের জটিল বিন্যাস ও সঙ্গতিপূর্ণ গীতি সহযোগে স্বরমালা নৃত্যপদ্ধতি রচিত হয়। এছাড়া কবিতা, গীতি, স্বরমালা ও নির্গীত সমন্বয়ে চতুরঙ্গ গঠিত হয়। এগুলির সমন্বয়ে নায়ক নায়িকার প্রশংসাসূচক 'কীর্তিপ্রবন্ধ' নৃত্তপ্রধান পদ্ধতিও অনুসৃত হয়। নৃত্যের সাথে কবিতা যখন গীতিরূপে প্রযুক্ত হয় তাকে 'সেইগোন্নাবি' বলে। আবার মুখবোল রূপে অর্থাৎ কবিতা ছন্দে আবৃত্তি সহযোগে প্রযুক্ত হলে 'চিনগোন্নাবি' বলে। সঙ্গীতাংশে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় রাগের প্রচলন আছে।

কথিত আছে মণিপুরী নৃত্যে রাসলীলার পোশাক মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে প্রবর্তন করেন। মণিপুরী নৃত্যে শিল্পীরা কোন প্রকার অস্বাভাবিক রূপসজ্জা করেন না। স্বাভাবিক রূপকে সামান্য প্রসাধনে উজ্জ্বল করা হয়। মাথায় চূড়া বাঁধা হয়। চূড়ার উপরে 'কোকতুম্বি'—বিচিত্র জরির কাজ করা এর তিনটি অংশ। মুখের উপর জালের মত সাদা বসনের আবরণ 'মাইখুম'। ঘন সবুজ ভেলভেটের ব্লাউজ বা রেশম ফিরুৎ। সবুজ শাটিনের পেটিকোট, এর জমির মাঝে অজস্র চুমকি এবং নিম্নভাগে পিতলের তবকমোড়া বিভিন্ন গোলাকার আরশি সমান্তরালভাবে বসান থাকে। নিম্নভাবে কাপড়ের মধ্যেই বেত দিয়ে শক্ত করা থাকে। এই বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র পোশাককে 'কুমিন' বলে। ওপরের রূপালী কাজ করা আয়না বসানো শাদা স্বচ্ছ ঘাঘরাটিকে 'পোশওয়ান' বলে। কাঁধের ওপর থেকে পাশে ঝোলানো, নিম্নভাগে সোনালী ও রূপালী

জরির কাজ করা অংশটিকে 'খাওন' বলে। অর্ধচন্দ্রাকার, গোল ও চৌকা কাঁচে খচিত মখমলের বেল্টগুলিকে খ্বানপ বলে। অলঙ্কার এর মধ্যেও প্রচুর বৈচিত্র। তাল, তানথাক, তাংখা, রতনচূড়, অনন্ত, সেনাখুজি, খুড়পা, কুণ্ডলীন, পারেঙ, ঝাপা প্রভৃতি বহু বিচিত্র অলঙ্কার প্রচলিত। কৃষ্ণের পোশাকের নাম কৃষ্ণাগীফিজেৎ। মাথায় চূড়ায় শিখীপুচ্ছ ও বর্ণাঢ্য আভরণ। রেশম ফুরিৎ, কাজেঙলেই, খাওন, খ্বানপ, ধোরা, নুপুর, ঘুঙুর প্রভৃতি অংশে পোশাকের বর্ণাঢ্যতা ও বৈচিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

লাইউারাহবা নৃত্যে 'ফনেক' ব্যবহার হয়। ফনেক এর পাড়ে প্রাগৈতিহাসিক্‌ যুগের অনুকরণে পদ্মফুল ও মৌমাছির নক্সা অঙ্কিত থাকে। ফনেকের মধ্যে লাল ও কাল সারি থাকে। এই কাল ও লাল রঙ যথাক্রমে রাত্রি ও ঊষাকালের প্রতীক। পুরুষ শিল্পীরা মহাভারতের ক্ষত্রিয়দের অনুকরণে বেশভূষা পরিধান করেন। বেশ পরিধানের এই পদ্ধতিকে ত্রিকৎস ভঙ্গী বলা হয়। নাগাদের নৃত্য-ধারায় আদিবাসী পোশাক প্রচলিত। মনিপুরী নৃত্যের পোশাক পরিকল্পনায় মণিপুরীদের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ললিত নৃত্যে মণ্ডলী পরিক্রমার সময় বর্ণাঢ্য দোলায়মান বসনে খচিত চুমকি, আরশি ও জরীতে উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হয়ে এক অলোকসুন্দর রূপলোক সৃষ্টি করে।

মণিপুরী নৃত্যে কোন বাহুল্য দেখা যায় না। এই নৃত্যছন্দ প্রকৃত সৌন্দর্যের রূপায়ণ করে, কোন স্থূল আকর্ষণের প্রয়াস থাকে না। প্রধানতঃ ভক্তিরসাশ্রিত এই নৃত্যধারা গঠনপরিপাট্যে, ভাব বিভাবের দ্যোতনায় একটি সর্বাঙ্গীন অখণ্ডতা সম্পাদন করে। সুশোভিত নৃত্যমণ্ডপ ও মণিপুরীদের সহজাত সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে। বৈষ্ণবধর্ম ও মৈতৈ আদিম ধর্মের সমন্বয়ে মণিপুরের মানস সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মণিপুরী নৃত্যধারা ভারতের নৃত্য-কলার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে।

আধুনিককালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় মণিপুরী নৃত্য ধারা ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীহট্ট, কাছাড় ও আগরতলা ভ্রমণের সময় রবীন্দ্রনাথ রাসনৃত্য দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে নবকুমার সিংকে শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা দেবার জন্য নিয়ে আসেন। নবকুমার সিং-এর প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে প্রথম মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতিতে 'নটীর পূজা' ও 'ঋতুরঙ্গ' অনুষ্ঠিত হয়। এর পর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু সিনারিক সিং রাজকুমার ও নীলেশ্বর মুখার্জিকে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করবার জন্য নিয়ে আসেন। এই সময়েই 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'চণ্ডালিকা'এই তিনটি নৃত্যনাট্য শান্তিনিকেতনে প্রযোজিত হয়। পরিশেষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কবিগুরুর বিশেষ আগ্রহে গুরু আতম্বা-সিং শান্তিনিকেতনে শিক্ষাদানের জন্য আসেন। তাঁর সময়েই 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর ও ভাবের গভীরতা ও কাব্যময়তার সঙ্গে মণিপুরী নৃত্যের স্বচ্ছন্দ বিন্যাস, সাবলীল গতি ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের বিশেষ সামঞ্জস্য থাকায় শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্য সর্বাপেক্ষা সমাদৃত হয়। শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের প্রচলন ও প্রসারের ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে এবং পরে সারা ভারতে প্রসার লাভ করে।

মণিপুরী নৃত্যের প্রসারে রাজন্যবর্গের মধ্যে ভাগ্যচন্দ্র, চৌরজিৎ, মারজিৎ, গম্ভীর সিং, নরসিং, চন্দ্রকীর্তি সিং, সুরচন্দ্র, চূড়াচাঁদ, বোধচন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা ও অনুশীলন প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালের গুরু ও শিল্পীদের মধ্যে গুরু আমুবি সিং, আমুদন শর্মা, আতম্বা সিং, বিপিন সিং, প্রিয়গোপাল সিং, নদীয়া সিং প্রভৃতির অবদান উল্লেখযোগ্য।

ভরতনাট্যম

১২
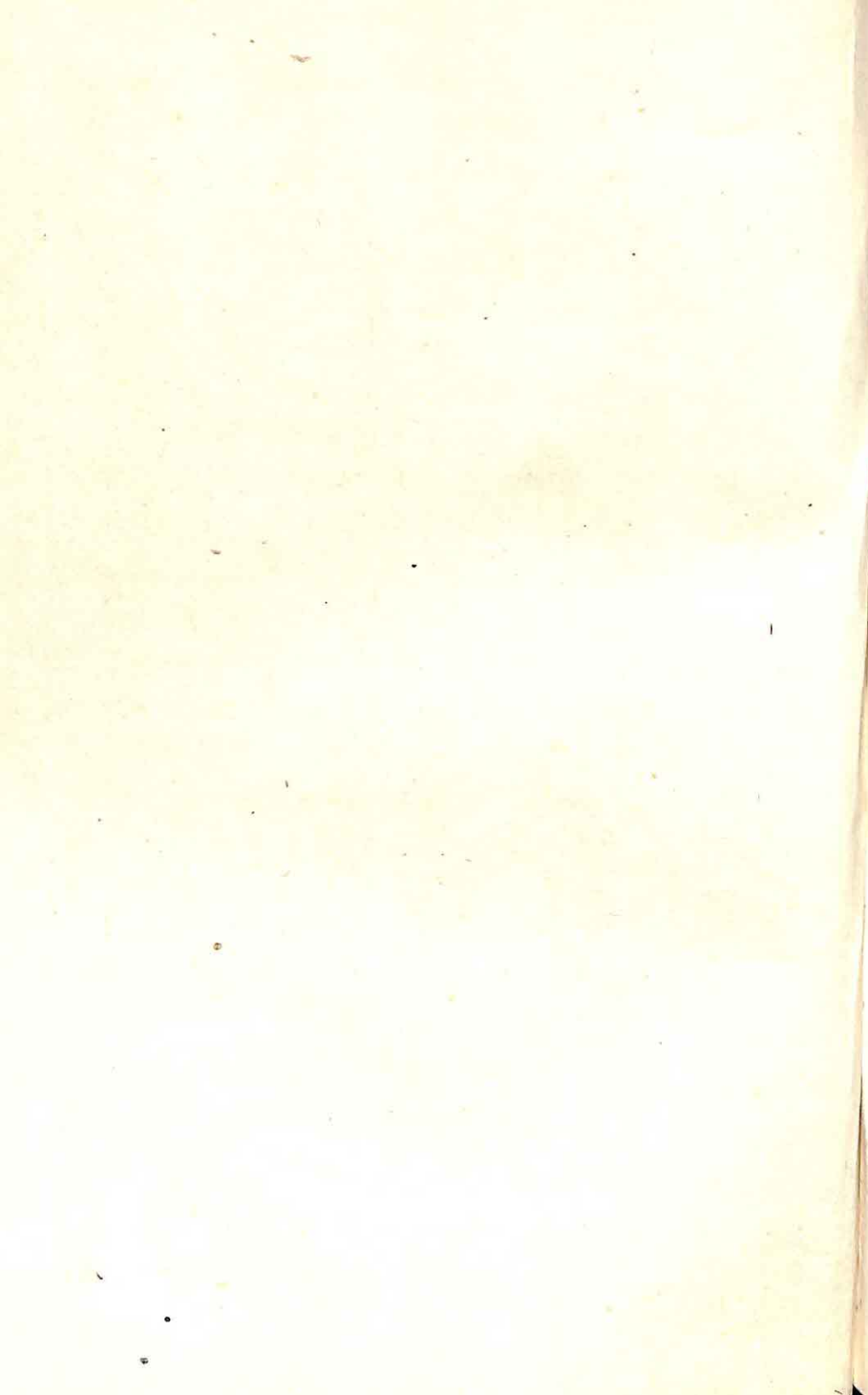
ভরতনাট্যম

ভারতের মার্গনৃত্যধারার পূর্ণাঙ্গরূপের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি ভরতনাট্যম। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, স্থাপত্য, চিত্রকলা, সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গের সমন্বয়ে ভরতনাট্যম সারস্বত চেতনাসমৃদ্ধ মহিমায় প্রোজ্জ্বল। অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারাগুলিতে এই সম্পূর্ণতা নেই, সেজন্য অন্যান্য নৃত্যধারা অপেক্ষা ভরতনাট্যম প্রাণময়তায় প্রবহমান ও গতিশীল। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ধ্রুবরীতির ছন্দোময় রূপ ভরতনাট্যম। গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে সংস্কৃতির প্রবহমান অভিযাত্রায় নিজস্ব মৌলিকতা বজায় রেখে ভরতনাট্যম তার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রেখেছে। প্রেম, আনন্দ, সৌন্দর্য, প্রশান্তি ও আশা মানবতার এই মহৎ ধারাগুলি ভরতনাট্যমের ছন্দে ভাব বিভাবের দ্যোতনায় আধারীকৃত।

ভাব, রাগ ও তাল এই তিনের সমন্বয়ে নৃত্যের সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন এই ভাব, রাগ ও তালের প্রথম তিনটি বর্ণকে কেন্দ্র করেই ভরতনাট্যম নামের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন ভরতমুণি প্রবর্তিত নৃত্য বলেই এর নাম ভরতনাট্যম। এ বিষয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত এখনও পাওয়া যায়নি।

ভরতনাট্যম নৃত্যকলা সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারনা ব্যাপকভাবে

প্রচলিত আছে। এই নৃত্যকলা সম্পর্কে যাদের প্রকৃত ধারনা নেই তারা অনেকেই ভরতনাট্যমকে দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক নৃত্যধারা বলে মনে করেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতা সংকীর্ণতাবোধ থেকে প্রচারিত হয়েছে। আসলে ভরতনাট্যম একটি নৃত্যধারা মাত্র নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্য-পদ্ধতি যা অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারাতেও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ইতিহাসের পরিপেক্ষিতে বিচার করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এই পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি ভরতনাট্যম অতি সুপ্রাচীন কাল থেকেই কেবলমাত্র দক্ষিণ-ভারতে নয় সমগ্র দেশে প্রচলিত ছিল। অবশ্য একথা সত্য যে দক্ষিণ-ভারতে এই নৃত্যকলার প্রসার ও অনুশীলন হয়েছে। এর অন্যতম কারণ এই যে উত্তর ভারতে দীর্ঘ-কালব্যাপী রাষ্ট্রনৈতিক কলহ, মুসলমান আক্রমণ ও পাঁচ শতাব্দীব্যাপী মুসলমান শাসন। মুসলমান রাজত্বকালে উত্তর ভারতে এই ধর্ম-ভিত্তিক শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার প্রসার ব্যহত হয়, এবং সমগ্র উত্তর ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতির বিকাশ হয়। স্বভাবতই দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজাদের আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে এই ধর্মভিত্তিক নৃত্যকলার বিকাশ অব্যাহত থাকে। এবং পরবর্তীকালে কিছু কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নৃত্য এই নৃত্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইতিহাসের গতিকে অনুসরণ না করলে ভরতনাট্যম নৃত্যধারার বিবর্তনের রূপটিকে যথার্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না। শিব করণ ও অঙ্গহারযুক্ত নৃত্যবিধি পূর্বরঙ্গ অনুষ্ঠানে যোজনা করার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত নৃত্যকলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত না হলে এর ক্রমপরিণতির রূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় ইতিহাসের ধারা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও ছিন্নসূত্র হওয়ার জন্য ভারতের নৃত্যকলার ক্রমবিকাশের ইতিহাসও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্রাচীনতম নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের রচনাকালের আগেও আমাদের দেশে শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মহেনজোদারো

ও হরপ্পার প্রত্নতান্ত্রিক গবেষণায় প্রাক বৈদিক যুগের নৃত্যকলার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাপ্ত উর্ধ্ব তাণ্ডব ভঙ্গীযুক্ত নটমূর্তি খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ নৃত্যপদ্ধতির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এ ছাড়াও বহু সংগৃহীত মূর্তি, প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতি থেকে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই সব বহু বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে গবেষণা আরম্ভ না করলে ভরতনাট্যম নৃত্যকলার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে না।

ভারতের নৃত্যকলার অন্যান্য ধারার মত ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতির মূল ভাবধারাও ধর্মভিত্তিক ও দেবতাকেন্দ্রিক। শিবতাণ্ডব থেকে এর জয়যাত্রার সূচনা। দেবতাকেন্দ্রিকতা থেকে মানবকেন্দ্রিকতা নৃত্য-কলার উত্তরণের এই পথপরিক্রমার মধ্যেই ভরতনাট্যম নৃত্যধারার ইতিহাসকে অনুসরণ করতে হবে।

নৃত্যকলার উৎস সন্ধানে ভারতের মন্দির ও দেবদাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেকে সেজন্য এই নৃত্যধারাকে পূর্বে দাসীআট্যম্ নামে অভিহিত করতেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই দেবমন্দিরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেবতার প্রীতির জন্য দেবদাসীদের নৃত্যগীত প্রদর্শনের প্রথা প্রচলিত ছিল। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে সংকলিত পদ্মপুরাণে স্বর্গে পূর্ণ কল্পলাভের জন্য দেবতাকে সুন্দরী স্ত্রী উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণেও দেবতার প্রীতির জন্য নৃত্যগীতের আয়োজনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"তদাপূজোপহারশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যা দিকৈস্তথা
পূজয়িত্বা জগন্নাথ তোয়য়েৎ গীতনৃত্যকৈঃ ॥"

ভবিষ্যপুরাণে সূর্যের উপাসনায় নৃত্যগীতিকুশলা স্ত্রীলোকদের উৎসর্গ করার বিধির উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবমন্দিরে নৃত্যগীতানু-ষ্ঠানের রীতির উল্লেখ পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শ্রীমদভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। শিবপুরাণে শিবমন্দির নির্মাণ ও

সংরক্ষণ প্রসঙ্গে অন্যান্য নির্দেশের সাথে নৃত্য ও গীত এই উভয় কলায় নিপুনা শত সুন্দরী স্ত্রীলোক দেবমনোরঞ্জনের জন্য নিয়োগের নির্দেশ আছে।

কহ্লন রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে অষ্টম শতাব্দীতে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে দেবদাসী সম্প্রদায়ের ব্যাপক অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রখ্যাত চোল নৃপতি প্রথম রাজরাজ-এর রাজত্বকালে (৯৮৫ খৃঃ-১০১৪ খৃঃ) তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরে চারশত দেবদাসীর অবস্থিতির কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। গজনীর সুলতান মামুদ যখন ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করেন তখন সেখানে পাঁচশত দেবদাসীর উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বৈদেশিক পর্য্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকেও দেবদাসী সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। কেবলমাত্র দক্ষিণভারতে নয় ভারতের সর্বত্রই দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল। ভিনিসিয় পর্য্যটক মার্কোপেলো (১২৫০খৃঃ) মালাবার উপকূলের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেবদাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছেন। ফরিস্তার বিবরণী থেকে জানা যায় যে সুলতান আলাউদ্দিন বাহমনীর রাজত্বকালে (১৩৫১ খৃঃ-১৩৫৮ খৃঃ) তিনি কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করে মন্দির থেকে সুন্দরী দেবদাসীদের হারেমে নিয়ে আসেন। এই দেবদাসীদের মুরলী বলা হত। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ পর্য্যটক ডোমিঙ্গোর বিজয়-নগর পরিভ্রমণের বর্ণনায় দেবগণের প্রীত্যর্থে দেবদাসীদের উৎসর্গের কথা পাওয়া যায়। ফরাসী পর্য্যটক টাভার্ণিয়রের (১৬৪১ খৃঃ) একটি মন্দিরের বর্ণনায় উল্লেখ আছে ঃ When the courtersans have got together a good sum of money in their youth, they buy young slaves whom they teach to dance and sing. And when the young girls are eleven or twelve years old, their mistresses send them to this temple,

believing it will bring them good fortune to offer and surrender to this idol."

শিলপ্পাদিকারম্ গ্রন্থেও আমরা নাট্টুয়াঙ্গম ও দেবদাসীদের কথা পাই। নট, আভই ও আঙ্গম এই তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত নাট্টুয়াঙ্গম শব্দের অর্থ নৃত্যসম্প্রদায়ের নেতা। সাধারণ নৃত্য-শিক্ষককে নাট্টুবান বলা হয়ে থাকে। নাট্টুবান গণ বংশপরম্পরায় নিজেদের পেশার অধিকারী হন এবং এই পেশা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নাট্টুবানগণ চুক্তিবদ্ধভাবে মন্দিরে দেবতার চরণে নিবেদিত দেবদাসীদের বিনা পারিশ্রমিকে নৃত্যশিক্ষা দিতেন। বিনিময়ে দেবদাসীদের আজীবন তাদের উপার্জনের অর্ধাংশ নাট্টুবানদের দিতে হত। নাট্টুবানদের অনুমতি ব্যতিরেকে দেবদাসীরা কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। ঐই দেবদাসী ও নাট্টুবানগণ ভরতনাট্যম নৃত্যধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল ছিল।

দেবদাসীগণ সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে মন্দিরের সেবায় আত্মনিবেদন করত। শিক্ষা শেষ হলে মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবতার নিকটে তাদের প্রথম নৃত্যানুষ্ঠান 'আরেংদেআট্যম' অনুষ্ঠিত হত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়। এবং পরবর্তীকালে দেবদাসী, রাজদাসী ও স্বদাসী এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত হয়। রাজদাসীরা মন্দিরে ধ্বজস্তম্ভের সম্মুখে রাজা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাবেশে নৃত্যপ্রদর্শন করত। স্বদাসীরা দাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে সব থেকে নিম্নস্তরের বলে গণ্য হত। এরা তাঞ্জোরের বিখ্যাত উৎসব কুম্ভাভিষেক এর সময় ছাড়া দেবতার সামনে নৃত্য করতে পারত না। সাধারণ লোকের মনোরঞ্জনে এরা নৃত্য করত।

নাট্টুবানগর্ণ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিলেন এবং স্বভাবতই বংশ-পরম্পরায় এই শিক্ষাদাতার ভূমিকা তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকায়

যথাযথ শিক্ষাদানে বা এই নৃত্যধারার নবরূপায়নে তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। সমাজপতিদের চক্রান্তে ও নাট্টুবানদের অর্থলালসায় দেবদাসীদের পবিত্র জীবন ক্রমশঃ ব্যাভিচার ও কলুষতায় পর্য্যবসিত হয়। এই প্রথার অপব্যবহারে সমগ্র দেশে গণিকাদের মধ্যে এক বিরাট অংশ দেবদাসী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সংগৃহীত হতে থাকে। পিতামাতার দারিদ্র্য ও ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে পুরোহিত ও নাট্টুবানদের চক্রান্তে মাতৃক্রোড় থেকে মন্দির এবং পরে মন্দির থেকে গণিকালয়ে অসংখ্য দেবদাসী সংগৃহীত হতে থাকে। অবশেষে সরকার 'দেবদাসী বিল' প্রণয়ন করতে বাধ্য হন।

এই প্রাচীন ও পবিত্র প্রথা কিভাবে কলুষতা ও শোষণের মাধ্যমরূপে প্রয়োগ হতে থাকে তার বিবরণ বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়ঃ

"The Devdasi system has a significant role in the history of prostitution of India. The system requires that a girl should be dedicated before she attains puberty. The growing girl is then repeatedly told that she could not marry and if even she broke the sacred vow, her deity would punish and curse her family. In return for their services in the temple they received 'Inama' lands and cash allowances, which tempted the needy parents to dedicate their daughters to prosperous temples. The young woman, thus forced into a life that offered no opportunity for the fulfilment of their natural urges and desires, could be easily induced to lead an immoral life by their exploiters."

পরবর্তীকালে অর্থলালসা ও শোষণের মাধ্যমরূপে বহু বিচিত্র অনুষ্ঠান এই প্রথার সাথে যুক্ত হয়। এবং সেই সব ক্ষেত্রে মন্দিরে কিছু দক্ষিণা দিয়ে পিতৃগৃহেই দেবদাসীদের 'রক্ষিতা' জীবন আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়।

"When the Devdasi girl attains puberty the formal ceremony of initiation takes place either at home or at the temple to which she is dedicated. The parents then find a suitable man—possibly the highest bidder for their daughter to cohabit with. At the ceremony initiating the Devdasi into Sexual life, the chosen man fills the free end of her saree with coconut, rice, flowers and applies kumkum and haldi on her forehead and offers her new clothes and money. So she becomes her mistress.

Thus, the Devdasi system is an institution based on naive supersitions, serving the brutally selfish ends of its exploiters and victimising and ruining the lives of many innocent women."

এই প্রথার যারা শিকার হয়েছেন এমন অসংখ্য দেবদাসীরা ভারতের বিভিন্ন গণিকালয়ের এখনো অন্যতম প্রধান অংশ। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে ও সরকারী প্রচেষ্টায় আইন বিধিবদ্ধ করে অবশেষে এই প্রথার অবসান ঘটেছে।

বর্তমানে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠান বলতে সাধারণভাবে আল্লারিপু, যতিস্বরম, শব্দম, বর্ণম, পদম, তিল্লানা এইগুলিই প্রচলিত। কিন্তু এই ধারাগুলি বহুপরে ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতিতে সংযোজিত হয়েছে। সাদিরনাট্যম, ভগবতমেলা নাটক, কুরুভাঞ্জি ও কুচিপুড়ি

এই চারি পদ্ধতিতেই পূর্বে ভরতনাট্যম প্রচলিত ছিল।

ভরতনাট্যম নৃত্যের শুদ্ধমৌলিক রূপ সাদিরনাট্যম। বহু শতাব্দী ধরে মন্দিরে ও রাজদরবারে দেবদাসীদের দ্বারা এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। সাদিরনাট্যম, দাসীআট্যম, চিন্নমেলন, ভোগমেলম, তাঞ্জোরী নাচ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই নৃত্যধারা বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়। এর গঠনে নৃত্ত ও নৃত্য দুইই সমভাবে প্রযুক্ত হত। শৃঙ্গার রসাত্মক অভিনয়ে এই নৃত্য সাধারণভাবে স্ত্রীশিল্পীদের মাধ্যমেই পরিবেশিত হত।

ভগবতমেলা নাটক রক্ষনশীল ব্রাহ্মণজাতির প্রাচীন ধর্মভিত্তিক নৃত্যনাট্য। এই গোষ্ঠী নিজেদের ভরতমুণির প্রত্যক্ষ বংশধর বলে দাবী করে এবং নিজেদের ভগবতা বলে পরিচয় দেয়। ভগবত উপাসনার মাধ্যম রূপেই এই অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। যোগ, ধ্যান, কর্ম ও ভক্তি, ঈশ্বরআরাধনার এই চারিটি আশ্রয়ের মধ্যে ভক্তিসাধনা করার জন্য এই অনুষ্ঠান। দর্শক ও শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রবণ, স্মরণ, পদসেবা, অর্চনা, বন্দনা, দাস্য, যজ্ঞ ও আত্মনিবেদন, ভক্তিসাধনার এই নয়টি ধর্ম পালন করতেন। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে সাধারণত এই নৃত্যনাট্য রচিত হত। ভগবতমেলা নাটক যখন কোন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হত তখন ঐ অঞ্চলের সকল ব্রাহ্মণ পরিবারের অন্ততঃ একজনকেও এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে হত। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ সামাজিক রীতি ও বিশেষ সম্মানজনক বলে বিবেচিত হত।

ভগবতমেলা নাটকের সাথে কথাকলি নৃত্যনাট্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। কথাকলির মত সারারাত্রি ধরে অভিনয় হয় এবং শিল্পীসম্প্রদায়ে কেবলমাত্র পুরুষেরাই অংশগ্রহণ করে। এই অভিনয়েও মুক্তাঙ্গন অভিনয় মঞ্চ এবং কোন দৃশ্যসজ্জার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু কথাকলি নৃত্যনাট্যের সাথে এর পার্থক্যও অনেক বিষয়ে স্পষ্ট। যেমন কথাকলি নৃত্যনাট্যে অভিনয়শিল্পীরা গান করে

না বা সংলাপ আবৃত্তি করে না, কিন্তু ভগবতমেলা নাটকে শিল্পীদের সংলাপ আবৃত্তি বা গান করার রীতি আছে। ভগবতমেলা নাটকে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে সৌষ্ঠবরচনার দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভাবাভিনয় ও আঙ্গিকাভিনয়ে কথাকলি নৃত্যনাট্য অপেক্ষা ভগবতমেলা নাটক সূক্ষ্ম শিল্পসম্মত উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহন করে। ভগবতমেলা নৃত্যনাট্যে বেহালা ও মৃদঙ্গম আবহসঙ্গীতে প্রধান বাদ্যযন্ত্ররূপে প্রচলিত।

এই নাট্য পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হত, পরবর্তীকালে তেলেগু ভাষায় বহু নাট্য রচিত হয়েছে। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে ভেঙ্কট-রমণ শাস্ত্রী রচিত নাটকগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেও একথা সত্য যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভগবতমেলা নাটকের ধারা প্রচলিত ছিল। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে 'কৃষ্ণলীলা তরঙ্গিনী' গ্রন্থ প্রণেতা প্রখ্যাত শিল্পী তীর্থনারায়ণ স্বামী রচিত 'পারিজাত হরণম' একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। শ্রীভেঙ্কটরমন শাস্ত্রী রচিত 'মার্কণ্ডেয়', 'প্রহ্লাদ', 'সীতা কল্যানম', হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নাটক বিশেষ জনপ্রিয়।

ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও অষ্টম শতাব্দী থেকে ভগবতমেলা নাটকের উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়নগর রাজবংশের সময় থেকে তাঞ্জোরের মারাঠা রাজবংশের সময় পর্যন্ত এই শিল্পকলায় রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এই নৃত্যনাট্যের উৎকর্ষ প্রসঙ্গে শ্রীকে. ভি. রামচন্দ্রন-এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য: "Though verse seeks a composite expression in unison with the fully developed arts of music and dance in the drama, it is dance which triumphs and dominates-dance in its infinite variety as a decorative unit that twines in and out of every speech and song as the bias and supreme resource of abhin-

aya, dance that conditions everything from the simplest courtesy to the most elaborate ritual and helps to recapture the epic almostphere of the stories."

কুরুভাঞ্জি ব্যালে ধরনের নৃত্যপদ্ধতি। এতে ছয় থেকে আটজন স্ত্রী শিল্পী অংশ গ্রহণ করে। নায়কের প্রতি নায়িকার অনুরাগের কাহিনী পদ্যছন্দে রচিত হয় এবং সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশিত হয়। ভারতের নৃত্যপদ্ধতিতে ব্যালে নৃত্যধারার এটি একমাত্র উদাহরণ। কান্তিবিদ্যার রীতি অনুসরণ করে বর্ণনাত্মক কাহিনীর শুদ্ধ ভাবরূপ সঙ্গীতকে আশ্রয় করে কুরুভাঞ্জি অনুষ্ঠানে ছন্দিত হয়। সব থেকে প্রাচীন কুরুভাঞ্জি নাট্যের নাম কুত্রল কুরুভাঞ্জি। তিরুকুড়া রাজাপ্পা কবিরায়ার এটি রচনা করেন। সাম্প্রতিককালে শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী কলাক্ষেত্রের শিল্পীদের দ্বারা কুরুভাঞ্জি নৃত্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন ও সংস্কারের প্রয়াস করছেন।

কুচিপুড়ি নৃত্যধারা অন্ধ্র প্রদেশের কৃষ্ণানদীর তীরে কুচিপুড়ি গ্রামের ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত। সিদ্ধেন্দ্র যোগী এই নৃত্যপদ্ধতির প্রবর্তক। কুচিপুড়ি নৃত্যনাট্যে আঙ্গিকের প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়। এই নৃত্যধারায় বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় নৃত্যের অনুশাসন-গুলি কঠোরভাবে পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রীলোকেরা অংশ গ্রহণ করে না, পুরুষেরাই স্ত্রী ভূমিকা রূপায়ণ করে। বিজয়নগর রাজবংশ এই নৃত্যধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই অভিনয়ও সারা-রাত্রি ধরে অনুষ্ঠিত হয় এবং মঞ্চসজ্জার কোন প্রয়োজন হয় না। নাটকের চরিত্রগুলি মঞ্চে প্রবেশ করে সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পরিচয় দান করে। আবহসঙ্গীতে মৃদঙ্গম, বীণা, তম্বুরা, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত। কুচিপুড়ি নাটকের মধ্যে ভাম-কল্পম, গোল্লা কল্পম, উষা পরিণয়ম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানের যে রীতি প্রচলিত তা তাঞ্জোরের

রাজা সারফোজির রাজত্বকালে তৎকালীন সময়ের সঙ্গীত ও নৃত্য-কলার শ্রেষ্ঠ বিশারদ চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম ও ওয়াড়িভেলু এই চারিভ্রাতা কতৃক প্রবর্তিত হয়। ওয়াডিভেলু দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের একজন প্রতিভাবান স্রষ্টা। এবং তিনিই প্রথম দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে বেহালার প্রচলন করেন। ইতিপূর্বে অবশ্য কৌস্তভম্ নামে একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

প্রকৃত শিল্প কোনক্রমেই স্থাবর নয়, গতিশীলতাই তার ধারাকে সমৃদ্ধ করে। ভরতনাট্যম নৃত্যধারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে নবরূপে মহত্তর কলেবর ধারণ করেছে। এই নৃত্যধারার দুই হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও এর মৌলিক শুদ্ধ রূপটি বিভিন্ন পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে অক্ষুন্ন রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত ও ভরতনাট্যম-এর পরিবর্তন পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। তাঞ্জোরের রাজা অচুথাপ্পা নায়ক (১৫৭২ খৃঃ—১৬১৪ খৃঃ), রঘুনাথ নায়ক ও বিজয়রাঘব নায়ক (১৬১৪ খৃঃ—১৬৭৩)—এদের রাজত্বকাল ভরতনাট্যম্-এর বিকাশের স্বর্ণযুগ। এই পর্যায়ে ভেঙ্কটমখী, ক্ষেত্রায়া ও তীর্থনারায়ণ স্বামীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে রাজা প্রতাপসিংহ ও তুলাযাজীর রাজত্বকালে ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, মহাদেব অন্নাভি, প্রখ্যাত তাঞ্জোর ভ্রাতৃচতুষ্টয়-এর পিতা সুব্বরায়া নাটুবান, দীক্ষিতার, শ্যামশাস্ত্রী প্রভৃতির অবদানে ভরতনাট্যম্ নৃত্যধারা সমৃদ্ধ হয়। অবশেষে এই ধারা চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, ওয়াড়িভেলু ও শিবানন্দ—এদের প্রচেষ্টায় বর্তমান রূপ ধারণ করে।

আল্লারিপু ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানের প্রথম নৃত্য। তেলেগু শব্দ আল্লারিম্পু থেকে এই শব্দটির উদ্ভব। আল্লারিম্পু শব্দের অর্থ পুষ্পিত বা প্রস্ফুট হওয়া। এই পর্যায়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বিশুদ্ধ নৃত্যের জন্য দেহভঙ্গির সুষম সৌন্দর্যে পুষ্পিত ও প্রস্ফুটিত করা হয়। শিল্পী

মাথার ওপর দুটি হাত নমস্কারের ভঙ্গীতে রেখে বোলের সঙ্গে দৃষ্টি ও গ্রীবাকর্মের মাধ্যমে এই নৃত্য আরম্ভ করেন। এটি পূর্বরঙ্গ বা বন্দনা সূচক অনুষ্ঠান। নৃত্যের মাধ্যমে শিল্পী রঙ্গদেবতা, দর্শক, সঙ্গীত শিল্পী সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। এই নৃত্যে সাবলীল ও সহজ ভঙ্গি অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে অনেক শিল্পী আল্লারিপু নৃত্যসংগঠনে বিভিন্ন আড়াউ ও যতি প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস করেন, কিন্তু এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত অনুচিত। সাধারণভাবে এই পর্যায়ে নৃত্য প্রদর্শনে সময় লাগে তিন থেকে পাঁচ মিনিট।

আল্লারিপুর পর অনুষ্ঠিত হয় যতিস্বরম। ইহা শোভাসম্পদক নৃত্ত প্রধান অংশ। দেহভঙ্গির সঙ্গীতে সুষম সৌন্দর্য সৃষ্টি করাই এই পর্যায়ে প্রধান লক্ষ্য। এই নৃত্যসংগঠনে সাধারণ ভাবে পাঁচ থেকে সাতটি জটিল যতি রাগাশ্রয়ী সরগম ও তাল সমন্বয়ে মৃদঙ্গ ও মন্দিরার সাহায্যে পরিবেশিত হয়। এতে দৃষ্টি, গ্রীবা, হস্ত ও পাদকর্ম প্রধান এবং কোনও বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হয় না। এই নৃত্যে শিল্পী বিশেষ দক্ষতার সাথে এক একটি যতি শেষ করে সমে আসেও অপর একটি যতি আরম্ভ করে। যদিও সৌন্দর্য সৃষ্টিই এই পর্যায়ে মূল লক্ষ্য তবুও সংযমের কঠিন ভিত্তির ওপর এই সৌন্দর্য সৃষ্টির রচনাকে স্থাপন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পীরা সৌন্দর্য সৃষ্টির উত্তেজনায় সংযমের আবেগবৃত্ত অতিক্রম করে রঞ্জনাসৃষ্টির প্রয়াস করেন। তাতে দর্শকের স্থূলরুচি পরিতৃপ্ত করে সহজে জনপ্রিয় হওয়া যেতে পারে, কিন্তু মনের সূক্ষ্মতর আনন্দোপলব্ধির বিঘ্ন ঘটে। ভরতনাট্যম নৃত্যধারার এই পর্যায়ের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে এই সতর্কতা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ নিম্নতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পসৃষ্টির সাথে মহত্তর শিল্প-সৃষ্টির দ্বন্দ্ব এই নৃত্যধারার ইতিহাসে বার বার ঘটেছে। বর্তমান যুগেও এই দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই দ্বন্দ্বে জয়ী হওয়ার ওপরেই শিল্পীর সৌন্দর্য রচনার সার্থকতা নির্ভর করে।

যতিস্বরম এর পর অনুষ্ঠিত হয় শব্দম। তেলেগু ভাষায় রচিত

ভক্তিমূলক সঙ্গীতকে অভিনয়ের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করাই এই পর্যায়ে নৃত্যের লক্ষ্য। সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতা অথবা রাজার শৌর্য, বীর্য ও মহত্ব বর্ণনা করা হয় এবং সঙ্গীতের শেষে অভিবন্দনা করে নৃত্যের সমাপ্তি। সংস্কৃতে এই ধরণের সঙ্গীতকে 'যশোগীতি' বলা হয়। এতে সঞ্চারী ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়।

শব্দমের পরে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণম। বর্ণম ভরতনাট্যম নৃত্যপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা জটিল ও আকর্ষণীয় পর্যায়। এতে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের সমন্বয় দেখা যায়। ভাব, রাগ ও তালযুক্ত এই অনুষ্ঠান প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে। আবহসঙ্গীত প্রণয়ের অভিব্যক্তিতে রচিত হয়। যতিগুলি অত্যন্ত জটিল ও দ্রুত হয়ে থাকে ; একে থিরমণম্ বলে। এর চরণম গুলি অত্যন্ত সুন্দর। সঙ্গীতাংশে কল্যাণী, নবরত্নমালিকা প্রভৃতি অপ্রচলিত রাগের প্রয়োগ দেখা যায়। এই সঙ্গীত ভাবোচ্ছল ও ভক্তিমূলক। প্রতিটি যতির সমাপ্তিতে শিল্পী সঙ্গীত সমন্বয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। এই পর্যায়ে সুর ও ভাব, ছন্দ, লাস্য ও মাধুর্যের সমন্বয়ে দেহভঙ্গির সুষম স্থাপনা সচল স্থাপত্যের কারুকৃতি রচনা করে।

পরবর্তী অনুষ্ঠান পদম। বর্ণম অনুষ্ঠানের শ্রমবিনোদনের জন্য এই পর্যায়ে প্রেমগীতিমূলক পদগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতাংশে অধিকাংশক্ষেত্রেই জনপ্রিয় কবি জয়দেব, পুরন্দর দাস, ক্ষেত্রায়া রচিত মধুর পদাবলী পরিবেশিত হয়।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান তিল্লানা। ভরতনাট্যম নৃত্যধারার ছন্দ, লাস্য, মাধুর্য ও গভীরতার সমন্বয়ে সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ এই পর্যায়ে ছন্দিত হয়। এই নৃত্যে প্রত্যেকটি যতি বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুতলয়ে পরিবেশিত হয়। এই পর্যায়ে শিল্পী মাঝে মাঝে ক্ষিপ্রচটুল পাদবিন্যাসে ও বিভিন্ন মুদ্রা প্রয়োগে বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জনা মূর্ত করেন। বিভিন্ন আলাপে ও বিস্তারে, লাবণ্যযুক্ত নৃত্যবিন্যাসে, বিভিন্ন অঙ্গহার ও করণের প্রয়োগে শিল্পী এই পর্যায়ে মাঝে মাঝে নিজের

দেহসৌষ্ঠবকে স্থাপত্যের অপরূপ ভঙ্গিমায় রূপায়িত করে। শিরকর্ম, দৃষ্টি, নাসাকর্ম, গণ্ডভেদ, ভ্রূকর্ম, পাদকর্ম ও সুললিত আবহসঙ্গীত-সমৃদ্ধ এই নৃত্য ভাবসৌষম্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

ভরতনাট্যমের আশ্রয়রূপে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য এই চার প্রকার অভিনয়। দুটি ধর্ম-লোকধর্মী ও নাট্যধর্মী। চারটি বৃত্তি-ভারতী, সাত্ত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। দুই প্রকার সিদ্ধি-দৈবী ও মানুষী। পাঁচটি আসন—পদ্মাসনম, সিংহাসনম, যোগাসনম, বীরাসনম ও সিদ্ধাসনম। চারটি মণ্ডলা-মণ্ডলা, অর্ধমণ্ডলা, সমমণ্ডলা ও নৃত্যমণ্ডলা। তিনটি পদসংস্থান-অঞ্চিতা, কুঞ্চিতা ও অর্ধাঞ্চিতা। তিনটি ভঙ্গি সম, ললিতা ও বলিতা। তিন প্রকার অঙ্গভেদ এর মধ্যে করণ, অঙ্গহার ও মুদ্রা প্রধান।

ভরতনাট্যম অনুষ্ঠানে মূলরস শৃঙ্গার। এই নৃত্যের অন্তর্ভুক্ত তাণ্ডব ও লাস্য উভয়ই শৃঙ্গার রস থেকে উদ্ভূত। নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই তাণ্ডব নৃত্যে অধিকার আছে, যদিও পরবর্তীকালে রক্ষণশীল গুরুরা নৃত্যভেদে তাণ্ডবকে পুরুষের ও লাস্যকে স্ত্রীলোকের জন্য নির্দিষ্ট করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অশাস্ত্রীয় কারণ শৃঙ্গার রস থেকে উদ্ভব বলেই তাণ্ডবের প্রয়োগেও সৌকুমার্য ও লীলায়িত গতি আছে এবং এতে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার। 'নটনাদী বাদ্যরঞ্জনম' গ্রন্থানুসারে আনন্দ তাণ্ডবম (সন্ময় যতিনাট্যম), সান্ধ্য তাণ্ডবম (গীতনাট্যম), শৃঙ্গার তাণ্ডবম (ভরতনাট্যম), ত্রিপুরা তাণ্ডবম (পেরানি নাট্যম), উর্ধ্ব তাণ্ডবম (চিত্রনাট্যম), মুনি তাণ্ডবম (লাস্য বা লয় নাট্যম), সংহার তাণ্ডবম (সিম্হলা নাট্যম), উগ্র তাণ্ডবম (রাজ-নাট্যম), ভূত তাণ্ডবম (পট্টাসা নাট্যম), প্রলয় তাণ্ডবম (পাবই নাট্যম), ভুজঙ্গ তাণ্ডবম (পিথা নাট্যম) ও শুদ্ধ তাণ্ডবম (পদশ্রী নাট্যম) এই বারো প্রকার তাণ্ডবের কথা পাওয়া যায়।

নাট্যশাস্ত্রের 'তাণ্ডব লক্ষণ' অধ্যায়ে একশত আটটি করণের উল্লেখ আছে। হস্ত ও পদের পারস্পরিক সহযোগ করণের রূপকে

বিকশিত করে, আবার কয়েকটি করণ একত্র মিলিত হয়ে অঙ্গহার সৃষ্টি করে, এই করণ ও অঙ্গহার গুলি নৃত্যের সৌন্দর্যের মূল উৎস। চিদাম্বরম-এ নটরাজ মন্দিরে খোদিত ভরতনাট্যম নৃত্যে প্রযুক্ত একশত আটটি করণের অনুকৃতি এই নৃত্যকলার বিস্ময়কর উৎকর্ষের স্বাক্ষর বহণ করে। ভরতনাট্যম নৃত্যকলায় সাধারণত আটাশটি অসংযুক্ত মুদ্রা ও চব্বিশটি সংযুক্ত মুদ্রার প্রয়োগ হয়ে থাকে।

ভরতনাট্যম নৃত্যকলার অন্যতম প্রধান অঙ্গ সঙ্গীত। সঙ্গীতাংশে একজন সুকণ্ঠ শিল্পীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবহ সঙ্গীতে বীণা, তম্বুরা, বাঁশী, নফরী, সারাঙ্গী, বুদবুদিকা, মৃদঙ্গম, করতাল, বেহালা, সুরশৃঙ্গার, পুঙ্গী, নাগেশ্বরম ও মন্দিরা ব্যবহৃত হয়। মার্গসঙ্গীতের প্রায় সকল সমৃদ্ধ রাগরাগিনী সঙ্গীতাংশে প্রযুক্ত হয়।

সাধারণভাবে ভরতনাট্যম নৃত্যে রূবকম, জাম্বাই, এরাবম, তিরুপড্ডাই, আড়াতালম, মিট্টিয়াম, একতালম প্রভৃতি নয়টি তালের ব্যবহার হয়। তালের পাঁচটি মাত্রার নাম সাধুশ্রম (চার মাত্রা), তিশ্রম (তিনমাত্রা), মিশ্রম (সাতমাত্রা), কাণ্ডম (পাঁচমাত্রা) ও সংগীর্ণম (নয়মাত্রা)। তালগুলি বিভিন্ন মাত্রা ও যতি সহযোগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

ভারতের নৃত্যকলার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ ভরতনাট্যম। মহৎ শিল্পের সবকটি গুণই এই নৃত্যধারায় বিদ্যমান। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের সমন্বয়ে ভরতনাট্যমে যে চতুরঙ্গ রীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা অন্য কোন নৃত্যে বিরল। এই চতুরঙ্গ রীতির সম্মিলিত ছন্দবিভঙ্গে বিশ্বব্যাপী অনন্ত রূপের লীলার অখণ্ড রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে। শিল্পীমানসের প্রকাশ-উন্মুক্ত রূপ-ভাবনা ললিতছন্দে ও ভাবাভিনয়ের উৎকর্ষে দর্শকমনে সহৃদয় হয়ে ওঠে। কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও ছন্দের বিশিষ্ট বিভঙ্গে লীলায়িত এমটি অনন্য রূপ-ভাবনা দর্শককে রসমার্গে উদ্বোধিত করে।

এখানে শিল্পীর হস্তমুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে, দেহভঙ্গির

বিচিত্র সঙ্গীতে সিন্ধুতরঙ্গের হিল্লোল লীলায়িত হয়, গ্রীবাবিভঙ্গে গর্ব ও নিবেদন বিচিত্ররঙ্গে মূর্ত হয়, আঁখিপল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত হয় প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয়। এতগুলি নিরবয়ব ভাবনাকে একই দেহের বিচিত্র বিভঙ্গে শরীরী করে তুলে দর্শকমনে আস্বাদ্য করার ক্ষমতা অন্য কোন শিল্পধারায় বিরল।

বিস্ময়ের কথা এই যে কালের বিবর্তন সহ্য করেও এই ধারা দীর্ঘ দু হাজার বছর ধরে আপন সঞ্জীবনী শক্তির মাধুর্য নিয়ে বেঁচে আছে। পরিতাপের বিষয় এই শিল্পকলার সার্থক অনুশীলন ও সমাদরের অভাব ঘটেছে। আঙ্গিকসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থাই প্রধান হয়ে উঠছে; ভাবসঞ্চার ও রসোপলব্ধির দিকে যথাযথ দৃষ্টি না থাকায় শিল্পীমনে অপূর্ণতার গ্লানি জমে উঠছে।

'নটনাদীবাদ্যরঞ্জনম' ও 'শিলাপ্পদিকারম' এই দুটি গ্রন্থে ভরত-নাট্যম নৃত্যধারার ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যায়, অনেকে মনে করেন ভরতনাট্যম অন্ধ্র প্রদেশ থেকে মাদ্রাজ ও দাক্ষিনাত্যের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে। অন্ধ্র প্রদেশের বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীত স্রষ্টা ঋষি ত্যাগরাজ-এর তেলেগু ভাষায় রচিত অপূর্ব সঙ্গীতের মাধ্যমে ভরতনাট্যমের নাট্যধর্মী নৃত্য রূপায়িত হয়ে থাকে। তাঞ্জোরের মহারাজা স্বোয়াদী থিরুমল সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুবন্দনা সঙ্গীত রচনা করেন।

তাঞ্জোর রাজদরবারের চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দন ও ওয়াড়িভেলু এই চারিভ্রাতা এবং মাদুরার শ্রীসুভারায়া আন্নাভি, কল্যাণী সুন্দরম পিল্লাই, পেরিয়াতাম্বি আন্নাভি, পুন্যস্বামী আন্নাভি প্রভৃতি আচার্যদের ভূমিকা ভরতনাট্যম নৃত্যকলায় চিরস্মরণীয়। সাম্প্রতিক কালের নৃত্যগুরুদের মধ্যে গুরু মীনাক্ষীসুন্দরম পিল্লাই, কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই, টি, কে, মরুথাপ্পা পিল্লাই প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভরতনাট্যম নৃত্যকলাকে পুনরুজ্জীবন ও সমৃদ্ধ করার জন্য যারা আত্মনিবেদন করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আয়ার ও শ্রীমতী

ভরত নাট্যম।

মুখোশ।
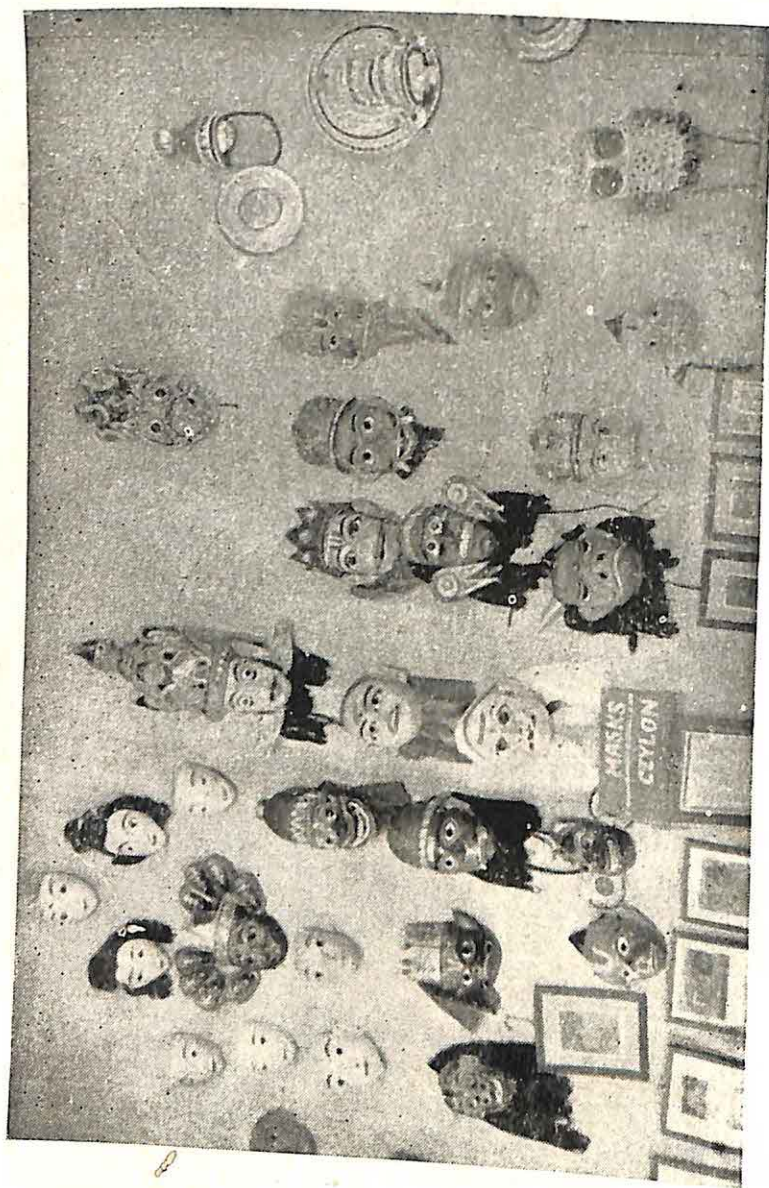
রুক্মিনী দেবী আরুণ্ডেল এর নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতে যখন নাচের বিরোধী জনমত সংগঠিত করা হচ্ছিল তখন শ্রীকৃষ্ণ আয়ার এর বিরোধীতা করেন এবং সংবাদপত্রের সহযোগিতায় ভরতনাট্যম নৃত্যকলার পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন সুরু করেন। তিনি নিজে এই নৃত্যকলা শিক্ষা করেন ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং এই নৃত্যকলা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় শ্রীমতী বালাসরস্বতী বেনারসে 'নিখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলনে' ভরতনাট্যম নৃত্য প্রদর্শনের সুযোগ পান। ভরতনাট্যম নৃত্যধারা সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান।

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবীর নাম ভারতের নৃত্যকলার গবেষণা ও প্রসারের ইতিহাসে সর্বকালে বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। তিনি কেবলমাত্র একজন কুশলী শিল্পী হবার প্রয়াসেই আবদ্ধ থাকেননি, তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীলতা ও বিধিনিষেধ তুচ্ছ করে নৃত্যকলাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিগত ভাবে নৃত্যকলার চর্চার তিনিই প্রবর্তন করেন। 'কলাক্ষেত্র' প্রতিষ্ঠা করে ভগবতমেলা নাটক, কুরুভাঞ্জি, কুচিপুড়ি, যক্ষগণ প্রভৃতি বিলুপ্তপ্রায় ধারাগুলির পুনরুজ্জীবন তাঁর শিল্পসাধনার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শ্রীমতী বালাসরস্বতী ভরতনাট্যম নৃত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর অভিনয়বহুল পদম এই নৃত্যধারায় নবযুগের সূচনা করেছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মৌলিক শুদ্ধ রূপটিকে অক্ষুন্ন রেখে এই নৃত্যগীতময়ী বিরল-শিল্পী দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে শিল্পসাধনায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। শ্রীমতী বালাসরস্বতী শুধুমাত্র নৃত্যেই পারদর্শিণী নন। মার্গ সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা ও কণ্ঠসম্পদ যে কোন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত-শিল্পীর ঈর্ষার বস্তু। সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় এই দক্ষতা তিনি প্রায় উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন। তাঁর প্রমাতামহী তাঞ্জোর দরবারের

রাজনর্তকী ছিলেন, মাতামহী বীণাধণম ছিলেন প্রখ্যাত বীণাবাদিনী। মাতা জয়াম্মা সঙ্গীতে ও নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিণী ছিলেন। নৃত্য ও সঙ্গীতোচ্ছল এই পারিবারিক পরিবেশে শিশুকাল থেকেই বালা-সরস্বতীর শিল্পীমানস পুষ্ট হয়েছে।

প্রখ্যাত গুরু কাণ্ডাপ্পা পিল্লাই-এর কাছে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তাঁর শিক্ষা সুরু হয়। মাত্র সাত বছর বয়সে কাঞ্চীপুরমের আম্মানাক্ষী মন্দিরে তাঁর "আরেঙ-দে আট্যম" অর্থাৎ প্রথম অনুষ্ঠান সূচিত হয়। পরবর্তীকালে গৌরী আম্মাল, বেদান্তম লক্ষীনারায়ণ শাস্ত্রী ও চিন্নায়া নাইডুর কাছেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে নিখিল ভারত সঙ্গীত মহাসম্মেলনে নৃত্য প্রদর্শনের পর তাঁর খ্যাতি সারা দেশে প্রসারিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তারপর সুরু হল দেশে ও বিদেশে শ্রীমতী বালাসরস্বতীর সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা।

তাঁর রূপায়িত প্রাণবন্ত বর্ণম ও পদম অনুষ্ঠান শুধুমাত্র ভারতের নৃত্যধারায় নয়, পৃথিবীর যে কোন শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভাবাভিনয়ের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। কাহিনী-আত্মক সংঘাত-তানিত ভাবটিকে সর্বাঙ্গের অভিব্যক্তি দিয়ে শরীরী করে তুলে দর্শকমনের আবেগবৃত্তে সঞ্চারিত করার এই অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য আর কোন শিল্পী আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেন নি।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যকলার ক্ষেত্রে শ্রীমতী শান্তারাও-এর অবদানের কথাও নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র ভারতীয় নৃত্যের একজন শ্রেষ্ঠশিল্পীরূপেই নয়, 'মোহিনী আট্যম্' নৃত্যের পুনরুজ্জীবনে তাঁর গৌরবময় ভূমিকার জন্য তিনি শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যে তাঁর সমতুল্য কুশলী শিল্পী বিরল। কথাকলি নৃত্য সাধারণত তৎকালীন সময়ে পুরুষ শিল্পীরাই অনুশীলন করতেন। শ্রীমতী শান্তারাও মাত্র বারো বৎসর বয়সে কথাকলি

নৃত্যশিক্ষা আরম্ভ করেন। এবং মাত্র চার বৎসর শিক্ষালাভ করার পর প্রতিযোগিতায় পুরুষশিল্পীদের পরাজিত করে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীকালে রক্ষণশীল সমাজের বিধিনিষেধ অমান্য করে তিনি কথাকলি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের পরিবেশে লালিত হয়েও নৃত্যশিক্ষার জন্য তিনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

কথাকলি নৃত্যশিক্ষা সমাপ্ত করে শ্রীমতী শান্তারাও প্রখ্যাত গুরু মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই এর নিকট ভরতনাট্যম্ নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমতী শান্তারাও গুরুর নিকট অত্যন্ত জটিল ও কঠিন 'থানা বর্ণম' অনুশীলন করেন। এই নৃত্যপদ্ধতি এর আগে দীর্ঘকাল অন্য কোন শিল্পী অনুশীলন করতে সাহস করেননি। শ্রীমতী শান্তারাও গুরুগৃহে থেকে কঠোর পরিশ্রম করে এই নৃত্যে সাফল্য অর্জন করেন।

প্রখ্যাতশিল্পী শ্রীকৃষ্ণ পানিক্করের নিকট শ্রীমতী শান্তারাও মোহিনী আট্যম নৃত্যশিক্ষা করেন। তৎকালীন সময়ে দীর্ঘকাল ধরে এই নৃত্যের অনুশীলন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ ছিল। শ্রীমতী শান্তা সামাজিক বিধিনিষেধ গ্রাহ্য না করে এই শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজে এই নৃত্যের প্রচলনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। এবং একথা অনস্বীকার্য যে তার প্রচেষ্টার ফলেই এই নৃত্য আবার প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

শ্রীমতী শান্তারাও সিংহলে নৃত্যচর্চার জন্য কিছুদিন বসবাস করেন। কারণ দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের রীতিই বিভিন্ন পরিবর্তিতরূপে সিংহলে প্রচলিত। বুদ্ধের বাণী অবলম্বনে শ্রীমতী শান্তারাও প্রযোজিত "আম্রপালী" নৃত্যনাট্য দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। শুধুমাত্র নৃত্যকলায় নয়, সাহিত্যে ও চিত্রকলায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত ও নৃত্যকলা সম্পর্কে তাঁর গবেষণা বিশেষ মূল্যবান।

সাম্প্রতিককালের শিল্পীদের মধ্যে ইন্দ্রাণী রহমান, যামিনী কৃষ্ণমূর্তি, কুমারী কমলা, চন্দ্রকলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণরূপ ভরতনাট্যম। তদানীন্তন দেশীয় রাজাদের আত্মকলহ, শৈববাদ ও ব্রহ্মণ্যবাদের সংঘর্ষ, মুসলমান আক্রমণ, অষ্টাদশশতকে শৈবধর্মের আত্মিক আদর্শের অবলুপ্তি—এ সকলের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এই নৃত্যধারার বিকাশ ব্যহত হয়। দেবদাসী প্রথার পাদপীঠ যখন কর্দমাক্ত হল তখন এমন কি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও অলঙ্কারদাসীদের আমন্ত্রণ নিষিদ্ধ হল। প্রাদেশিক সংকীর্ণতা, ধর্মসংস্কারক ও রক্ষণশীল নৃত্যগুরুদের অনুদার মনোবৃত্তি এই নৃত্যকলার পূর্ণবিকাশের প্রতিবন্ধক। একদিকে প্রাচীন দর্শন, দেবতাকেন্দ্রিকতা ও আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রয়াস ও অন্যদিকে শুধুমাত্র এই নৃত্যের সৌন্দর্যপ্রসবিণী রূপকে নিছক প্রদর্শন বিলাসে পরিণত করা, এই দুই প্রচেষ্টাই নিঃসন্দেহে পথচ্যুত হওয়ার লক্ষণ। আজকের এই অবিশ্বাস ও অর্থসর্বস্ব যুগের মাঝে শুধুমাত্র ধর্মীয় আবহাওয়ায় নৃত্যের পরিবেশন বোধ হয় বিফলতাই ডেকে আনবে। যুগোপযোগী করার জন্য দেবতাকেন্দ্রিকতা থেকে মানব-কেন্দ্রিকতায় নৃত্যকলার আন্তররূপের পরিবর্তন প্রয়োজন।

আশার কথা এই যে দেশের বিভিন্ন অংশে নৃত্য নাটক সঙ্গীত আকাদেমীর প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কলাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সমাজে কলাকেন্দ্রের প্রভাব গড়ে উঠলে তার মাধ্যমে এই নৃত্যশিল্পের দার্শনিক সম্পদ নিশ্চয়ই জাতিগঠন ও জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হয়ে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করবে। হয়তো সে রূপ শুধুমাত্র ধর্মভিত্তিক ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হবেনা। কিন্তু নিঃসন্দেহে ভারতের নিজস্ব যুগোপযোগী পরিবেশে ভারত সংস্কৃতির অখণ্ডতা ও সংহতির উজ্জ্বলতম নিদর্শনরূপে পরিচিত হবে।

কথক

১৩

কত্থক

বর্তমান কালের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নৃত্যধারা কত্থক। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় সমন্বয়ের বৈশিষ্ট্যে, বিভিন্ন শিল্পধারার যোগসূত্র, বহিরাগত শিল্পসংস্কৃতির প্রভাবে গীতিরূপ, বাদনপদ্ধতি ও নৃত্যছন্দের আবয়বিক ও আন্তর রূপের বার বার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই সমন্বয়ে ও যুগ যুগ ধরে সঞ্চয়ের অবদানে ভারতের ললিত সম্পদ অলংকৃত ও মহিমান্বিত হয়েছে। অবশ্য ভারতীয় মার্গ নৃত্যধারাগুলি সাধারণভাবে বৈদেশিক প্রভাবগুলিকে বিশেষ গ্রহণ করেনি। হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কঠিন রক্ষণশীলতার মধ্যে প্রাচীন ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস পেয়েছে।

কত্থক নৃত্যে এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। উত্তর ভারতের সঙ্গীত ও কত্থক নৃত্যপদ্ধতিতে পরবর্তীকালে আরব ও পারসিক সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় কত্থকনৃত্য প্রাসাদ ও দরবারের আড়ম্বরের প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। এমনকি এই নৃত্যধারার প্রাচীন রূপ ও রীতির প্রায় সর্বাঙ্গীন বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয়ের একটি কৌতুহলজনক বিষয় লক্ষ্য করা যায়। নৃত্যশৈলী, পোশাক, অলঙ্কারে, ইসলামীয় প্রভাব, কিন্তু কাহিনী অংশে প্রখ্যাত মুসলমান

শিল্পীরাও রাধাকৃষ্ণলীলা, রাস রচনা ও রূপদান করেছেন। মার্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। ধর্মান্ধতা সে সময়েও সমাজে বিশেষ প্রবল ছিল, তবুও এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্ম ও সংস্কারের গণ্ডীভেঙে সংস্কৃতিই মানবসমাজে প্রকৃত মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করে।

কথিকা শব্দটি থেকে কথকের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে দেবতাদের লীলা ও পৌরাণিক উপকথার বর্ণনা করায় জন্য কথক, গ্রন্থিক, গাথাকার প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। তারা সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে এই কাহিনী প্রচার করত। তারা কাহিনী অংশটি প্রথমে বর্ণনা করত, এবং তারপরে ভাবাভিনয়, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে সেই কাহিনীটি রূপায়িত করত। শব্দের ধ্বনিঝংকার ও মাধুর্যের দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হত। কারণ সে যুগে বাক্ অথবা অক্ষর বা স্বরকে জড় বা অচেতন মনে করা হত না। "বাণীজিহ্বা দেবী সরস্বতী"কে সব কিছুর কারণস্বরূপ চৈতন্যময় প্রণবরূপে এবং বাক্, অক্ষর ও স্বরসমৃদ্ধ কথিকাকে সেই চৈতন্যময় প্রণবের অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করা হত।

কথক নৃত্যধারার প্রথম শিল্পীরূপে দেবর্ষি নারদকে কল্পনা করা হয়। ত্রিভূবনে সঙ্গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে নারদ হরিগুণগান প্রচার করতেন। ব্রহ্মমহাপুরাণে কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া। লব ও কুশের মাধ্যমে রামায়ণ কথা প্রচারের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। পানিনি রচিত 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' গ্রন্থে ও 'শব্দার্থচিন্তামনি', 'বাচস্পত্যকোষ', 'শব্দ কল্পদ্রুম কোষ' প্রভৃতি অভিধানে নৃত্যগীতের মাধ্যমে কথিকাশ্রয়ী কথক শিল্পধারা ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈন গ্রন্থ 'অভিধান রাজেন্দ্র' ও 'কল্পাদ্রিকোষ' এ কথক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। তুলসীদাস রচিত 'বিনয় পত্রিকা'য় কথক সম্প্রাদায়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। ভারতের শিল্পধারায় বংশানুক্রমিক ও গোষ্ঠীগত ধারাবাহিকতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া

যায়। সেইরূপে বহু কথক নৃত্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থে কথক, সূত, মাগধ, বৈতালিক প্রভৃতি কথক সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে কবি বিদ্যাপতির সঙ্গীত সহযোগী জয়ত একজন নিপুন কথক শিল্পী ছিলেন।

রাধাকৃষ্ণ ভক্তিবাদ এর প্রভাবে কথক নৃত্যধারা পরিপুষ্ট হয়। রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক নৃত্যপদ্ধতির যে রূপ আমরা নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত হল্লীসক, চর্চরী, নাট্যরাসক প্রভৃতি থেকে পাই, সেই রূপের ছায়া পরবর্তীকালে কথক নৃত্যধারায় দেখা যায়। কাব্য, সঙ্গীত ও অভিনয় এই ত্রিধারার সমন্বয়ে তৎকালীন সময়ে কথক নৃত্য রাসনৃত্যধারার অনুরূপ সাদৃশ্যযুক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীআওয়াস্থির উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য : "The main reason for these resemblances is obviously the common thematic material—the Krishna lore, which demands the portrayal and expression of simalar sentiments and stimulations from both these dance styles. So, the dance creators, both the Lila-type and the Kathak, conceived similar dance gestures and movements in their imaginative visualisations of the krishna legend."

এছাড়াও প্রয়োগরীতিও আঙ্গিকে মূরলীগৎ, পনঘাট গৎ, কবিতা বোল, নটবরী বোল প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাসলীলা নৃত্যধারা ও কত্থক নৃত্যের বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী সঙ্গীত ও কত্থক নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। কথিত আছে রাজা লক্ষ্মণ সেন কবি জয়দেবের নিকট পদ্মাবতী অভিনীত 'গোবিন্দলীলা' নৃত্য দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পদ্মাবতী তখন রাজা লক্ষ্মণ

সেনকে তার গৃহে আমন্ত্রণ করেন। গোবিন্দলীলা কথিকা অভিনয়ের সময় রাজা বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে ঋতু ও কাল পরিবর্তনের বর্ণনার সময় প্রাকৃতিক পরিবেশও পরিবর্তিত হচ্ছে। গৃহসংলগ্ন পিপ্পলবৃক্ষ কথিকার কাল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কখনও বসন্ত সমাগমে পুষ্পিত হচ্ছে, আবার কখনও নবোদ্গত সমূদয় পত্রপল্লব ঝরে পড়ছে। প্রকৃতিও সামঞ্জস্য রেখে কখনও জ্যোৎস্নাবিধৌত বসন্ত পূর্ণিমার রাত্রি, আবার কখনও বিরহ বর্ণনায় নিবিড় ঘন কাল মেঘে আচ্ছন্ন হচ্ছে। বিমুগ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন শিল্পীকে সম্মানিত করলেন।

এই কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও সে সময় কথক নৃত্যের সমাদর ও উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেব রচিত "গীতগোবিন্দ"এর ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গীতাংশে বিশেষ ভূমিকা আছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে কথাকলি, কথক, ভরতনাট্যম, মণিপুরী এই চারটি মার্গনৃত্য ধারাতেই বিভিন্ন ভাবে 'গীতগোবিন্দ' এর সঙ্গীতাংশ প্রযুক্ত হয়েছে। পদ্মাবতী 'গীতগোবিন্দ' কেও নৃত্যে রূপায়িত করেছেন। কামতা কামরূপের রাজসভা কবি রামসরস্বতীর গীতগোবিন্দ অবলম্বনে রচিত একটি কাব্যে পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণের গীতক জয়দেবে নিগদতি
রূপক তালর চেবে নাচে পদ্মাবতী।"

অর্থাৎ কবি জয়দেব গান করিতেছেন আর সেই গানের রাগ ও তাল আশ্রয় করে পদ্মাবতী নৃত্য করিতেছেন। অনেকে বলেন জয়দেব স্বয়ং কাব্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যসমৃদ্ধ "গীতগোবিন্দ" অভিনয় সম্প্রদায়ের অধিকারী ও মুল গায়েন ছিলেন। পরাশর প্রভৃতি অন্যান্য সকলে দোহার ও বায়ন। নৃত্যশিল্পী ছিলেন কবিপত্নী পদ্মাবতী। একটি পদের ভনিতায় জয়দেব নিজেকে "পদ্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তী" অর্থাৎ পদ্মাবতীর চরণ চালকদের অধ্যক্ষ বলে পরিচিত করেছেন।

রাজা লক্ষণ সেনের সভায় বিদ্যুৎপ্রভা, শশীকলা প্রভৃতি প্রখ্যাতা কথক শিল্পীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য নৃত্য ধারার মত কথক নৃত্যধারাও ধর্মমূলক ও বিভিন্ন মন্দিরকে কেন্দ্র করেই প্রথমে প্রসার লাভ করে। বর্তমানে প্রচলিত কথক নৃত্য পদ্ধতির সঙ্গে তৎকালীন সমাজের কথিকাশ্রয়ী ধর্মভিত্তিক কথক নৃত্যের গুণগত ও চরিত্রগত পার্থক্য আছে। আগে কথক নৃত্যধারায় ভাবাভিনয়প্রধান নৃত্যাংশের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, কিন্তু বর্তমানে কথক নৃত্যে নৃত্তাংশই (ভাবাভিনয়হীন নটন) প্রধান, এবং একথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে অন্যান্য মার্গ নৃত্যধারার সাথে তুলনামূলক সমালোচনা করলে কথক নৃত্যের আবেদন ও সম্পদ অনেক নিম্ন পর্যায়ে পড়ে।

অন্যান্য নৃত্যধারায় ভারতীয় নৃত্যের বাহ্যতঃ স্থির প্রসন্ন রূপ-কল্পনার রেখাই ছন্দসৃষ্টি ও গতিসঞ্চার করে কিন্তু কথক নৃত্যপদ্ধতিতে ইসলামীয় প্রভাবে মূলত তালাশ্রয়ী রঞ্জনাশক্তিরই বেশী প্রয়োগ দেখা যায়। লঘু, গুরু, প্লুত, বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন তালের জটিল ও কুশলী প্রয়োগে এই নৃত্যে মনোরঞ্জক চমকের সৃষ্টি করা হয় যা সহজেই দর্শকমনকে রঞ্জিত ও উত্তেজিত করে। স্বভাবতই এই রঞ্জনা ভাবাভিনয়ের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। এবং ইসলামীয় প্রভাবে ভারতীয় নৃত্যের সাত্ত্বিক ও দার্শনিক ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে কথক নৃত্য স্থূল ইন্দ্রিয় আবেদনে পর্যবসিত হয়।

কথক নৃত্যধারায় বৈষ্ণব দর্শন ও ইসলামীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের অপূর্ব নিদর্শন দেখা যায়। এর ক্রমবিকাশ বৈদিক ও ক্লাসিকাল যুগ অতিক্রম করে হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ শাসনের বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এর আবেদন ও ভাবধারার পরিবর্তনের ইতিহাসও বিচিত্র।

বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারে কথকনৃত্যের যে নূতন রূপ তা

মূলতঃ শুদ্ধরূপ। ধ্রুপদ ও ধামার সঙ্গীতপদ্ধতিকে অনুসরণ করে নৃত্যসংগঠন রাজপুত এমনকি মুগল আমলেও প্রচলিত ছিল। স্বামী হরিদাস, সুরদাস, তানসেন, গোবিন্দস্বামী, নন্দুদাস প্রভৃতি প্রখ্যাত সুরকারদের রচিত সঙ্গীত এই নৃত্যের সাথে প্রযুক্ত হত। দধি, নাটুয়া, চারণ, কলাবন্ত, রসধারী প্রভৃতি বিভিন্ন নর্তক সম্প্রদায়ের মধ্যে কথক নৃত্যের এই শুদ্ধরূপ বিদ্যমান ছিল। হোলি উৎসবে অনুষ্ঠিত হত চর্চরী। ধামার তালে সংগঠিত এই নৃত্যছক শুদ্ধ কথক নৃত্যপদ্ধতির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সময় এই শুদ্ধ কথক নৃত্যের ধারা মন্দির ও ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই প্রবাহিত হত। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী 'নটনাট্যরসিকবর' নটবররূপে কল্পনা করা হত। কথক নৃত্য-পদ্ধতিতে এই নটবরী অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

মুসলমান আমলে মন্দির থেকে দরবারে আবির্ভাবের সাথে সাথেই কথক নৃত্যের গুণগত ও চরিত্রগত পরিবর্তন সূচিত হল। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে নৃত্যসম্প্রদায় ও নর্তকী ছিল কিন্তু মুসলমান আমলেই প্রথম নাচ ও নাচওয়ালী এই শ্রেণীর আবির্ভাব। একথা অনস্বীকার্য যে শিল্পসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান সম্রাটদের অবদান অসামান্য। মুসলমান সম্রাটগণ নৃত্যগীতের বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। কিন্তু তারা এর বিলাস ও মনো-বিনোদনের রূপটিকেই প্রধানভাবে দেখতেন। ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ও দার্শনিক রূপসম্পর্কে তাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। তারা পারস্য থেকে দরবারের প্রমোদানুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন পেশাদারী "নাচওয়ালী" সম্প্রদায় ভারতে নিয়ে আসেন। প্রধানতঃ হার্কেনিজ, ডোমনিজ, লোলনিজ ও হেঞ্জিনিজ এই চার সম্প্রদায়ের পেশাদারী নাচওয়ালী ভারতে আসে। এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় কথক নৃত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয় এবং পারসিক নৃত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে কথক নৃত্য নতুনরূপ ধারণ করে। স্বভাবতই এই পর্য্যায়ে কথক নৃত্য

ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ও দার্শনিক শুদ্ধ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিছক ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও যৌন আবেদনে পর্য্যবসিত হয় এবং নাচওয়ালীরা পেশাদারী গণিকা শিল্পীতে পরিণত হন।

ফরিস্তার বিবরণী থেকে জানা যায় দাস রাজবংশের রাজত্বকালে সুলতান বলবন (১২৬৬ খৃঃ—১২৮৬ খৃঃ) এর দ্বিতীয় পুত্র কারাখাঁন নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের একটি হারেম স্থাপন করেন। বাহমনীরাজ দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ (১৩৭৮ খৃঃ-১৩৯৭ খৃঃ) লাহোর, দিল্লী, পারস্য ও খোরাসান থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে সুন্দরী নাচওয়ালী সংগ্রহ করেন এবং তাদের নিয়ে বিলাসব্যসনে উন্মত্ত হয়ে রাজকার্যে অবহেলা করেন। এমনকি তার সময়ে রাজ্যের অমাত্য ও বিদ্বান মণ্ডলীও এই বিলাসিতার স্রোতে মগ্ন হন।

মুগল আমলেও নাচওয়ালী ও কথক নৃত্যের যে নতুন রূপ তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৫) আবুল ফজল রচিত "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে। এই গ্রন্থে নাটুয়া, সেজেতালি, কঞ্জরী, ভোগেলি প্রভৃতি নৃত্য-সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। দরবারের নাচের মধ্যে শুদ্ধ কথক নৃত্যের আবয়বিক ও আন্তর রূপের আমূল পরিবর্তন ঘটলেও বৈষ্ণব পদ্ধতির অবশেষ তখনো তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ "The Akhara is an entertainment enjoyed by the rich. The performers are dancing-girls. A set consists of four dancers, four singers and four instrument artists (who play the pakhawaj, owpunk, rabab and junter), and there are also two others who stand by with lighted torches."

এছাড়াও সাধারণ লোকের জন্যও পেশাদারী নটনটীরা পথে পথে ঘুরে নাচ গান করত। ঢাটী প্রভৃতি এই ধরনের নটচারণ সম্প্রদায়ের কথা "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে পাওয়া যায়। সঙ্গীত

ও নৃত্যের কিছু কিছু বিবরণ অল-বাদাওনী রচিত "মুন্তেখব উৎতওয়ারীখ্" গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইনিও সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। সুলতান মুহম্মদ আদিল নৃত্যগীতে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন এবং স্বয়ং তানসেন তার কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনিও কথক নৃত্যপদ্ধতিতে বিশেষ উৎসাহী ও দক্ষশিল্পী ছিলেন।

মুসলমান আমলথেকেই এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তনে এই সব অনেক শিল্পীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমীর, ওমরাহ, বিভিন্ন সামন্তরাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের অন্য দেশের রাজা ও আমীরদের 'নাচওয়ালী' উপঢৌকন দেবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

শুধুমাত্র মুসলমান দরবারেই নয় হিন্দুশাসকদের মধ্যেও এই নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের সমাদর ও প্রভাবের কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। মারাঠা শাসক ছত্রপতি শাহু (১৭০৭ খৃঃ—১৭২০খৃঃ) বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্দরী নাচওয়ালী প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করে 'নাচওয়ালী-মহল' স্থাপন করেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭২০ খৃঃ—১৭৪০ খৃঃ) এর রাজত্বকালে 'মস্তানা' নামে এক সুন্দরী নাচওয়ালীর পেশোয়ার জীবনে ও রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রেও অপ্রতিহত প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিং ও এই নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের একজন বিশেষ অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনিও কাশ্মীর, পারস্য, খোরাসান ও দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে দেড়শত সুন্দরী নৃত্যকুশলা নাচওয়ালী সংগ্রহ করেন। এদের মধ্যে 'লোটাস' নামে এক নাচওয়ালীর রণজিৎ সিং এর ওপর বিশেষ প্রভাবের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। রণজিৎ সিং লোটাসকে সাতখানি জায়গীর ও প্রচুর

ধনসম্পত্তি দান করেন।

এই সব দৃষ্টান্ত অনুসরণকরে দেশের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ভূস্বামী ও সামন্তরাজগণও নাচওয়ালী রাখতেন। রাজকর্মচারী ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যেও স্বভাবতই বিলাস ও প্রমোদের উপকরণ হিসাবে এই সম্প্রদায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে। পরবর্তীকালে এইসব নাচওয়ালীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রমজানী, মিরাশী, বাঈ, ডোমনী, খেলানী, নারীয়ালী, মস্তানী, ঝুমারী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়।

মন্দির ও ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ থেকে দরবার ও প্রমোদবিলাসের উপকরণে পরিণত হওয়া—এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই মানবমনের মহৎ আনন্দের উপকরণ কথিকাশ্রয়ী কথক নৃত্য দেহ-সর্বস্ব লীলা-বিলাসের উপকরণ হয়ে ওঠে। পূর্ববর্তী শুদ্ধ কথক নৃত্যের শাস্ত্রীয় আঙ্গিক, করণ ও অঙ্গহার সমৃদ্ধ ভাবব্যক্তির সুক্ষ্মতা, চারুতা ও রূপ-কল্পনার রসরঞ্জনার পরিবর্তে পারসীয় প্রভাবে রূপান্তরিত কথক নৃত্য পদ্ধতি শুধুমাত্র মনোবিনোদনের প্রকরণ হিসাবে এই নৃত্যের সৌন্দর্যপ্রসবিনী রূপকে স্থূলরঞ্জনা দ্বারা উত্তেজনা ও মনোরঞ্জক চমক্ সৃষ্টির উপকরণে পরিণত করে। কথকনৃত্যের গুণগত ও চরিত্রগত পরিবর্তনের এই ইতিহাস বিচিত্র ও অনুধাবনযোগ্য।

মন্দির থেকে দরবার—এই পরিক্রমায় কথকনৃত্য মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ এই তিনটি কেন্দ্রে ও হিন্দুরাজাদের আনুকূল্যে রাজস্থানে প্রধান শিল্পকলারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অবশ্য এই দুইস্থানেই আড়ম্বর ও বিলাসের প্রকরণরূপে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে আঙ্গিক ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে সামান্য প্রভেদ থাকলেও চরিত্রগত পার্থক্য ছিল না।

সাধারণভাবে কথক নৃত্যধারায় লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর এই দুটি ঘরানা প্রচলিত। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রখ্যাত কথক শিল্পী ঠাকুরপ্রসাদ লক্ষ্ণৌতে অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজিদ আলীসাহের

দরবারে প্রধানশিল্পী রূপে যোগদান করেন। তখন থেকেই লক্ষ্ণৌ ঘরানার সূচনা। অবশ্য অনেকের মতে ঠাকুরপ্রসাদের পিতা কত্থক-শিল্পী প্রকাশজী নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে যোগ দিয়ে লক্ষ্ণৌ-ঘরানার সূত্রপাত করেন। এরা 'রসধারী' সম্প্রদায়ের কত্থক শিল্পী এবং রাজস্থান থেকে (মতান্তরে এলাহাবাদ থেকে) লক্ষ্ণৌতে আসেন।

নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ নৃত্যগীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং ঠাকুরপ্রসাদের নিকট নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং দরবারে নবাবের পাশেই ঠাকুরপ্রসাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়। ঠাকুরপ্রসাদ শুধু-মাত্র একজন দক্ষশিল্পী ছিলেন না, নাট্যশাস্ত্রে তার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কথিত আছে তিনি নাট্যশাস্ত্রের একটি ভাষ্যরচনা করেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তার গৃহে অগ্নিকাণ্ডে এই গ্রন্থটি ভস্মীভূত হয়। ঠাকুর প্রসাদের তিনপুত্র বিন্দাদিন, কালকাপ্রসাদ ও ভৈরবপ্রসাদ। ঠাকুর-প্রসাদের ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদও নবাবএর দরবারে শিল্পীরূপে যোগদান করেন। বিন্দাদিন ও কালকাপ্রসাদ এই দুটি নাম কত্থক নৃত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এরা দুজনেই নবাব ওয়াজিদ আলীসাহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। দুই ভ্রাতাই দক্ষশিল্পী ও নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। বিন্দাবিন সুকবি ছিলেন এবং সঙ্গীতেও তার অসামান্য দখল ছিল, কালকাপ্রসাদ ছিলেন তালবাদ্যে অদ্বিতীয়। এই দুই ভাই একত্রে আজীবন কত্থকনৃত্যের কাব্যিক সুষমা, রূপকর্মের পুনরুজ্জীবন ও নতুন সৃষ্টিকর্মে গভীর নিষ্ঠা ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

বিন্দাদিন ছিলেন পরমবৈষ্ণব। কথিত আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নটবর নৃত্যলীলা প্রচারের আদেশ দেন। কত্থক নৃত্য পদ্ধতিতে তিনি কয়েকটি নূতন আঙ্গিক সংযোজন করেন। নৃত্ত প্রধান কত্থক নৃত্যধারায় বিন্দাদিন ভজন, ঠুংরি, দাদরা, কবিতা প্রভৃতি সহযোগে ভাবসমৃদ্ধ নৃত্যাংশ সংযোজনা করেন।

কথক।
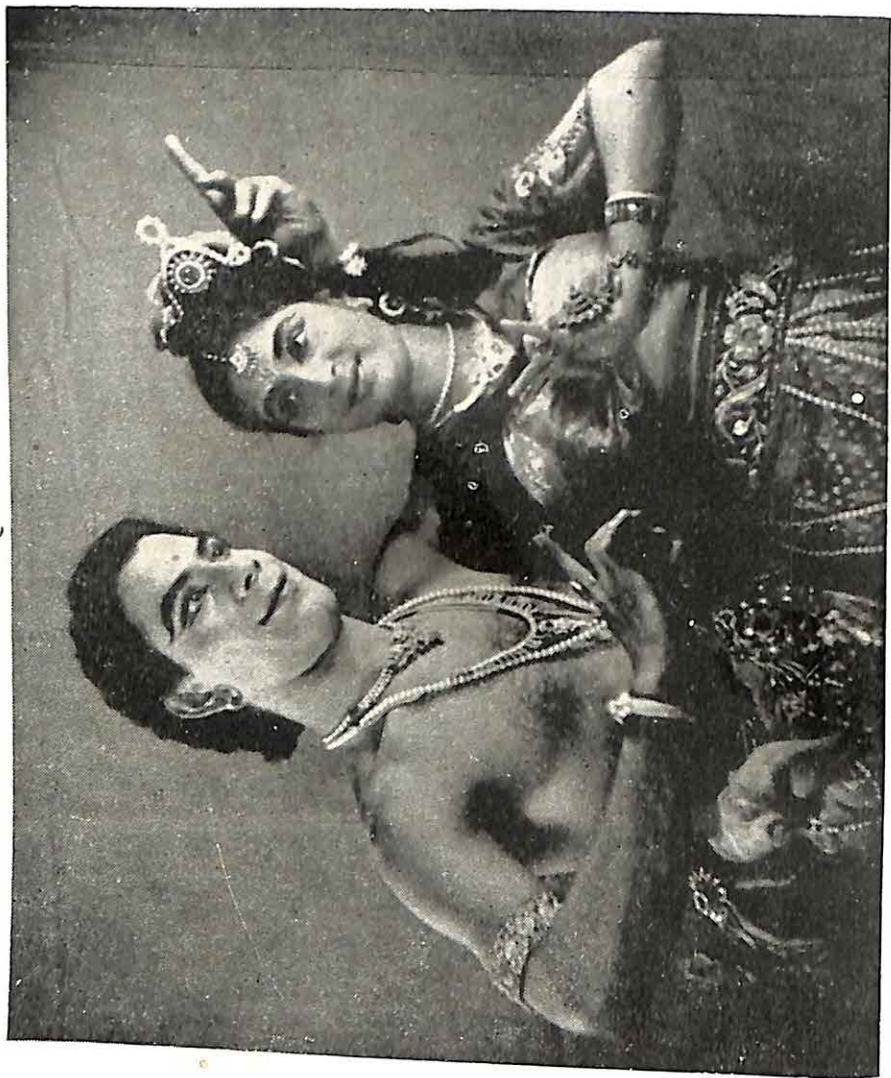
রবীন্দ্র নৃত্যধারা ।

কথক নৃত্যধারার উন্নতি ও প্রসারে নবাব ওয়াজিদ আলীশাহের অবদানও অসামান্য। নবাব সুকবি ছিলেন এবং সঙ্গীত ও নৃত্যে তার অসামান্য দখল ছিল। তিনি অত্যন্ত বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন। ছত্রমঞ্জিলে অনুষ্ঠানের জন্য তিনি চারশত সুন্দরী নর্তকী নিযুক্ত করেন। সেখানে দশদিন দশরাত্রি ধরে নৃত্যোৎসবের আয়োজন হত এবং সমাপ্তিতে নবাব স্বয়ং অংশগ্রহণ করতেন। অনেকের মতে সঙ্গীতে ও নৃত্যে ঠুংরী রীতির তিনিই প্রবর্তন করেন। কথক অনুষ্ঠানের জন্য তিনি অনেক সুললিত গীতি রচনা করেন। তার উৎসাহেই কথকনৃত্যে গজল ও ঠুংরীর প্রয়োগ হয়। এই শিল্পের প্রসারের জন্য নবাব অজস্র অর্থব্যয় করেছেন। ইংরাজ শাসকদের দ্বারা রাজ্যচ্যুত হয়ে যখন তিনি কলকাতায় আসেন তখনও তার বাৎসরিক ভাতার একটি প্রধান অংশ তিনি এর জন্য ব্যয় করতেন। নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু বিন্দাদিন ছিলেন ধর্মানুরাগী বৈষ্ণব। এই দুই বিপরীত ধর্মী প্রতিভার সংযোগে কথক নৃত্য এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। "রাধাকৃষ্ণলীলা" কাহিনী অংশে ভাবাভিনয় যুক্ত হল, অবশ্য লাস্য ভাবযুক্ত শৃঙ্গার রসই প্রধান স্থান অধিকার করল। আঙ্গিক এর জটিল নৈপুন্যের থেকে রস ও ভাবসৃষ্টি এবং রঞ্জনা নবাবের প্রিয় হওয়ায় লক্ষ্ণৌ ঘরানায় ভাবাভিনয় ক্রমশঃ একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে ওঠে। ঠুংরী, দাদরা ও গজল সহযোগে কথক নৃত্য পরিবেশন এজন্য অধিক জনপ্রিয় হয়।

বিন্দাদিন নিঃসন্তান ছিলেন। কালকাপ্রসাদের তিনপুত্র অচ্ছন মহারাজ, লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজ পিতৃব্য বিন্দাদিনের কাছে নৃত্যশিক্ষা করেন এবং পরবর্তীকালে যশস্বী শিল্পীরূপে পরিচিত হন। কথক নৃত্যে বিন্দাদিন এর পরে অচ্ছন মহারাজের অবদানই সর্বাধিক স্বীকৃত। অচ্ছন মহারাজের পুত্র বিরজু মহারাজ সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

কেবলমাত্র ভাবসমৃদ্ধ নৃত্যাংশ রচনা করাই লক্ষ্মৌ ঘরানার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়, ভাবাভিনয়ের নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি এই ঘরানার শ্রেষ্ঠ অবদান। লক্ষ্মৌ ঘরানায় নৃত্তাংশকেও অবহেলা করা হয়নি। বিভিন্ন তোড়া, টুকরা প্রভৃতিও এর নৃত্তাংশে প্রযুক্ত হয়। লক্ষ্মৌ ঘরানায় পাখোয়াজ এর পরিবর্তে তালযন্ত্র রূপে তবলার প্রচলন হয়।

জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানুজী শিবভক্ত ছিলেন। কথিত আছে তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে শিবতাণ্ডব নৃত্যশিক্ষা করেন। তার পুত্র মালুজী ও পৌত্র লালুজী ও কানুজীর মাধ্যমে বংশপরম্পরায় শিবতাণ্ডব নৃত্যের এই ঘরানা প্রচলিত থাকে। কানুজী বৃন্দাবনে গিয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন ও লাস্য ভাবযুক্ত 'রাধাকৃষ্ণলীলা' নৃত্য রচনা করেন। জয়পুর ঘরানার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে হরিপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, শ্যামলাল, হনুমানপ্রসাদ, জয়লাল, মোহনলাল, নারায়ণ-প্রসাদ, সুন্দরপ্রসাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সুন্দরপ্রসাদ জয়পুর ঘরানার ধারাবাহী হলেও লক্ষ্মৌ-এ গুরু বিন্দাদিনের কাছে শিক্ষা-গ্রহণ করেন।

জয়পুর ঘরানা রাজস্থানের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে গুণগত বিচারে ও উৎকর্ষে লক্ষ্মৌ ঘরানা অনেক সমৃদ্ধ। জয়পুর ঘরানায় আঙ্গিক সর্বস্ব জটিল তালগুচ্ছ রচনার দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়। স্বভাবতই ভাবাভিনয়কে প্রাধান্য না দেওয়ার ফলে সৃজনশীল নতুন রূপকর্মের গতি রুদ্ধ হয়। এর ফলে জয়পুর ঘরানার অনেক শিল্পী লক্ষ্মৌ ঘরানার প্রতি মনোযোগী হন। জয়পুর ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে অসংযত জীবনযাত্রা ও আরক ও মাদকদ্রব্যে আসক্তির ফলে এই ঘরানা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত।

অনেকে বেনারস ঘরানা বলে জানকীপ্রসাদ প্রবর্তিত কত্থক নৃত্যধারার উল্লেখ করেন কিন্তু এই পদ্ধতিও লক্ষ্মৌ ঘরানার

অনুরূপ। লক্ষ্ণৌ ঘরানার শিল্পীরাই কথক নৃত্যজগতে অধিক খ্যাতিমান। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে বিভিন্ন ঘরানার নৃত্যশৈলীর এই যে পার্থক্য সেটা ক্রমশঃ কমে আসছে। কারণ এই দুই ঘরানার সমন্বয়ের সাধনায় অনেক শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান-ব্রতী হয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশের রায়গড়ের রাজা পরমবৈষ্ণব চক্রধর সিংয়ের নাম কথক নৃত্যের পুনরুজ্জীবন ও উৎকর্ষের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। তিনি লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর এই দুই ঘরানারই সমন্বয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জয়লাল, অচ্ছন মহারাজ, মোহনপ্রসাদ, নারায়ণপ্রসাদ, দুই ঘরানার এই প্রখ্যাত শিল্পীরা তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছেন। রাজা চক্রধর সিং স্বয়ং অত্যক্ষ সুদক্ষ তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রখ্যাত যন্ত্রী ও বাদকদের তিনি রায়গড়ে নিয়ে আসেন। পরমবৈষ্ণব এই রাজার প্রাসাদের প্রায় সকল কক্ষেই নৃত্য ও গীতের অনুশীলন হত। তিনি গোপনে কথক নৃত্যের অনুশীলন করতেন। কথিত আছে একদিন যখন জয়লাল ও অচ্ছন মহারাজ বিভিন্ন গৎ সম্পর্কে আলোচনা করছেন তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের গাগরীভরণের একুশটি ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। বিস্মিত ও মুগ্ধ অচ্ছন মহারাজ রাজাকে নটবর কৃষ্ণের অবতার বলে আলিঙ্গন করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। শুধু কথক নৃত্যের ক্ষেত্রেই নয়, মার্গ সঙ্গীতের সকল ক্ষেত্রেই তার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

কথক নৃত্যানুষ্ঠানে শিল্পীর নির্দেশ অনুযায়ী সারেঙ্গী ও তবলা বা পাখোয়াজবাদক প্রথমে সুর সহযোগে লহরা বাদন করেন। এই রীতি থেকেই তালাশ্রয়ী নৃত্তপদ্ধতিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কথক নৃত্যে নৃত্তাংশ প্রধান। বহুবিচিত্র ছন্দপ্রয়োগে বিভিন্ন তালগুচ্ছ রচনা করে শোভাসম্পাদক রঞ্জনা সৃষ্টি করা নৃত্তাংশের প্রধান কাজ। সাধারণভাবে এই ছন্দপ্রয়োগগুলিকে 'বোল' বলা হয়।

নৃত্যসংগঠন ও প্রয়োগবৈচিত্র্য অনুসারে কথক নৃত্যধারার নৃত্তাংশে এগুলিকে সাধারণভাবে বারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। গণেশ বন্দনা, আমাডা, থাতা, নটবরী, পরমেলু, পারান, ক্রমলয়, কবিতা, তোড়া, টুকরা, সঙ্গীত ও পাধান—এই বারটি পর্যায়ে নৃত্তাংশ গঠিত হয়।

ভারতীয় নৃত্যে রঙ্গবিঘ্নশান্তির জন্য গনেশবন্দনা ও রঙ্গাধিদেবতা-স্তুতি অনুষ্ঠান আরম্ভের পূর্বে আচরিত হয়। শাস্ত্রমতে এই বন্দনা ও প্রার্থনা ব্যতীত যে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয় তাকে নীচনৃত্য বলে এবং এই নীচনৃত্য যারা দর্শন করে তারা বংশহীন হয় ও তির্য্যগ্-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। কথক নৃত্যেও এই গণেশবন্দনা অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় রীতি অনুসরণ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করে।

'আমাডা' শব্দটি পারসীয় ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ হল প্রবেশ। অর্থাৎ এই পর্য্যায়ে তালবাদ্য সমন্বয়ে নটবরী বোল সহযোগে শিল্পীর প্রাথমিক অনুষ্ঠান। আমাডা অনুষ্ঠানের আগে দেহভঙ্গির সুষম বিন্যাসকরণ পদ্ধতিটিকে 'থাতা' বলা হয়। এই অংশে শিল্পী তালসহযোগে দৃষ্টি, গ্রীবা ও শিরকর্মের প্রয়োগে বিভিন্ন ভঙ্গির সংকেত সৃষ্টি করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'নর্ত্তককূলচূড়ামণি নটবর'রূপে কল্পনা করা হয়। কথিত আছে কালীয়দমনের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন নৃত্য করেন তখন তা, থেই ও তাৎ এই ধ্বনিগুলির সৃষ্টি হয়। সেজন্য পরবর্তীকালে কথক নৃত্যগুরুরা এই ধ্বনিগুলি ও এই মূল ধ্বনিসম্ভূত ছন্দ সৃষ্টি করেন এবং এগুলিকে 'নটবরী' আখ্যা দেন।

'পরমেলু' শব্দের অর্থ বিভিন্ন ধ্বনির মিলনে ছন্দসৃষ্টি করা। এই অংশে ধ্বনিশিল্পের দুটি প্রধান অঙ্গ ছন্দ ও সঙ্গীতের বৈচিত্র্যপূর্ণ মিলন ঘটেছে। বিভিন্ন তালযন্ত্র সহযোগে বিভিন্ন ধ্বনিপ্রকৃতিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তরঙ্গিত করা হয়।

পাখোয়াজ-এর সাহায্যে গাম্ভীর্যপূর্ণ যে ধ্বনিসংগঠন তাকে

'পারান' বলে। 'ক্রমলয়' পর্য্যায়ে শিল্পী বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত ভেদে তালবাদ্যসহযোগে পাদকর্মের কুশলী প্রয়োগে চমক সৃষ্টি করেন। এই অংশে শিল্পীর আপন সামর্থ ও কুশলতা অনুযায়ী দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ আছে। এই অংশে বাঁধাধরা নৃত্যছক অতিক্রম করেও শিল্পী স্বাধীনভাবে নৈপুন্য দেখাতে পারেন।

'কবিতা' পর্য্যায়ে তালবাদ্যসহযোগে কবিতার আবৃত্তিতে সতর্কভাবে ও সুকৌশলে যুগ্মধ্বনির প্রয়োগ করে ছন্দ ও ধ্বনিকে তরঙ্গিত করা হয়। কবিতার ভাব বিভিন্ন ভঙ্গি ও অভিব্যক্তির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং পদদ্বয়ে তালরক্ষা করা হয়।

'তোড়া' ও 'টুকরা' হচ্ছে বিভিন্ন তালগুচ্ছ সমন্বয়ে ছন্দের বৈচিত্র সৃষ্টিকারী নৃত্তপদ্ধতি। বিভিন্ন বোলের সঙ্গীতরীতিতে পরিবেশন করার পদ্ধতিকে 'সঙ্গীতা' বলে। সাধারণতঃ কত্থক নৃত্যে গীতি সঙ্গীতকে অনুসরণ করে।

'পাধান' শব্দটি মূল সংস্কৃত শব্দ পাঠন থেকে উদ্ভূত। কত্থক অনুষ্ঠানে করতালি দিয়ে তাল নির্দেশ করে বোল আবৃত্তি করার পদ্ধতিকে পাধান বলে।

কত্থক নৃত্যধারায় নৃত্তাংশই প্রধান, এর নৃত্যাংশ সহযোগী সঙ্গীতের ধারা অনুযায়ী রচিত হয়েছে। ধ্রুপদ, ধামার, কীর্ত্তন, ভজন, ঠুংরি, দাদরা, গজল প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার সঙ্গীত সহযোগে নৃত্যাংশ রচিত হয়েছে এবং গীতিপদ্ধতি অনুযায়ী নামকরণ হয়েছে। স্বভাবতই নৃত্যাংশ ভাবাভিনয়যুক্ত সেজন্য মুদ্রাও প্রযুক্ত হয়েছে। অবশ্য অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার মত কত্থক নৃত্য বিভিন্ন হস্তের বাঁধাধরা নিয়ম নেই। শিল্পী অনেকক্ষেত্রেই অভিনয়ের উপযোগী হস্তপ্রয়োগ ভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীনভাবে করতে পারেন।

ধ্রুপদ, ধামার ও কীর্তন সহযোগেই কত্থক এর নৃত্যাংশ রচনার প্রথা প্রথমে প্রচলিত ছিল। এছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দ, সুরদাস, তুলসীদাস, মীরাবাঈ, কবির প্রভৃতির পদ ও ভজনের

সহযোগেও কথক এর নৃত্যাংশ রচিত হয়েছে।

মুসলমান দরবারে এসে যুক্ত হল ঠুংরী, দাদরা ও গজল। রাধা-কৃষ্ণলীলা কাহিনী সহযোগে ভাবাভিনয় প্রধান নৃত্যাংশে গাগরী, পনঘট, যমুনাতট, কালীয়মর্দন প্রভৃতি রূপায়িত হয়। নায়িকাভেদ অনুযায়ী ভাবাভিনয় কথক এর নৃত্যাংশে রূপায়িত হয়।

কথক নৃত্যে মুসলমান আমলে ভাবাভিনয় প্রধান বিভিন্ন নৃত্যাংশ রচিত হয় এবং নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ ও বিন্দাদিন শাস্ত্রীয় অঙ্গহারগুলির সমধর্মী বিভিন্ন ভঙ্গি (গৎ) রচনা করেন। হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে রচিত এই ভঙ্গিগুলির সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় না, তবে 'মদন-অল-মাশুকী', 'শাত-অল-মুবারক, 'নাজমল-অল-হিন্দ' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে এই ভঙ্গিগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। পরী, সালামি, ফরিয়াদ, মুকুট, অঞ্চল, মুস্করাতি, মুয়াদ্দব, হাস্ন্, ঘুংঘট, মেহবুব, নাজ, গমজা, আদা, কৃষ্ণকানাইয়া গত্, মেহবুবা, জাহু, বার্ক প্রভৃতি ভঙ্গিগুলি হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের স্বাক্ষর বহন করে। বহু ভঙ্গিতেই নামকরণে ও প্রদর্শনরীতিতে ইসলামীয় প্রভাব, আবার বিভিন্ন হস্ত ও অঙ্গসঞ্চালনে শাস্ত্রীয় মুদ্রা ও অঙ্গহারের সাদৃশ্যও চেখে পড়ে।

তাণ্ডব ও লাস্য ভাবযুক্ত কথকনৃত্যে সারেঙ্গী, হারমোনিয়ম, তবলা, পাখোয়াজ, রবাব প্রভৃতি যন্ত্র আবহসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন সময়ে এই নৃত্যধারার পরিবর্তনের সাথে সাথে পোশাক ও অলঙ্কারেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সাধারণভাবে উত্তর ভারতের দরবারী পোশাক প্রচলিত।

কথক নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে দুটি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথমত কথক মূলত তালাশ্রয়ী নৃত্য এবং দ্বিতীয়ত এই নৃত্যে শিল্পীর বাঁধাধরা নৃত্যছক অতিক্রম করে নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রায় অবাধ স্বাধীনতা আছে। একথাও মনে রাখা দরকার যে কথক নৃত্যধারা বর্তমানে যে রূপ ও রীতিতে প্রচলিত, এই নৃত্যের প্রাচীন

ধারার সাথে তার গুণগত ও চরিত্রগত প্রভেদ ঘটেছে।

কথক নৃত্যপদ্ধতি ব্যালে ও নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন চরিত্রের প্রবেশ ও প্রস্থানের সময়) নাটকীয় চমক সৃষ্টি করার পক্ষে যথাযথ প্রযুক্ত হলে বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারে। এই নৃত্যপদ্ধতি যখন গত শতাব্দীতে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হয়েছে (যা ভারতের আর কোন মার্গনৃত্যধারায় হয়নি), তখন বর্তমানকালেও এই নৃত্যপদ্ধতিকে সংস্কৃত ও প্রদর্শনরীতিতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার অবকাশ আছে।

সাম্প্রতিককালে কথক নৃত্যধারার গবেষণা ও শিল্পকর্মে স্বর্গতা শ্রীমতী মেনকার অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতের নৃত্যশিল্পীদের ধ্যে শ্রীমতী মেনকার মত প্রকৃত বিদূষী কলাবতী মহিলা বিরল। ভারতীয় পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ ব্যালে প্রযোজনার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বরিশালের এক কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম। লরেটোতে শিক্ষা লাভকরার পর তিনি ইংল্যণ্ডে শিক্ষাগ্রহণের জন্য যান, এবং বেহালাবাদনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে ভারতীয় নৃত্যের গভীরতা তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সীতারাম মিশ্র, গুরু করুণাকর মেনন, নবকুমার সিং, কৃষ্ণকুট্টি, রামনারায়ণ মিশ্র, বিপিন সিং, দময়ন্তী, শিরীফ ভাজিফদার প্রভৃতির সহযোগে তিনি নৃত্যসম্প্রদায় গড়ে তোলেন এবং ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করেন। শ্রীমতী আনা পাভলোভা মেনকার নৃত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। শ্রীআনন্দকুমার স্বামীর সহযোগিতায় কথক নৃত্য সম্পর্কে তার মূল্যবান গবেষণা জাতির সম্পদ। ::৪৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী মেনকা পরলোকগমন করেন। বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় এই বিরল মহিলাশিল্পীর গবেষণা ও প্রযোজিত শিল্পকলা সম্পর্কে অনুশীলন বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমানে কথক নৃত্যধারার লক্ষ্ণৌঘরানার উত্তরসাধকদের মধ্যে

শ্রীবিরজু মহারাজের অবদান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মাত্র দশবছর বয়সে পিতা প্রখ্যাতশিল্পী অচ্ছন মহারাজের মৃত্যুর পর তিনি লচ্ছু মহারাজ ও শম্ভু মহারাজের নিকট নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। শৈশবেই তালবাদ্যে তার অপূর্ব দক্ষতা প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে তিনি তবলা ও পাখোয়াজ বাদনে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেন। বিভিন্ন নৃত্যাংশে তালবৈচিত্র্য সৃষ্টিতে তার সমতুল্য শিল্পী বিরল। কথক নৃত্যপদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ ব্যালে রচনা করার প্রয়াসে গত কয়েক বছর ধরে তিনি আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর প্রযোজিত 'মালতী মাধব', 'কুমার সম্ভব', 'ফাগলীলা', গোবর্ধনলীলা' ও নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের স্মৃতিতে 'অযোধ্যার নবাব' প্রভৃতি ব্যালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিন্দাদিন মহারাজ ও অচ্ছন মহারাজের সার্থক উত্তরসাধক বিরজু মহারাজ বর্তমানে দিল্লীতে কলাকেন্দ্রে প্রযোজনা ও অধ্যাপনায় ব্রতী আছেন।

সাম্প্রতিককালের কথক শিল্পীদের মধ্যে গোপীকৃষ্ণ, শ্রীমতী সিতারা, দময়ন্তী যোশী, রামগোপাল, শোহনলাল, শ্রীমতী বেলা অর্ণব, চিত্রেশ দাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লোকনৃত্য

১৪

লোকনৃত্য

সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই আদিম জীবনে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বিশ্বছন্দের চাঞ্চল্যে, জীবনছন্দের স্বতস্ফূর্ত আবেগে কখন ও শিকারের উন্মাদনা জাগাতে, কখনও অপদেবতাকে তুষ্ট করতে উৎপ্লাবনপূর্ণ সহজ আনন্দে মানুষ দলগতভাবে রচনা করেছে নৃত্যছন্দ। স্বাপদসঙ্কুল আরণ্যক পরিবেশে প্রথম পর্যায়ে নৃত্যভঙ্গী ছিল হিংস্র, আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষাত্মক উৎপ্লাবনে পূর্ণ। সমতল ভূমিতে নেমে এসে সেই মানুষ যখন ঘর বাঁধল, শিখল চাষ আবাদ, তখন সঙ্ঘবদ্ধ হল, সমাজবদ্ধ হল। নৃত্যছন্দের আবয়বিক ও আন্তর রূপেরও এল পরিবর্তন ; নতুন সামাজিক পরিবেশে জীবনচর্যার অঙ্গরূপে মধুর, বলিষ্ঠ ও সরল ভঙ্গীতে এল লোকনৃত্য।

লোকনৃত্য এই সংহত সমাজেরই সৃষ্টি। অনেকে আদিম নৃত্য (Primitive Dance) ও লোকনৃত্য (Folk Dance) কে একই পর্যায়ে ফেলেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। আদিম সমাজ থেকে উন্নত ও অগ্রসর সমাজ অর্থাৎ যে সমাজে বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত আচার আচরণ, সংস্কার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও জীবন অভিব্যক্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে ; লোকনৃত্য সেই সংহত, উন্নত সমাজের সৃষ্টি।

আদিম সমাজে নৃত্যের জন্ম হয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রেরণায়। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির সাথে সাথে সংহত সমাজে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা যেমন দীপ্ত হয়েছে তেমনি আবার সামাজিক সম্বন্ধগুলির মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারফলেই প্রত্যেক শিল্পরূপই স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট চরিত্র অর্জন করেছে। জন্ম নিয়েছে আদিম নৃত্য থেকে লোকনৃত্য।

লোকনৃত্যে আদিমনৃত্যের ব্যবহারিক তাৎপর্য পুরোপুরী বজায় না থাকলেও সমষ্টিগত আবেগ প্রকাশের ধারা অবিকল অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। আদিম নৃত্যের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক রূপটি ক্রমশঃ লোকনৃত্যে এসে প্রতীকধর্মী হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে আদিম আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব অনেকাংশেই বিদ্যমান, কিন্তু সংহত সমাজের দৃঢ়ভিত্তির জন্য তার মধ্যে লৌকিক উপকরণের ক্রমশ আবির্ভাব ঘটেছে। এককথায় বলা যেতে পারে সংহত সমাজে সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় জীবনছন্দের রূপসৃষ্টিশক্তির স্বতস্ফূর্ত অবারিত প্রকাশ হচ্ছে লোকনৃত্য। পরে অঞ্চল ও রুচিভেদে এল বৈচিত্র, সৃষ্টি হল লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারা।

লোকনৃত্য সামগ্রিক সমাজের সৃষ্টি কারণ সংহত সমাজের সকল সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবই দলগতভাবে পালন করা হয়। সুতরাং সাধারণভাবে লোকনৃত্যকে "collective creation of the folk" এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যদিও সাধারণ ভাবে লোকনৃত্যে ব্যক্তি প্রতিভা অস্বীকৃত তবুও অনেকে বলেন ইহা ব্যক্তি চেতনার কোন স্বাক্ষর বহন করে না এ কথা সর্বাংশে ঠিক নয়, তবে ব্যক্তি চেতনা সম্প্রদায়গত সৃষ্টির মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

শাস্ত্রীয় নৃত্যধারা উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি। লোকনৃত্যের আঙ্গিক রূপান্তরিত ও শোধিত হয়ে উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় নৃত্যের উদ্ভব হয়েছে। শার্ঙ্গদেব এর মতানুসারে আহার্যাভিনয় বর্জিত আঙ্গিক, বাচিক ও

সাত্ত্বিক অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নর্তনকে 'মার্গ' বা শাস্ত্রীয় নৃত্য বলা যায়। এবং আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য এই চতুর্বিধ অভিনয় বর্জিত গাত্রবিক্ষেপকে দেশী (folk) নৃত্ত বলে। অবশ্য প্রচলিত অনেক লোকনৃত্যের ক্ষেত্রেই এই সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীর নৃত্যের পার্থক্য সম্পর্কে "Folk Dances of India" গ্রন্থের ভূমিকায় সুন্দর আলোচনা আছেঃ "The difference between folk dancing and classical dancing, of which the former is the mainspring, is largely one of attitude. There is no deliberate attempt at artistry in the folk dance. The very existence of the dance is adequate justification for it, unless it be the pleasure of the dancers. No audience, in the usual sense of the term, is implied, and those who gather round to watch are as much a part of the collective self-expression as the dancers themselves. Moreover, the concept of the 'portraying' emotion is generally speaking, foreign to the folk dance inasmuch as what is expressed is natural and original. What is inportant is not the grace of the individual dancer or virtuosity of the isolated pose, but the total effect of overwhelming buoyancy of spirit, and the eloquent, effortless ease with which it is expressed. It is clear, therefore, that here the question of a cleavage between the entertainer and the entertained does not arise as in the more sophisticated classical dance-forms."

শিল্প বিষয়ে স্রষ্টা যখন আত্মসচেতন হন তখনই উচ্চতর শিল্পের সৃষ্টি হয় এবং যখনই নৃত্যে এই আত্মসচেতনতা আসে তখনই তাহা লোকনৃত্যের গণ্ডী অতিক্রম করে শাস্ত্রীয় নৃত্যে পরিণত হয়। শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় সেজন্য ব্যক্তি প্রতিভার অবদানই অধিক স্বীকৃত। সচেতন মনের প্রথাপুষ্ট রুচি ও রূপায়ণ ধারা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিক, রূপবন্ধ ও প্রয়োগরীতিতে সেজন্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। অবশ্য এই সকল শাস্ত্রীয় নৃত্যই বিভিন্ন আদিবাসী, প্রান্তিক উপজাতি ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্যকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখতে হবে যে পরবর্তীকালে শাস্ত্রীয় নৃত্যের আঙ্গিকে পুষ্ট ও অলঙ্কৃত হয়েও অনেক লোকনৃত্যের রূপবন্ধ ও নৃত্যকল্পনা রচিত হয়েছে। কারণ লোকনৃত্য সক্রিয় প্রাণশক্তির অধিকারী।

উন্নত সভ্যতর সমাজে রূপান্তরিত ও সমৃদ্ধ আঙ্গিকপুষ্ট হলেও এর স্বতস্ফূর্ততা ও সৌন্দর্য দলগত অনুষ্ঠানে গোষ্ঠীজীবনের কেন্দ্রগত ভাবটিকে অক্ষুণ্ণ রাখে। লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে এই বিখ্যাত উক্তিটি লোকনৃত্য সম্পর্কেও বিশেষ প্রযোজ্য: "It is like a forest tree with its root deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leaves, new fruits."

প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীজীবনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্মরণাতীত কাল থেকেই পুরুষানুক্রমে তাদের মধ্যে লোকনৃত্যের বিভিন্ন ধারা চলে আসছে। ঠিক কোন সময় এগুলির উৎপত্তি বা কারা এর স্রষ্টা সঠিকভাবে তা নির্ণয় করার কোন উপায় নেই। এগুলি যুগ যুগ ধরে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির যৌথ উত্তরাধিকার রূপে প্রবহমাণ এবং সমাজের সমবেত সৃষ্টি রূপে বিবেচিত। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে নব নব আঙ্গিক ও রূপকর্মে সমৃদ্ধ হয়ে এই সকল লোকনৃত্যের অনেক ধারাই নব পল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠেছে।

আবহমানকাল প্রচলিত লোকনৃত্যের এই প্রবাহই দেশের শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার মূল উৎস। অবশ্য শাস্ত্রীয় নৃত্যধারায় লোকনৃত্যের পূর্ণ প্রকাশ সম্ভবপর নয়, সেজন্য এর আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও শোধিত রূপ ধারণ করে।

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লোকনৃত্য ধারায় নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রচলিত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের মধ্যে অনেকসময় বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকক্ষেত্রে এই সব জনসমষ্টির পরস্পরের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অতীত যোগাযোগের সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই সংযোগ না ঘটলেও সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এ বিষয়ে গবেষকদের মত এই যে অনুরূপ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবমন একইভাবে চিন্তা করে ও শিল্পসৃষ্টি করে; পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে লোকনৃত্য ও লোকসংস্কৃতির বিস্ময়কর সাদৃশ্যের এও অন্যতম প্রধান কারণ।

লোকনৃত্যের মধ্যে ধর্মীয় ধারণা, কাব্যময় কল্পনা, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের মূলে আদিম মানুষের ইচ্ছাপূরণের আকাঙ্খা, ব্যবহারিক প্রয়োজন প্রভৃতির ভূমিকা স্পষ্ট প্রতিফলিত। একথা সত্য যে বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠী সমাজবিকাশের প্রক্রিয়ার অনুরূপ স্তরগুলির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয় বলেই লোকনৃত্যে এখনও আদিমযুগে প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারের অবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে উপজাতির লোকনৃত্যের মধ্যে এই লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট।

লোকনৃত্যের মধ্যে পুরাতন যুগের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায় একথা সত্য, কিন্তু এ শুধুমাত্র পুরাতনের প্রতিচ্ছবি নয়। চলমান জীবনের ছন্দে সমসাময়িক সমাজজীবন ও ইতিহাসের প্রবাহ লোকমানসের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে লোকনৃত্যে শিল্পায়িত হয়েছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে বিভিন্ন লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের কিছু প্রয়াস সূচিত হলেও এ বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা ও তত্ত্বগত বিশ্লেষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। কারণ লোকনৃত্যের

ধারা শুধুমাত্র স্মৃতিচারণ বা সংগ্রহশালার বিষয় নয়; এই শিল্পকলা অতীতেও যেমন সমাজজীবনের আশা আকাঙ্খাকে ব্যক্ত করেছে, তেমনই উপযুক্ত অনুশীলনে ও লালনে মহাভবিষ্যত রচনার ভূমিকাও গ্রহণ করতে সক্ষম।

ভারতীয় গ্রামীন লোকনৃত্যের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে কি নিবিড় সংযোগ ছিল শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন : "ভারতীয় গ্রামীন-নৃত্যের মধ্যে প্রধান ও সবচেয়ে বেশী প্রচলিত হোলো দলবদ্ধ সামাজিক নৃত্য। মানুষ চায় জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে, তেমনি মানুষের সমষ্টি যে সমাজ সেও চায় নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে। সমাজের সুন্দর হওয়ার অর্থ হলো বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করা, নানা বিপরীতগামী মনোবৃত্তিকে একটি ছন্দোময় শৃঙ্খলার মধ্যে গ্রথিত করা। একত্রে এক গ্রামে বাস করতে হলেও মানুষকে অনেক রকম নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। এমনকি গ্রামের বাসস্থানগুলিকে, চলাফেরার রাস্তাঘাটকে এমনভাবে সাজাতে হয় যেন সমগ্র গ্রামরচনার মধ্যে একটা ছন্দ থাকে। কোথাও যেন বিরোধ না দেখা যায় কোন দিক থেকে। সমাজের ঐ বস্তুর মধ্যে ঐক্য রচনার প্রধান ও সুন্দর উপায় হোলো নৃত্যগীতবাদ্য। সেই জন্যেই সামাজিক নাচ হোলো সমাজকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার একটি প্রধান অবলম্বন। সামাজিক নৃত্যের এই হোলো প্রকৃত উদ্দেশ্য। ভারতের পল্লীগ্রামে এর কাজ আরো সার্থক হয়ে মানবসমাজের কল্যাণকে পরিস্ফুট করেছে।"

লোকনৃত্যের এই ভূমিকা অবশ্য ইংরাজশাসনের নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ও অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হল। কারণ উনবিংশ শতকের নবজাগৃতির প্রেরণা মূলতঃ ইউরোপ থেকে এসেছে; গ্রামীন জীবনের ভাবচৈতন্যের সঙ্গে তার যোগ ছিল না। স্বভাবতই গ্রামগুলি এই নতুন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হল না এবং তার ফলে নগর ও গ্রামজীবনের সংস্কৃতির কোন

যোগ বজায় রইল না। ভারতের লোকনৃত্যের বলিষ্ঠ মাধুর্য, সহজ ভাবুকতা, শ্যামস্নিগ্ধ পরিপূর্ণ প্রাণময়তার উৎস কৃষিনির্ভর পল্লীজীবনে। এই কৃষিনির্ভর জনসাধারণের কাছে নগরকেন্দ্রিক নতুন শ্রেণীর বস্তুবিচ্ছিন্ন নিরবয়ব মননশীল শিল্পপ্রচেষ্টার কোন সেতুবন্ধ গড়ে উঠল না। ফলে স্বভাবতই গ্রামীন লোকনৃত্যধারার নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা ব্যহত হল।

লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবনের নামে শহরে বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা পরিবেশন করেন তা লোকনৃত্যের বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকনৃত্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক স্বকীয়তার দিকে দৃষ্টি না রেখে আধুনিক মনের উপযোগী বহিরঙ্গ আঙ্গিক সমৃদ্ধ এই তথাকথিক লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক, কৃত্রিম ও স্বতস্ফূর্ততাবর্জিত। ফিল্মে, মঞ্চে, লোকনৃত্যের বলিষ্ঠ উৎপ্লাবন ও সৌন্দর্যকে মনোরঞ্জনের প্রকরণ রূপে প্রয়োগ করতে গিয়ে তা অনেক ক্ষেত্রেই শালীনতার সীমা অতিক্রম করে রস-বিকৃতির নিদর্শন হয়ে উঠছে।

লোকনৃত্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার জন্য বহু কৃত্রিম ও হাস্যকর প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে লোকসঙ্গীতে 'হারমোনাইজেশন' বা স্বরসঙ্গতির যৌথ প্রয়োগের অত্যাচারে ও লোকনৃত্যে স্বতস্ফূর্ততার পরিবর্তে আধুনিক রূপবন্ধ ও কল্পিত নৃত্যছক রচনা করে বৈচিত্র্য আনার যে অপপ্রয়াস সূচিত হয়েছে তা সত্যই বেদনাদায়ক।

লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবন বা তার সম্পর্কে গবেষণা করতে গেলে প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা দরকার। শুধুমাত্র তত্ত্বনির্ভরতা থেকে লোকসংস্কৃতিচর্চা সম্ভবপর নয়, তার জন্য তথ্যনির্ভরতাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রচলিত লোকনৃত্যের ধারা সম্পর্কে অনুশীলন করতে গেলে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী বা সমাজজীবনের ধারাটিকে বুঝতে হবে : প্রচলিত সংস্কার, প্রথা ও সামাজিক ও ধর্মীয়

অনুষ্ঠানগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, তা না হলে লোকনৃত্যের মৌলিক শুদ্ধরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্বদেশ ও সংস্কৃতির বিশিষ্ট ভাবধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে জাতীয় সংহতি রচনার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত এর নতুন ভূমিকা রচনা করা একান্ত প্রয়োজন। জাতির শতকরা নব্বই জন গ্রামের অধিবাসী কাজেই বৃহত্তম শক্তি সেখানেই সংহত। সেই শক্তিকে জাতিগঠন ও বিভিন্ন সৃষ্টিমূলক প্রয়াসে উদ্বোধিত করার প্রধান মাধ্যমই হচ্ছে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত। কাজেই শুধুমাত্র জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুরাতন মূল্যবোধগুলির পুনরাবিস্কারের জন্য নয়,—জাতির ভবিষ্যত রচনার জন্যও লোকনৃত্যের প্রসার ও নবমূল্যায়ণ একান্ত প্রয়োজন।

সাধারণভাবে লোকনৃত্যকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (১) বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে পালনীয় গোষ্ঠীনৃত্য (২) বংশগত ধারাবাহী বিভিন্ন পরিবার বা সম্প্রদায়ের নৃত্য--যা জন্ম, বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়, (৩) উপজাতীয় জনসমষ্টির লোকনৃত্য যা প্রাচীন যাদুতান্ত্রিক প্রথাপুষ্ট। প্রয়োগ অনুযায়ী অবশ্য লোকনৃত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে লোকধর্মী স্বতস্ফূর্ত গোষ্ঠীনৃত্য। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে পুষ্ট নাট্যধর্মী লোকনৃত্য দেখা যায়।

বারো মাসে তের পার্বনের দেশ বাঙলা দেশেও লোকনৃত্যের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। সম্প্রদায়গত লোকনৃত্যের মধ্যে বাউল নাচ ও ত্রিনাথের নাচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধর্মের সাধনরীতির সমন্বয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উদ্ভূত এই বাউল সম্প্রদায়ের নৃত্য শান্ত মধুর রসের দ্যোতনায় ভাবরূপায়ণের অপূর্ব নিদর্শন। বাউল সম্প্রদায়ের নৃত্য লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত হলেও এর বিনিয়োগ ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের রীতি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বাউল নৃত্যেও উচ্চাঙ্গ নৃত্যের মত নৃত্য ও নৃত্ত এই দুইএরই প্রয়োগ আছে।

গানের সাথে ভাবরূপায়ণের সময় নৃত্যাংশ ও গানের বিরতিতে একতারা বা দোতারা সহযোগে নৃত্তাংশের প্রয়োগ হয়। দেহতত্ত্ব, গুরুবাদ, সাধন রহস্য প্রভৃতি বিষয়ক গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকাশ করার জন্য বাউল নৃত্যে যে সব অঙ্গাভিনয় প্রযুক্ত হয় তার মধ্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাদকর্ম, শিরকর্ম, গ্রীবাভেদ, অক্ষিকর্ম ও বিভিন্ন গতি ও ভ্রমরীর সাদৃশ্য দেখা যায়।

ধর্মানুসরণের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত লোকনৃত্যের মধ্যে গাজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণত চৈত্রমাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজনের দেবতা শিব। বিভিন্ন দেবদেবীদের বেশে নৃত্য, সঙ-এর নাচ, মুখোস নাচ, দশাবতার, কালীকাচ, তামাসামূলক ঘোড়া নাচ, বুড়াবুড়ীর নাচ, পরী নাচ প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। এই সব নাচের অধিকাংশেরই নৃত্যছকের কোন বাঁধাধরা রূপ নেই। ঢাকের বাজনার সঙ্গে এই নাচে উৎপ্লাবনেরই প্রাধান্য। অবশ্য কালীকাচ নৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্য আঙ্গিকের কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গম্ভীরা উৎসবেও নাচগানের মাধ্যমে শিবের বন্দনা করা হয়। শিবকে উপলক্ষ্য করে নিজেদের সুখদুঃখ জানাবার ছলে সারা বছরের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক সমালোচনা নাচ গানের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। গম্ভীরা উৎসবে মুখোস নৃত্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়, সমগ্র মালদহ জেলায় গম্ভীরা অনুষ্ঠান বিশেষ জনপ্রিয়।

'আলকাপ' গান ও নাচে গম্ভীরার মত শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সামাজিক দুর্নীতির সমালোচনা করা হয়। অবশ্য আলকাপের ব্যাখ্যান ও প্রয়োগপদ্ধতি স্থূল ও অনেকক্ষেত্রে শালীনতাবর্জিত। আলকাপে মুখোস নাচের প্রচলন নেই।

দশাবতার নৃত্য সাধারণতঃ স্বাভাবিক বেশভূষা পরেই অনুষ্ঠিত হয়। দশাবতার গানের সাথে নৃত্যনাট্যের আকারে অনুষ্ঠিত এই নাচেও কিছু কিছু শাস্ত্রীয় ও তান্ত্রিক মুদ্রা ও করণের প্রয়োগ দেখা যায়।

এই সব লোকনৃত্যে ধর্মমত, রাজনীতি, সমাজনীতির অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। উৎসবের দেবতা শিব অথচ গম্ভীরা, আলকাপ প্রভৃতিতে মুসলমান শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করে। সংলাপে, গানে, অভিনয়ে, নাচে, নানাভঙ্গীতে লোকনৃত্যের বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবগুলিকে কেন্দ্র করে কালিকাপাতারী, ধাইচণ্ডীর নৃত্য, গৃধিনীবিশাল নৃত্য, শবখেলা নৃত্য, রাবণকাটানৃত্য প্রভৃতি বহু বিচিত্র লোকনৃত্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

বীর, রৌদ্ররসাত্মক রণনৃত্যের ধারাও লোকনৃত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। ঢালি নৃত্য, রায়বেশে, পাইকান প্রভৃতি নৃত্য শক্তিচর্চার মাধ্যম ও প্রদর্শনীর অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল। মাথায় লাল কাপড়, পরণে মালকোচা, হাতে ঢাল ও বল্লম নিয়ে ঢালী নাচে তিন জনকে নিয়ে দল গঠন করা হয়। দুই দলে প্রদর্শনীমূলক নৃত্য চলে। এক সময় বাংলাদেশের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢালী নৃত্যের বিশেষ প্রসার ছিল। পাইকান নৃত্যে হাতে লাঠি থাকত। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে এই নৃত্যের প্রচলন ছিল। বীরভূমের রায়বেশে নৃত্য গতির উদ্দামতা ও বলিষ্ঠতার সমন্বয়ে ঢাক ঢোলের বাজনার তালে তালে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে।

লোকনৃত্যের আর একটি ধারা বাংলা দেশে মেয়েদের ব্রতকথা, বিবাহ উৎসব, বিভিন্ন স্ত্রী আচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রবাহিত। এই লোকনৃত্যের ছন্দ যেন বন্য সৌন্দর্যে সুরভিত। নদী যেমন আপন আবেগে কলকল স্বরে ছন্দ সৃষ্টি করে, বনফুল যেমন আপন খুশীতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, মেয়েলী উৎসব ও ব্রতপার্বনকে কেন্দ্র করে তেমনি বহু বিচিত্র লোকনৃত্য রচিত হয়েছে। ফসল বোনা ও তোলার সময়ে, ঋতু উৎসবে, গ্রামদেবতার পূজায়, পুত্র-কন্যার জন্ম ও বিবাহে, শান্তিস্বস্ত্যয়ণে ও বিভিন্ন মঙ্গলসূচক গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে এই সব লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হত।

ভাদ্র ও পৌষ মাসে ফসল ওঠার সময়ে গ্রামে আনন্দের সাড়া পড়ত ও তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হত। ভাদু ও টুসু পরবে এখনো এর ধারা বজায় আছে। ভাদু ও টুসু পরবে অবশ্য গানের অংশই প্রধান তবে স্বতস্ফূর্ত ভঙ্গীতে এর সাথে আনন্দসূচক নাচও প্রচলিত।

পুরুলিয়া অঞ্চলে প্রচলিত ছৌনৃত্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেল্লা অঞ্চলের ছৌনৃত্যের সাথে বাংলা দেশের ছৌনৃত্যের পার্থক্য আছে। বাংলা দেশে ছৌনৃত্যের ধারা বহু প্রাচীন। সেকালে সাধারণত নাচ, গান ও অভিনয় একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। নৃত্যাভিনয়ে 'পাত্র নৃত্য' ও 'প্রেরণ নৃত্য' এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পাত্র নৃত্যে বিভিন্ন চরিত্রের উপযোগী মুখোস সাজসজ্জা ব্যবহার করা হত এবং প্রেরণ নৃত্যে স্বাভাবিক বেশভূষা ব্যবহার হত। ছৌনৃত্যে পাত্র নৃত্যের পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন মুখোস ও অঙ্গসজ্জা, বিচিত্র অলঙ্কার ব্যবহার করা হয়। ছৌ নৃত্য বছরে যে কোন পালপার্বন উপলক্ষেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাজনের সময়েই বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাচের সময় কোন গান থাকে না, আবহসঙ্গীতে ঢাক, ঢোল, কাঁসর প্রধান। নারীচরিত্রে পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে। এই ধরণের নৃত্য ও মূকাভিনয়কে পতঞ্জলি তার মহাভাষ্যে 'শৌভিক' আখ্যা দিয়েছেন। সেজন্য অনেকে বলেন যে ছৌ শব্দটি 'শৌভিক' থেকেই উদ্ভূত।

প্রেরণ নৃত্য পদ্ধতি অনুযায়ী পুতুলনাচের ধারাটিও বাংলাদেশে বহুকাল থেকে প্রচলিত। সেকালে পাত্রপাত্রীর পঞ্চালিকা বা পুতুলরূপ-এর নাচের রীতি ছিল। সংস্কৃতে 'পঞ্চাল্লিকা' শব্দের অর্থ কাঠ, কাপড়, হাতির দাঁত, চামড়া প্রভৃতির দ্বারা তৈরী পুতুল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে সঙ্কলিত 'বৃহৎ ধর্মপুরাণ'-এ পাঞ্চালী

নৃত্যগীতের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমানে যে পুতুলনাচের ধারা প্রচলিত তাতে পুতুলগুলি দু'ফুট থেকে আড়াই ফুটের মত উচ্চ, এদের হাত, মুখ ও পায়ের সঙ্গে কালো সুতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পুতুল নাচানোর জন্য একজন আলাদা লোক নির্দিষ্ট থাকে, সে পরদার আড়াল থেকে পুতুল নাচায়। সানাই, ঢোল, কাঁসির ছন্দে চলে নৃত্য ও অভিনয়।

ঝুমুর, খেমটা, ঘাটু, লেটো প্রভৃতি লোকনৃত্যগুলি সাধারণভাবে মেদিনীপুর, রাঢ় অঞ্চল, মানভূম, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। ঝুমুর নৃত্যের পদ্ধতির সঙ্গে সাঁওতালী নাচের মিল আছে। প্রেমবিষয়ক গানের সাথে স্বতস্ফূর্ত ভাবে মাদল ও বাঁশির সহযোগে নাচ হয়।

খেমটা নাচের সাথে বাইজী নাচের সাদৃশ্য দেখা যায়। মুগলযুগে নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের যে সব শাখা দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের মাধ্যমেই খেমটা নাচের প্রচলন। নৃত্যের ভঙ্গী চটুল ও আদিরসাত্মক।

ঘাটু নাচে পুরুষেরা শাড়ী, ঘাঘরা ও গহনা পরে নারীবেশে হারমোনিয়ম ও তবলা সহযোগে চটুল নৃত্য করে। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে ঘাটু নৃত্যগীতের বিশেষ প্রচলন ছিল। লেটো নাচও ঘাটুর অনুরূপ তবে এর মাঝে পালাগান ও সংলাপ থাকে।

এছাড়াও সারি, জারি, পাতা, ঢোলি, মেচেনী প্রভৃতি বহু বিচিত্র লোকনৃত্যের ধারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত।

আসাম ও মণিপুরেও লোকনৃত্যের অসংখ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। আসামের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রচলিত লোকনৃত্য বিহু। বিহু উৎসবে সমাজের সব স্তরের লোকেরাই অংশগ্রহণ করে। একুত্রিশে চৈত্র অর্থাৎ বৎসরের শেষ দিনে বিহু উৎসব সূচিত হয় এবং প্রায় একমাস ধরে এই উৎসব চলে। বিহু নৃত্যের দুটি অংশ বিহু ও

হুচারী। বিহু নৃত্য শ্যামল প্রান্তরে বৃক্ষছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়। বিহু ঢোল, গাগনা বাঁশী, সিঙ্গা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও গানের সহযোগে এই অনুষ্ঠান হয়। ছেলেমেয়েরা তাকা (চেরা বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত) দ্বারা সমবেতভাবে তালরক্ষা করে। বিভিন্ন ভঙ্গীতে চক্রাকারে মণ্ডলরচনা করে এই নৃত্যের স্বতস্ফূর্ত সাবলীল ছন্দ মাধুর্য রচনা করে।

হুচারী অংশ গ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের বাড়ীর সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অংশে কেবলমাত্র যুবক সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে। প্রথম অংশে ভক্তিমূলক গানের (হুচারী কীর্তন) মাধ্যমে শুভ নববর্ষের জন্য দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হয়। তারপরে বিহুগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

আসামের রণনৃত্যের মধ্যে ঢুলিয়া ও ভাওয়ারিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। জয়ঢাক, শিঙ্গা ও বাঁশী সহযোগে অসিনৃত্যের মত যুদ্ধের মহড়ার ভঙ্গীতে নৃত্য প্রদর্শিত হয়।

দেওধনি বা নাগকন্যার নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নৃত্যের শিল্পীকে আজীবন কুমারী থাকতে হয়। খোলাচুলে, একটি ঘুঘুপাখীর রক্ত পান করে জয়ঢাক ও বাঁশীর সহযোগে এই নৃত্য প্রচণ্ড উদ্দামতা সৃষ্টি করে। শিল্পী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত এই নৃত্যের বিরতি হয় না।

আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ভাটিয়ালী, ধামাইল, ঝুমুর ভঙ্গীযুক্ত বিভিন্ন লোকনৃত্যের প্রচলন আছে।

বিচিত্র মানবগোষ্ঠী অধ্যুষিত আসাম প্রদেশের মত জাতিবৈচিত্র্য ভারতের অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় না। সে জন্য বিভিন্ন ধর্ম, উপজাতীয় সংস্কার প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বহু বিচিত্র লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। লুসাই, জয়ন্তিয়া, খাসিয়া, মিরি, সারদুকপেন, কাচেরী, আবর প্রভৃতি পার্বত্য ও সমতলবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে লোকনৃত্যের ধারায় সাধারণভাবে রণনৃত্যের প্রভাব বেশী দেখা যায়। সামাজিক

অনুষ্ঠানমূলক গোষ্ঠীনৃত্যও প্রচলিত।

নাগা সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের সাথে নৃত্য অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। বড় বড় ঢাকের বাদ্য, শিঙ্গা ও কর্ণপটহভেদী সঙ্গীতের সাথে উদ্দাম নৃত্যে ও কলহাস্যে উৎসব প্রাঙ্গন মুখর হয়ে ওঠে। নাচের পোশাক খুব আকর্ষণীয়। কোমরে লালকাপড়ের টুকরা, মাথায় ধাতুনির্মিত ভূষণ, তাতে দীর্ঘ পাখীর পালক। কানে বিচিত্র কর্ণভূষণ। হাতে নক্সাকাটা দা বা বর্শা থাকে। এছাড়া কোমরে হাতে মুখে বিভিন্ন উলকিযুক্ত প্রসাধন। গলায় ভাল্লুকের দাঁতের হার, কোমরে কড়ি দেওয়া বন্ধনী থাকে। পায়ের বিচিত্র ছন্দে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে মাটি কাঁপিয়ে এদের অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা শুধুমাত্র উদ্দামতা নয়, মনোমুগ্ধকর শক্তির মাধুর্যে অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে।

ফাইকিৎলাম, মৈগৈনাহ, বাগরোম্বা, হুরাইরঙ্গিলী, অফিলাকুব, তপুকিখিলে, মিরি, খুয়ালাম প্রভৃতি অসংখ্য লোকনৃত্য আসামের সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রচলিত।

বিহার প্রদেশের লোকনৃত্যধারায় আদিবাসী ও মিথিলা অঞ্চলের ভক্তিমূলক লোকনৃত্যের অংশই প্রধান। ধর্মমূলক লোকনৃত্যের মধ্যে রামলীলা, কীর্তনীয়া, কুঞ্জবাসী, নারদী, ভগতা, বিদ্যাপত, পূজারতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য ঝিঝিয়া,যাতা-যাতিন, সমা-চাকুয়া প্রচলিত। এছাড়া বংশীলীলা, কদমলীলা, নাগলীলা, প্রভৃতি ধর্মমূলক নাচেরও প্রচলন দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে চামর নাটুয়া, কমলামাই নাচ, দম্ফাবাম্বূলী, ও মুসলমানদের মধ্যে ঝারণী নাচ প্রচলিত।

দক্ষিণ বিহারের অধিবাসীদের মধ্যে বুবু, দশাই, হোলি উপলক্ষ্যে ঝিকা ও ডাঙ্গা নাচ, পাইকা, লাঝুরি, যাহুর, লুরিম্বরায়, ঝুমুর, শিকার, ছৌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রসিক, নাটুয়া ও নাচনী এই তিন প্রকারের চটুলনৃত্যের প্রচলন আছে। এগুলি বাইজী নৃত্যের অনুকরণযুক্ত আদিরসাত্মক নাচ।

সেরাইকেল্লা খারসোয়ান অঞ্চলের ছৌনৃত্য লোকনৃত্য ধারার অন্তর্ভুক্ত হলেও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে ও উৎকর্ষতায় শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

গুজরাট প্রদেশের লোকনৃত্যকে মোটামুটি ভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—গরবা, গরবী ও রাস। এছাড়াও দধিলীলা নামে যাত্রা ধরণের অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে যাতে নাটক ও নাচের সমন্বয় দেখা যায়।

গরবা নৃত্য শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষ্যে নবরাত্রির সময় প্রকৃতপক্ষে সারা প্রদেশেই গরবা নাচ ও গানের সমারোহ দেখা যায়। গরবা নাচে শিল্পীসংখ্যার কোন বিধিনিষেধ নেই। হাতে তাল, তুড়ি দিয়ে বা মাথায় কলসী নিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে এই নাচ অনুষ্ঠিত হয়।

গরবী নৃত্য শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট। গরবী নৃত্য ও অম্বামাতার উৎসব উপলক্ষ্যে নবরাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। ধুতি ও শার্ট পরা সাধারণ পোশাকেই সঙ্গীত সহযোগে সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে নাচ হয়।

রাসনৃত্য সাধারণ ভাবে পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও কোন কোন সময় এতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই একত্রে যোগদান করে। পুরাণে উল্লিখিত 'হল্লীসক' নৃত্যের সাথে রাস নৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। এই রাস নৃত্য তিন প্রকারের—লাঠি সহযোগে দণ্ডরাস, তালি সহযোগে তালরাস ও ভাব সহযোগে ললিত রাস।

অন্ধ্র প্রদেশের লোকনৃত্যের মধ্যে দপ্পু্রাত্তম, মাথুরী, বথকম্ম, কুম্মি, কোলাট্টম, লাম্বাডি ও সিদ্দি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিমাচল প্রদেশে ডাঙ্গি, দীপক, ঝাঁঝর, পাঙ্গি, সাঙলা প্রভৃতি লোকনৃত্য প্রচলিত।

কেরলের লোকনৃত্যের ধারায় দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। তিয়াট্টম, থেরায়াট্টম, ভেলাকলি, কোলকলি প্রভৃতি

প্রচলিত।

জম্মু ও কাশ্মীরে হাফিজা, বচা নজমা, ধূমল, রৌফ, হিকাত্ পাঠের প্রভৃতি লোকনৃত্য বিশেষ জনপ্রিয়।

মহারাষ্ট্র অঞ্চলে গাওরিচা, কোলিয়াচা, লাজিম, দহিকলা, দশাবতার, গৌলন, তামাসা বিশেষ জনপ্রিয়।

পাঞ্জাব প্রদেশের লোকনৃত্যধারার মধ্যে লুড়ি, ঝুমার, ভাঙড়া ও গিধ্হা বিশেষ জনপ্রিয়। বলিষ্ঠতা ও মাধুর্যের সমন্বয়ে ভাঙড়া ও গিধ্হা ভারতের লোকনৃত্যের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে।

রাজস্থানের লোকনৃত্যের মধ্যে গীদার, রসিয়া, ঝুমার, ডাণ্ডিয়া, কাছি খোড়ি, ভালার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উত্তর প্রদেশে নৌটাঙ্কি, নাচুয়া, কাজরী, ঝুলা প্রভৃতি ও পার্বত্য অঞ্চলে চাউলিয়া, চঞ্চরী, যাদ্দা, ঝেন্তিয়া, ছাপেলী, খাসিয়ারা, শোখী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

যুগযুগান্তের সংস্কৃতির সমন্বয়ে রসবৈচিত্র্যে অনুরঞ্জিত লোকনৃত্যধারা যথাযথ অনুশীলনে ও প্রয়োগে শুধুমাত্র লোকরঞ্জনে নয়, লোকশিক্ষা প্রচারের অন্যতম মাধ্যমরূপে প্রযুক্ত হতে পারে।

রবীন্দ্র নৃত্যধারা

১৫

রবীন্দ্র নৃত্যধারা
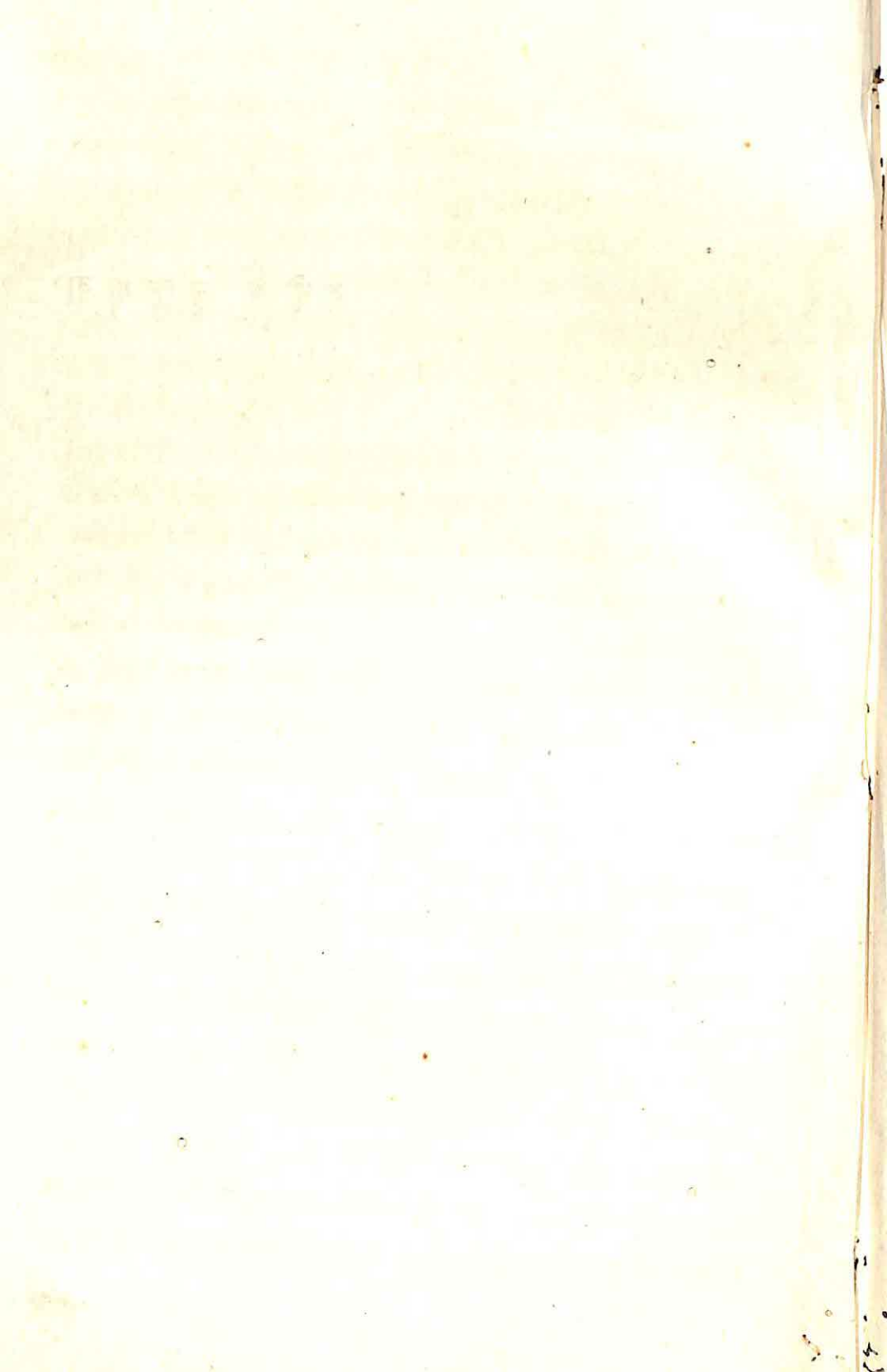
সুদূর অতীতের দিকে চেয়ে আমরা দেখি মানুষ যেদিন স্পান্দত হল ছন্দে, সেদিনই তার জীবনে এল গতিবেগ। সূচিত হল তার জয়যাত্রা। জীবনকে সহজ ও সাবলীল করে ছন্দ। ছন্দোবদ্ধ কর্মশক্তির অপব্যয় হয় না। ছন্দের ধর্ম হল শক্তিকে সংযত, সংহত ও একাগ্র করে তোলা। বিদ্রোহী মানুষ বাহিরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতির সাথে দ্বিমুখী সংগ্রাম করে মনুষ্যত্বকে মহিমান্বিত করার পন্থার সন্ধান পেয়েছে। এই বিশ্বছন্দের চাঞ্চল্য ও আন্দোলনে ভাষা সৃষ্টি হবার অগেই নৃত্য হয়ে উঠেছে মানুষের ভাবের বাহন।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির চলমান অভিযাত্রায় বিভিন্ন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশে নৃত্যধারাও পরিবর্তিত হল বিভিন্ন ভাবাদর্শে। অবশেষে ইংরাজশাসনের বৃত্ত পরিধিতে এসে তার গতিবেগ হল মন্থর সঙ্কীর্ণ। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পরে বাংলাদেশের যে নবজাগৃতি কাল—সেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির আবির্ভাব যুগে যখন বিভিন্ন সামাজিক প্রগতি সূচিত হল; নাট্যশালা ও নাটকের পথ উন্মুক্ত হল, তখনও নৃত্যকলা রইল অবহেলিত। গ্রাম বাংলার লোকসংস্কৃতির মধ্যে

নৃত্য রইল বেঁচে, শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর সমাজ থেকে নৃত্য বর্জিত হল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও প্রচেষ্টার পূর্ব পর্যন্ত নৃত্যকলার শিক্ষিত সমাজে কোন শ্রদ্ধার আসন ছিল না। স্বভাবতই তার ফলে এর মানও নিম্নগামী হয় এবং মনোবিনোদনের প্রকরণ রূপে এর প্রদর্শন পণ্যশুল্কা গণিকাশিল্পীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার অন্যতম বাহনরূপে ললিতকলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেনঃ "আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণমানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।"

সংস্কৃতি সম্পর্কে এই যথার্থ মূল্যবোধই কবিগুরুকে সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা, মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান নৃত্যকলার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংকীর্ণ সীমা শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশকে রুদ্ধ করছে তা তিনি বুঝেছিলেন তাই বললেনঃ "ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি অনুশীলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্যগীতবাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন

আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানাপ্রকারের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই অনেককাল ধরে চিন্তা করেছি।" এ কথা অনস্বীকার্য যে তৎকালীন সমাজে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার অঙ্গরূপে নৃত্যকলার স্বীকৃতি—এই প্রয়াসই আজকের নৃত্যকলার অনুশীলন ও প্রসারের কারণ।

ভারতের নৃত্যধারার আত্মিক ভাবাদর্শের সাথে রবীন্দ্রদর্শনের কোন অসামঞ্জস্য নেই।

> "আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ম্।
> আহার্যং চন্দ্রতারাদি তং নুম সাত্ত্বিকং শিবম্।"

অভিনয় দর্পণে উল্লিখিত নটরাজ মূর্তির এই উদাত্ত কল্পনার সাথে কবিগুরুও একাত্ম।

> "নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
> পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
> তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
> যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
> সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে॥"

তাহলে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্র প্রতিভার মহৎ ব্যক্তিত্ব তার সুদূর প্রসারী চেতনা দিয়ে বিশ্বের সকল কালের সকল মানুষের চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করে শিল্পতত্ত্বের সত্যকে পরিস্ফুট করেছে।

মানুষ নিজের প্রকাশে তার নিজের মধ্যকার অনন্ত বৈচিত্র্যকে নব-নবরূপে আবিষ্কার করতে চায়। এই প্রচেষ্টাই সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য'

চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। আত্মপ্রকাশের এই পিপাসাই আত্মীয়তার প্রেরণা—আত্মোপলব্ধির বাহন। "সঙ্গীত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে! ভোলবার জো কি! সে যে অন্তরবাসী একের বেদনা'! সে বলছে আমাকে বাহিরে প্রকাশ করো, রূপে, রঙে, সুরে, বানীতে নৃত্যে।" আর সেই সত্য, সুন্দর, মঙ্গলের প্রকাশের আবেগেরই আর একটি সার্থক প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্র নৃত্যধারায়। মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান এই নৃত্যকলায় ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই রবীন্দ্রকল্পনা এক অনির্বচনীয় মুক্তির স্বাদ এনে দিয়েছে।

'জাভাযাত্রীর পত্রে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ "মানুষের জীবন বিপদ-সম্পদ-সুখ-দুঃখের আবেগে নানাপ্রকার রূপে ধ্বনিতে স্পর্শে লীলায়িত হয়ে চলছে; তার সমস্তটা যদি কেবল ধ্বনিতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে সে একটা বিচিত্র সংগীত হয়ে ওঠে; তেমনি আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে সেটাকে কেবলমাত্র যদি গতি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় তা হলে সেটা হয় নাচ। ছন্দোময় সুরই হোক আর নৃত্যই হোক, তার একটা গতিবেগ আছে, সেই বেগ আমাদের চৈতন্যে রসচাঞ্চল্য সঞ্চার করে তাকে প্রবলভাবে জাগিয়ে রাখে। কোনো ব্যাপারকে নিবিড় করে উপলব্ধি করাতে হলে আমাদের চৈতন্যকে এইরকম বেগবান করে তুলতে হয়।" আবার নৃত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে তার বক্তব্য ঃ "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ। এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পরের মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানাভঙ্গীতে বিচিত্র করে,—জীবিকার প্রয়োজনে নয়,—সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটাকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।" এখানে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নৃত্যের শিল্পরূপের মুল দৃষ্টিভঙ্গী কত সুন্দরভাবে

'ফুল বলে ধন্য আমি' !

'নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ'।

রবীন্দ্র নৃত্যধারা।

কিরীটম্। কথাকলি।
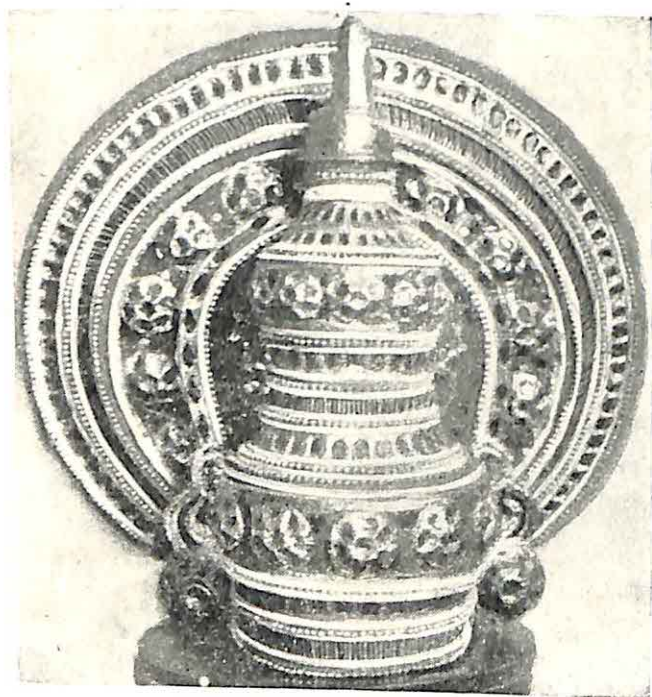
প্রকাশিত হয়েছে।

এই শিল্পরূপে ছন্দের ভূমিকা সম্পর্কে তার বক্তব্য: "রূপসৃষ্টির প্রবাহই ত বিশ্ব। সেই রূপটা জাগে ছন্দে, আধুনিক পরমাণুতত্ত্বে সেকথা সুস্পষ্ট। সাধারণ বিদ্যুৎ প্রবাহ আলো দেয়, তাপ দেয়, তার থেকে রূপ দেখা দেয় না। কিন্তু বিদ্যুৎকণা যখন বিশেষ সংখ্যায় ও গতিতে আমাদের চৈতন্যের দ্বারে ঘা মারে তখনি আমাদের কাছে প্রকাশ পায় রূপ, কোনোটা দেখা দেয় গোলা হয়ে, কোনোটা হয় সীষে। বিশেষ সংখ্যক মাত্রা ও বিশেষ বেগের গতি এই দুই নিয়েই ছন্দ, সেই ছন্দের মায়ামন্ত্র না পেলে রূপ থাকে অব্যক্ত। বিশ্বসৃষ্টির এই ছন্দোরহস্য মানুষের শিল্পসৃষ্টিতে।"

আবার এই চৈতন্যকে বেগবতী করার সাধনায় ছন্দপ্রয়োগের প্রথম প্রয়াসেই যে নৃত্যের উৎস তাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"মানুষ তার প্রথম ছন্দের সৃষ্টিকে জাগিয়েছে আপন দেহে। কেননা তার দেহ ছন্দ রচনার উপযোগী।" আবার "নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহচাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ।" কবিগুরুর এরকম অনেক উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি ভারতীয় নৃত্যের গতি ও প্রকৃতিটিকে উপলব্ধি করেছিলেন। এবং তাকে চলমান শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসেই রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে মুক্তি দিলেন তাত্ত্বিক ও জ্যামিতিক আবেগবৃত্তের পরিধি থেকে। ছড়িয়ে দিলেন সহজরূপে, সরল ছন্দে, পরিমুক্ত প্রাণময়তার জনজীবনে।

রবীন্দ্র নৃত্যধারা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই একটি সত্য উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন যে কবিগুরুর বিভিন্ন সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মূলে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান। এই প্রেরণাই তার সঙ্গীত, চিত্রকলা ও নৃত্যকল্পনায় সুষম সৌন্দর্যে প্রস্ফুট হয়েছে।

"মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়।

তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্‌শা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কি। আমাদের প্রতিদিনটা দাগধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সংগতি কোথায়। যারা লোক-হিতব্রত-পরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন। তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ' তো নাচ শেখেন নি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলই ছট্‌ফট্‌ করে বেড়ান তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিষটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন ভাবে চারদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধূলো লাগছে, পরিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলই অপ্রমাণ হচ্ছে—একেই বলি বাস্তব। কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙেনা, সে অম্লান, সে অপরূপ। তাই যদি না হবে তবে গোলাপ ফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে, কোন গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মানুষের কলহ কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লীলা। অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দাটার এক কোণা উঠে গেল—'দরিদ্রনারায়ণ'কে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডানপাশে। তাকেই অসত্য বলে উঠে চলে যাব, মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে। তাকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তার

ঐশ্বর্য, বিশ্বে এই দুইএর মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহণ করব যাঁরা 'বার্গথাবিব সম্পৃক্তৌ', যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।" এইরকম তাঁর বহু পত্রের উদ্ধৃতি থেকে তাঁর নৃত্যধারার মূল চিন্তাগুলি এবং কাব্যিক প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। নৃত্যকলার রসনিষ্পত্তি ও আশ্রিতভাবের প্রসঙ্গেও তার উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য।

"মানুষের ছন্দোময় দেহ কেবল প্রাণের আন্দোলনকে নয় তার ভাবের আন্দোলনকেও যেমন সাড়া দেয় এমন আর কোন জীবেই দেখিনে। অন্য জন্তুর দেহেও ভাবের ভাষা আছে কিন্তু মানুষের দেহভঙ্গীর মত সে ভাষা চিন্ময়তা লাভ করেনি, তাই তার তেমন শক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই।

কিন্তু এ যথেষ্ট নয়। মানুষ সৃষ্টিকর্তা; সৃষ্টি করতে গেলে ব্যক্তিগত তথ্যকে দাঁড় করাতে হয় বিশ্বগত সত্যে। সুখ, দুঃখ, রাগ, বিরাগের অভিজ্ঞতাকে আপন ব্যক্তিগত ঐকান্তিকতা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে রূপসৃষ্টির উপাদান করতে চায় মানুষ। 'আমি ভালবাসি' এই কথাটি ব্যক্তিগত ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সংবাদ বহন করবার কাজে। আবার 'আমি ভালবাসি'— এই কথাটিকে 'আমি' থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে—যে সৃষ্টি সর্বজনের সর্বকালের। যেমন সাজাহানের বিরহ শোক দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তাজমহল, সাজাহানের সৃষ্টি অপরূপ ছন্দে অতিক্রম করেছে ব্যক্তিগত সাজাহানকে।

নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ চাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবলমাত্র ছন্দের আনন্দ।......গানেরও আদিম অবস্থায় একঘেয়ে তালের একঘেয়ে সুরের পুনরাবৃত্তি; সে কেবল তালের নেশা জমানো, চেতনাকে ছন্দের দোল দেওয়া। কিন্তু এই ভাবব্যক্তি

যখন আপনাকে ভোলে, অর্থাৎ ভাবের প্রকাশটাই কেবল লক্ষ্য না হয়, তাকে উপলক্ষ্য করে রূপসৃষ্টিই হয় চরম তখন নাচটা হয় সর্বজনের ভোগ্য, সেই নাচটা ক্ষণকালের পরে বিস্মৃত হলেও যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তার রূপে চিরকালের স্বাক্ষর লাগে।"

নৃত্য সম্পর্কে কবিগুরুর এই সব বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে তার সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকাশগুলির মূলে যে কাব্যগত প্রেরণা প্রধান, সেই প্রেরণাই সঙ্গীত ও নৃত্যকল্পনায় কাব্যের সুষম উপলব্ধিকে সুর ও ছন্দের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে। সঙ্গীত ও নৃত্যের যুক্ত দ্বৈত প্রণামে অন্তরঙ্গ হয়েছে কবিকল্পনা। সূর্যাস্তের রঙলাগা পশ্চিম দিগন্তে হংসবলাকা যে আকুলতায় কবিহৃদয়কে আন্দোলিত করেছে, সেই স্পন্দনই সুর ও ছন্দে অবগাহন করে কবিগুরুর সঙ্গীত ও নৃত্যকল্পনায় এনেছে পরিশ্রুত সৌন্দর্য। শিল্প ও সংস্কৃতি জীবনের উপস্থাপনা। তাই এর আনন্দের বৃত্তে রূপ ও রসের অজস্র বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের মধ্যেই যে মুক্তি, সেই মুক্তিই কবিগুরু সঞ্চারিত করেছেন তাঁর নৃত্যধারায়।

অনেক সময় আমরা 'রবীন্দ্র নৃত্য পদ্ধতি' বলে একটা কথা শুনে থাকি। আসলে সেটা কি তার কোন অর্থ আজ পর্য্যন্ত নির্ধারিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ কি বিশেষ কোন মৌলিক নৃত্যপদ্ধতি রচনা করেছেন? এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন, কারণ আজকাল প্রায়ই সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী রাবীন্দ্রিক হয়েছে কি হয়নি এই নিয়ে বিতর্ক উপস্থিত হয়। নৃত্যকলা সম্পর্কে নিশ্চয়ই রবীন্দ্র নাথের নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিন্তু তিনি শাস্ত্রীয় রীতি অনুযায়ী কোন বিশেষ নৃত্যপদ্ধতি রচনা করেন নি। এই আলোচনা কালে অত্যান্ত সতর্কভাবে নৃত্য সম্পর্কে তার চিন্তা ও শান্তিনিকেতনে নৃত্য প্রযোজনার ইতিহাস অনুসরণ করতে হবে। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ-এর রচনা থেকে আমরা জানতে পারি—"এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিকমত বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাব

শান্তিনিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে তৈরী করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না ; তার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সমাজ জীবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে।" এই উদ্ধৃতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় বিশেষ কোন ব্যাকরণসিদ্ধ পদ্ধতি কবিগুরু নির্দিষ্ট করতে চাননি।

১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে কবিগুরুর জীবিতকালে তিনি ভারতের শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার প্রখ্যাত গুরুদের এনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে প্রযোজিত নৃত্যধারায় ভারতীয় ঐতিহ্যের ও বিদেশীয় ভাবধারার সমন্বয় ঘটেছে, শাস্ত্রীয় নৃত্যের জটিলতা মুক্ত হয়েছে সহজ ছন্দে। নৃত্যপ্রয়োগের প্রথম পর্য্যায়ে দক্ষশিল্পী না থাকায় কবিগুরু অনেক সময় নিজেই সহজভাবে সঙ্গীতের ভাবপ্রকাশের উপযোগী নৃত্যশিক্ষা দিতেন। প্রথমেই মূকাভিনয়, গীতাভিনয় ও দেহভঙ্গীতে একটু ছন্দ লাগিয়ে অভিনয় করা হত। গুজরাটী ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে সেখানকার লোকনৃত্যও রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কথাকলি, ভরতনাট্যম্, মণিপুরী ও কত্থক নৃত্যও শান্তিনিকেতনে প্রচলিত হয়েছে। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় ভারতের চারটি শাস্ত্রীয় নৃত্যধারার সমন্বয় ঘটেছিল। বজ্রসেন চরিত্র রূপায়িত হয়েছিল ভরতনাট্যম ও কথাকলি নৃত্যধারায়, উত্তীয় কত্থক নৃত্যধারায়, প্রহরী কথাকলি নৃত্যধারায় ও শ্যামা চরিত্র মণিপুরী ভঙ্গীতে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে বিভিন্ন নৃত্যপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হলেও মূল নাট্যপ্রচেষ্টায় একটি কাব্যধর্মী সুরকেই অনুসরণ করা হয়েছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে মণিপুরী নৃত্যই শান্তিনিকেতনে সব থেকে জনপ্রিয় হয়েছিল। মণিপুরী নৃত্যের সহজ সাবলীল ছন্দ, স্বচ্ছ বিন্যাস ও মনোরম মৃদু ললিত সৌন্দর্যের সঙ্গে কবিকল্পনার একাত্মতাই এর কারণ। কত্থক নৃত্যপদ্ধতি শান্তিনিকেতনে

তার স্থূল আঙ্গিকসর্বস্বতার জন্য বিশেষ সমাদৃত হয় নি।

কবিগুরু নৃত্যপ্রযোজনা কালে সৌন্দর্যরসের উদ্বোধন সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতেন বলে অনেকক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নৃত্যের বাহুল্য ও কলা কৌশল বাদ দিতেন। প্রতিমা দেবী এ প্রসঙ্গে বলেছেন: "বিশুদ্ধ সৌন্দর্যরসের তাৎপর্য এমন সূক্ষ্ম পরিমাপণীর উপর দাঁড়িয়ে আছে যে তার কোনদিকে একটু স্থূলতার ভার চাপলে গতি নিম্নগামী হবে এই আশঙ্কায় অনেকগুলি প্রচলিত নৃত্যরীতিকে আমরা স্বীকার করি নি।" 'চণ্ডালিকা' প্রযোজনা সম্পর্কে প্রতিমাদেবীর আলোচনায় শান্তিনিকেতনে নৃত্য প্রযোজনার সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। "চণ্ডালিকার কথোপকথনের ছন্দের মধ্যে সুরের সেই কারুকার্য মনকে টানে। কীর্তন, বাউল থেকে আরম্ভ করে পূরবী, সাহানা, পরজ, ভৈরবী, বাগেশ্রী পর্যন্ত নানাপ্রকারের সুর কথার অনুসরণে প্রতিপদে পরিবর্তিত হয়েছে। সংগীতে যেমন মিশ্রন ঘটেছে নৃত্যেও হয়েছে ঠিক তাই। চতুর্বিধ তালনৃত্যই বিবিধ ভঙ্গীর মধ্যে মিলিত হয়ে গল্পের ভূমিকাকে ফুটিয়ে তুলেছে। এই যে সংমিশ্রণ এতে ঐক্য নষ্ট না হয়ে নৃত্যকলা ও সংগীত সমভাবেই বৈচিত্র্যলাভ করেছে। এই রকমারি না থাকলে নাটক তৈরী হত না। বিচিত্র সুর সমাবেশের জোরে কথোপকথনের ছন্দ সচল ও জোরালো হয়ে উঠেছে, তালও প্রথাগত নিয়ম থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের আবেগকে অবাধে প্রকাশ করেছে। কোথাও কোথাও আধুনিক সাহিত্যের গদ্য কবিতার মত ভাব আপনাকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। নৃত্যের সেই বন্ধনহীন রূপ নূতন আকৃতি নিয়ে নাটকীয় সংঘাতের মধ্যে এক অকৃত্রিম রস ও শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। অনেকেই জানেন বোধহয়, শান্তিনিকেতনের নৃত্য কোন বিশেষ বিধিবদ্ধ সর্বাঙ্গীন প্রাচীন নৃত্যকলার আঙ্গিককে অনুসরণ করে না। মিশ্রসুরের মত মিশ্র তাল ও ভঙ্গীর যোগে বর্তমান নৃত্যকলা সংগঠিত হয়ে থাকে। এই মিশ্রণ যত সহজভাবে হয়, দেখা গেছে

নাচের বৈচিত্র্য ও প্রকাশ ততই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চণ্ডালিকা ও চিত্রাঙ্গদার মধ্যে এই আঙ্গিকের অনুশীলন আমরা পুনঃপুনঃ দেখতে পাই। যদিচ মণিপুরের নৃত্যের আঙ্গিকের উপর চিত্রাঙ্গদার ভিত তৈরী হয়েছে তবুও দর্শক সমস্ত মণিপুর ঘুরেও চিত্রাঙ্গদা নৃত্যের অনুরূপ জিনিস দেখবেন না। তেমনি দক্ষিণী আঙ্গিকে তৈরী চণ্ডালিকাকেও দক্ষিণী নৃত্যের মধ্যে চেনা যাবে না, সংমিশ্রনের এমনি গুণ। এ যেন রাসায়নিক মিশ্রণ।"

জাভা, বলিদ্বীপ, সিংহল ও জাপানের নৃত্যপদ্ধতিতে সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ও সুষম প্রকাশ কবিগুরুর নৃত্যকল্পনাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল। তিনি "জাপান যাত্রী"তে নৃত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন,ঃ "একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহভঙ্গীর সংগীত। এই সংগীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গি বৈচিত্রের পরস্পরের মাঝখানে কোন ফাঁক নেই কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না ; সমস্ত দেহ পুষ্পিতলতার মত একসঙ্গে দুলতে দুলতে সৌন্দর্যের পুষ্পবৃষ্টি করছে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্ধনারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম, আধখানা নাচ ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়া-ছুঁড়ি আছে। জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্য-লীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গির মধ্যে লালসার ইশারামাত্র দেখা গেল না।" সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কবিগুরু যে সরলতা ও স্বচ্ছতার সমন্বয়ে বস্তুবাহুল্যবিরল রিক্ততার ব্যঞ্জনায় রসসৃষ্টির প্রয়াসী, নৃত্যের ক্ষেত্রেও তিনি সেই একই পথ নির্দেশ করেছেন কারণ তার নৃত্যকল্পনাতে কাব্যগত প্রেরণাই প্রধান।

নৃত্য সম্পর্কে তিনি বলেছেনঃ "মানুষের সহজ চলায় অব্যক্ত থাকে নৃত্য, ছন্দ যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে গদ্যভাষায়।

কোন মানুষের চলাকে বলি সুন্দর কোনোটাকে বলি তার উলটো। তফাতটা কিসে। সে কেবল একটা সমস্যা সমাধান নিয়ে। দেহের ভার সামলিয়ে দেহের চলা একটা সমস্যা। ভারটাই যদি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়, তা হলেই অসাধিত সমস্যা প্রমাণ করে অপটুতা। যে চলায় সমস্যার সমুৎকৃষ্ট মীমাংসা সেই চলাই সুন্দর।" এই হচ্ছে নৃত্য সম্পর্কে কবিগুরুর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী। নৃত্যকলাকে জীবনের ছন্দরূপে মানুষের মনে কত সহজভাবে কবিগুরু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন নীচের উদ্ধৃতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায়।

"রোসো, নাচের কথা যখন উঠলো ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা-ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়।" এই হচ্ছে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। সাধারণ ভাবে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বলে একদল তথাকথিত রবীন্দ্র অনুরাগী যে অনুকরণপ্রিয়তা ও রবীন্দ্র ধারারক্ষার কথা বলেন তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্র শিল্পকলার অনুকূল নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ঃ "সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, ঝোঁক দিয়া হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সঙ্গীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটার মত সঙ্গীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস ; কবিতার ছন্দের মত সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।"

রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য প্রযোজনায় এই সংযম ও কাব্যিক সুবিচারের প্রয়োজন সবথেকে বেশী। রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ "অভিনয় জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশী ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার

ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশী ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মত বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না।"

অনেক প্রখ্যাত নৃত্যগুরুও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিকল্পনায় ভাবরূপের প্রতি বিশেষ অবহেলা দেখান। রবীন্দ্র সাহিত্য ও নৃত্যাদর্শের মর্মকথা না বোঝাই এর কারণ। তারা অনেক সুন্দর নৃত্যাংশ রচনা করেন কিন্তু মনোগ্রাহী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই তা ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের আতিশয্যদুষ্ট। কবিগুরুর কথায় "এরূপ অসংযত আতিশয্য অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করে ফেলে; তাতে কেবল বাইরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে ঢোকবার এমন বাধা তো আমি আর দেখিনে।"

রবীন্দ্র নৃত্যকল্পনায় সৌন্দর্য ও আনন্দের সূক্ষ্ম সংবেদন রচনা একটি মহৎ গুণ—এই সৌন্দর্য রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর সতর্কবাণী মনে রাখা দরকার। "এক রকমের গায়ে পড়া সৌন্দর্য আছে যা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সঙ্গে যোগ দিয়ে অতিলালিত্য গুণে সহজে আমাদের মন ভোলায়। চোর যেমন দ্বারীকে ঘুষ দিয়ে চুরি করতে ঘরে ঢোকে। সেইজন্যে যে আর্ট আভিজাত্যের গৌরব করে সে আর্ট এই সৌন্দর্যকে আমল দিতেই চায় না।" নতুনত্বের প্রলোভনে চমক সৃষ্টি ও কাব্যের মর্মকথাকে উপেক্ষা করে চোখধাঁধানো দৃশ্য, মনমাতানো নৃত্য ভঙ্গিমা ও পরিমিতিহীনতা অনেক সময়ে রসবিকৃতি ঘটায়। এই বিকৃতিও স্থূল দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হতে পারে কারণ 'রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে'।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যে নৃত্য, নাট্য ও কাব্যের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে। সুরের রস, নৃত্যের রস ও কবিতার রসের সমন্বয়ে এক অখণ্ড রসবৈচিত্রের পরিপূর্ণ সংহতি। কাজেই এই ত্রিধারার সম্যক উপলব্ধি না ঘটলে শিল্পীর পক্ষে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যের যথার্থ রূপায়ণ ও পরিকল্পনা অসম্ভব। প্রথমেই উপলব্ধি করতে হবে বিষয়বস্তুর ভাবরূপ—পরিকল্পনার যা প্রধান প্রেরণা। তারপরে নৃত্যের বিভিন্ন অংশের সংযোজনা ও ভারসাম্য। তারপরে পারিপার্শ্বিকের সৌন্দর্য যাকে কবিগুরু বলেছেন চালচিত্র খাড়া করা। এবং সর্বোপরি প্রাণছন্দের ভাবসৌযাম্য অর্থাৎ সকল অভিব্যক্তির মধ্যে সুষমা স্থাপন, সৌন্দর্য ও আনন্দের সূক্ষ্ম সংবেদন রচনা করা যা মানবমনের গভীর অনুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে। ভাবরূপের সার্থকতা যদি নৃত্যরূপে সুষম হয়ে ওঠে তবেই সেই নৃত্যকল্পনা সার্থক, কারণ নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য তার সমগ্র ভাবটিকে দেহচাঞ্চল্যে প্রস্ফুট করা। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুভূতির একটি অশরীরী আত্মা ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে সেই অনুভূতির বাস্তব রূপ যদি গঠন পারিপাট্য, সামগ্রিক অভিনয় সৌষ্ঠবে, নৃত্যগীতের উৎকর্ষ ও মেলবন্ধনে একটি সর্বাঙ্গীন অখণ্ডতা সম্পাদন করে দর্শকমনে অলৌকিক রস সঞ্চার করতে পারে তবেই রবীন্দ্র নৃত্য পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করে। অবশ্য এই সুষমা কিভাবে প্রস্ফুট হবে সেটা শিল্পীর দক্ষতার উপর নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছাপার অক্ষরে নিভু'ল পাওয়া যায়, সঙ্গীতেরও স্বরলিপি আছে কিন্তু নৃত্যের জন্য বিশেষ কোন নির্দেশিকা না থাকায় অপব্যাখ্যা ও স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের বহু নিদর্শন দেখা যায়।

রাবীন্দ্রিক হয়েছে কি হয়নি এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক শ্রীউদয়শঙ্করের 'সামান্য ক্ষতি'র কথা মনে আসে। অনেক রবীন্দ্র অনুরাগী বলেছেন ভাল হয়েছে কিন্তু ঠিক রাবীন্দ্রিক হয়নি। শ্রীউদয়শঙ্কর 'সামান্য ক্ষতি' পরিকল্পনায় কাব্যিক সুবিচার

করেছেন। পণ্ডিত রবিশঙ্কর সঙ্গীতাংশে কাব্যের মর্মকথাকে অনবদ্যরূপে ঝংকৃত করেছেন। তা হলে রাবীন্দ্রিক হয়নি এ প্রশ্ন কেন? কোন পরিচিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর অনুকরণ করা হয়নি বলে? এই অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তাকে কবিগুরু সব সময়েই নিন্দা করেছেন। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। কিছুকাল আগে জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় চিত্রতারকা প্রযোজিত 'চণ্ডালিকা' আমরা দেখেছি। কাব্যের মর্মকথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চোখধাঁধানো দৃশ্য, মনমাতানো নৃত্যভঙ্গিমা ও ব্যক্তিগত নৈপুন্য দেখানোর অশোভন আতিশয্যে এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্র সংস্কৃতিচর্চার নামে রস-বিকৃতির নিদর্শন। প্রকৃতির ভূমিকায় রূপায়ণী চিত্রতারকা দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের একজন দক্ষশিল্পী। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনায় অসংযম ও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উৎকট বিলাস দেখে 'রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে' এই কথাটি বারবার মনে হয়েছে।

এই অসংযম ও পরিমিতিহীনতা সম্পর্কে কবিগুরু বারবার সতর্ক করেছেন: "আমাদের দেশের গাইয়ে বাজিয়েরা কিছুতেই মনে রাখে না যে আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি। কেননা রূপকে সুব্যক্ত করাই তার কাজ। বিহিত সীমার দ্বারা রূপ সত্য হয়, সেই সীমা ছাড়িয়ে অতিকৃতিই বিকৃতি।" রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে ভাবকে রূপ দেওয়ার জন্য যতটুকু চালচিত্র খাড়া করা দরকার ততটুকুই দৃশ্যপট, আলোক সম্পাত, বেশভূষা ও বর্ণসমন্বয় ব্যবহার করা উচিত। এর আতিশয্যও অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। বেশভূষা, প্রসাধনেও কবিদৃষ্টি কাব্যধর্মী। 'জাভা যাত্রীর পত্রে' তিনি বলেছেন,: "নাচের তালে দুটি অল্প বয়সের মেয়ে এসে মেজের উপর পাশাপাশি বসল। বড়ো সুন্দর ছবি। সাজে সজ্জায় চমৎকার সুছন্দ। সোনায় খচিত মুকুট মাথায়, গলায় সোনার হারে অর্ধচন্দ্রাকার হাঁসুলি, মণিবন্ধে সোনার সর্পকুণ্ডলী বালা, বাহুতে একরকম সোনার বাজুবন্ধ—তাকে

এরা বলে কীলকবাহু। কাঁধ ও দুই বাহু অনাবৃত, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত সোনায় সবুজে মেলানো আঁট কাঁচুলি, কোমরবন্ধ থেকে দুই ধারায় বস্ত্রাঞ্চল কোঁচার মত সামনে দুলছে। কোমর থেকে পা পর্যন্ত শাড়ির মতই বস্ত্রবেষ্টনী, সুন্দর বর্তিকশিল্পে বিচিত্র; দেখবা-মাত্রই মনে হয় অজন্তার ছবিটি। এমনতরো বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্নতার সামঞ্জস্য আমি কখনও দেখিনি। আমাদের নর্তকী বাইজিদের আঁট পায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠবতা চিরদিন আমার ভারী কুশ্রী লেগেছে। তাদের প্রচুর গয়না ঘাঘরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারীদেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয়—সাজানো একটা মস্ত বোঝা। ···আমরা দেখলুম, এই দুটি বালিকার তনুদেহকে সম্পূর্ণ অধিকার করে অশরীরী নাচেরই আবির্ভাব। বাক্যকে অধিকার করেছে কাব্য, বচনকে পেয়ে বসেছে বচনাতীত।”

এই উদ্ধৃতি থেকে রবীন্দ্র নৃত্য প্রযোজনায় আঙ্গিক এর দিকেও কাব্যধর্মী দৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়। মনে রাখতে হবে ভাব নিজেকে প্রকাশ করার জন্য রূপকে অবলম্বন করে। ভাব না থাকলে শুধু রূপ প্রাণহীন পুতুল। রবীন্দ্রনাথের কথায়ঃ“ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি অনুসারে তার কপালে মৃত্যু আছে। পাথরের টুকরা দিয়া রুটির কাজ চালান যায় না, বাহ্যিক চাকচিক্য দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না।” রবীন্দ্র নৃত্য পরিকল্পনার প্রযোজনা ও আঙ্গিক এর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কবির কবিতা যেমন তার হৃদয়াবেগের ভাষা,তেমনি সুর ও নৃত্যও শিল্পীর হৃদয়াবেগের বাহন। আর কাব্য, সুর ও নৃত্যের যথার্থ ত্রিবেণীসঙ্গম না ঘটলে রবীন্দ্রনৃত্যকল্পনা অসম্পুর্ণ থাকে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধক বাংলা দেশের কবিদের

সম্পর্কে একটি অভিযোগ করা যেতে পারে। বর্তমানে কাব্যে, নাটকে, সঙ্গীতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে রবীন্দ্রোত্তর কালে বাংলা দেশের কোন কবি নৃত্যনাট্য রচনা করেন নি। স্বভাবতই তার ফলে মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান নৃত্যকলা আধুনিক কাল ও মানসের বাহন হয়ে উঠতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কাব্যনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গঠন শৈলী, রূপ ও রীতির পার্থক্য কবিগুরুর রচনাতেই নির্দেশিত হয়েছে। কারণ কবিগুরু 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' প্রভৃতির রচনা কাব্যনাট্য ও নৃতন্যাট্য দুই ভাবেই করেছেন। আমরা নৃত্যশিল্পীরা সাগ্রহ প্রত্যাশা করব—কাব্য ও নৃত্যকলার সেতুবন্ধে সংস্কৃতির যে মুক্তি কবিগুরু প্রবর্তন করেছেন বাংলা দেশের কবিরা তার উত্তরসাধকের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসবেন।

১৬

ওড়িষী নৃত্য

মার্গনৃত্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তা, আধ্যাত্মিক চেতনা ও গভীর ভাবসম্পদ সমৃদ্ধ ওড়িষী নৃত্যধারা নিঃসন্দেহে নৃত্যলোকে একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। উষিব্যার বিভিন্ন দেবদেউল ও মন্দির গাত্রে (৫০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১২৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত) ভারত-স্থাপত্যের মহিমাময় সৃষ্টিতে উৎকীর্ণ সুরসুন্দরীদের বিচিত্র নৃত্যছন্দ কলিঙ্গসংস্কৃতির গৌরবময় অতীত সমৃদ্ধির স্বাক্ষর বহন করে। প্রায় দুহাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন এই নৃত্যধারার কথা গত পনের বছর আগেও উল্লিখিত হত না। এই বিস্মৃতপ্রায় নৃত্যধারা সম্পর্কে মাত্র কয়েক বছর হল গবেষণা আরম্ভ হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রে আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ওড্রমাগধী এই চারিটি আঞ্চলিক ধারার উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ওড্র, মগধ, বৎস, পুণ্ড্র প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে কলিঙ্গ ও ওড্র বর্তমান উড়িষ্যা প্রদেশের ভৌগলিক সীমার মধ্যে পড়ে। ওড়িষী নৃত্য ধারায় নাট্যশাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার ও মুদ্রার প্রয়োগ দেখা যায়। স্বভাবতই এ থেকে এই নৃত্যের প্রাচীনতা ও শাস্ত্রীয় ধারার উপস্থিতি প্রমাণিত হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত মহেশ্বর মহাপাত্র কৃত 'অভিনয় চন্দ্রিকা'

গ্রন্থে ওড়িষী নৃত্যের উৎপত্তির একটি কাহিনী পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে শিবকে নৃত্যের স্রষ্টা বলে কল্পনা করে হয়েছে। শিব তার পুত্র গণেশকে ঐ নৃত্য শিক্ষা দেন। গণেশের কাছে অপ্সরা রম্ভা এই নৃত্যশিক্ষা করেন এবং ভরতমুনি রম্ভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভরতমুনির পরে গর্গাচার্য, বিকটাচার্য, কুমারাচার্য, রন্তীদেব ও অট্টহাস এই নৃত্যধারার উত্তরসাধকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে আচার্য অট্টহাসই উড়িষ্যার দেবদাসীদের মধ্যে এই নৃত্যের প্রচলন করেন।

উদয়গিরির হাতীগুম্ফা গুহায় উৎকীর্ণ একটি ব্রাহ্মীলিপি থেকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে কলিঙ্গরাজ খারবেল-এর নৃত্যগীতিকুশলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর সপ্তমশতাব্দী পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল কলিঙ্গ সংস্কৃতির নৃত্যধারায় কোন প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সপ্তমশতাব্দীতে ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে একটি লিপিতে কেশরী রাজমাতা কলাবতীর শিবমন্দির নির্মাণ ও দেবদাসী বিনি-য়োগের কথা পাওয়া যায়।

কেশরী রাজগণ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করেন এবং দুইজন কেশরী নৃপতি সঙ্গীত ও নৃত্যে দক্ষতার জন্য 'গন্ধর্বকেশরী, ও 'নৃত্য-কেশরী' উপাধিতে ভূষিত হন। কেশরী রাজবংশের সময়েই উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার হয়। এই সময়েই উড়িষ্যার দেবদাসী অর্থাৎ 'মাহারী'দের সম্প্রদায়েরও বিস্তার হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কলিঙ্গরাজ চোড়গঙ্গদেবের রাজত্বকালে (১০৭৭ খৃষ্টাব্দ-১১৪৭ খৃষ্টাব্দ) জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মিত হয়। উড়িষ্যার ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজজীবনের কেন্দ্র ও নিয়ামক হয়ে ওঠে জগন্নাথদেবের মন্দির। রাজা চোড়গঙ্গদেব সংস্কৃত শাস্ত্র ও ললিত-কলায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনিই জগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসী 'মাহারী'দের দেবপরিচর্যার প্রথার সূচনা করেন এবং এই প্রথা আজ পর্যন্ত অব্যহত আছে।

অবশ্য জগন্নাথদেবের পূজায় নৃত্যসঙ্গীতানুষ্ঠানের উল্লেখ বিভিন্ন পুরাণেও পাওয়া যায়। দশম-একাদশ শতকে রচিত রামদেব সংহিতার উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"শজ্যাকালেতু কর্তব্যং পুষ্পাঞ্জলি গণৈসহ :
জয় বিজয়দ্বারেণ শয়নারাত্রিকংচরেৎ।
গজদন্ত সমাযুক্তংপর্যংক সমিপে পুনঃ
আরত্রিক ত্রিণি কুর্যাৎ গায়নাদি সমাচরেৎ॥
বীণা বাদন যুক্তেন নানা বাদ্যানি সংযুতৈ
গায়ীকানর্তকীরম্যে গীত নৃত্যাদ্দিমঙ্গুলৈ ।।"

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত উড়িষ্যাতেও দেবদাসী প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই বর্তমান। দেবদাসীদের বলা হয় 'মাহারী' ও পুরুষ দেবদাসদের বলা হয় 'গটিপু'। অবশ্য পুরুষ দেবদাসরাও স্ত্রীলোক সেজেই দেবপরিচর্যা ও নৃত্যগীত করে। মাহারীদের 'সুরবেশ্যা' আখ্যা দেওয়া হত। এরা মন্দিরে দেবপরিচর্যায় নিবেদিত হত। পরবর্তীকালে রামচন্দ্রদেবের সময় থেকে মাহারীদের রাজ-দরবারে চিত্তবিনোদনের জন্য নিয়োগ করার প্রথা প্রচলিত হয়।

মাহারী শব্দের অর্থ ঐশী প্রেমপাগলিনী। রাজা চোড়গঙ্গদেব জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিত্যসেবার অঙ্গরূপে মাহারীদের নৃত্যগীতানুষ্ঠানের প্রচলন করেন। রামচন্দ্রদেব মন্দিরের সেবকদের জন্য সাতটি পত্র (সপ্ত-শাহী) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার একটি 'অঙ্গ অলস পতন" মাহারীদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। মাহারীদের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সদাশিব রথশর্মা যে রাজকীয় ফরমান আবিস্কার করেছেন সেটি বিশেষ মূল্যবান।

ঐ ফরমানে আছে : "মাহারী সেবকে কাহারি সংগে অংগ সংগ ন হেবে। অন্য যাত্রারে ন গমিবে। গঙ্গামাতা মঠ্, কুংজ মঠ্, রথ সামন্তঠারু দিক্ষা নেই কলিতিলক নেবে। পালি দিনে ঘরু পাক

শ্রীউদয়শঙ্কর

উদয়শঙ্কর প্রযোজিত 'লেবার অ্যাণ্ড মেশিনারী'-র একটি দৃশ্য।

নয়াদিল্লীতে নৃত্যানুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সঙ্গে লেখিকা ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

না করিবে। পহুড় লুগা ন পিন্ধিবে। তুলসী কণ্ঠি গলারে বান্ধিবে। শাস্ত্র প্রমাণে নৃত্য করিবে। নৃত্যকালে যাত্রী দর্শনিয়াকু ন চাহিবে। পরমেশ্বরংক দাসীতুল্য চলিবে। শূদ্র অংগ ন ছুঁইবে। সেবা খটনি পালি দিন পুরুষকু বচন ন কহিবে। মীননাহক জানি খটাইব্র। নাচুনি, গাউনি, সেবাকালে বিকল ন করিব। স্বরভংগ ন করিব। পহপট, সরিমান, পরমেশ্বর, মালশ্রী, হরচণ্ডী, চন্দনঝুলা, শ্রীমংগল বচনিকা, ঝুটি আঠতালি, গীতগোবিন্দ কাব্য ভাউনি করিবে।"

অর্থাৎ পুরুষের দেহস্পর্শ নিষিদ্ধ, জগন্নাথদেবের অনুষ্ঠান ভিন্ন অন্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। বৈষ্ণব ধর্মানুসারে দীক্ষান্তে রসকলিতিলক অঙ্কিত করতে হবে। সেবার দিনে স্বগৃহে রন্ধন করা চলবে না। মলিন ও অশুচি বস্ত্র পরিধান করা চলবে না। তুলসী কণ্ঠি ধারণ করতে হবে। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসরণ করে নৃত্য করতে হবে। নৃত্যকালে যাত্রী দর্শকদের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা চলবে না। পরমেশ্বরের দাসী বলে নিজেকে মনে করে সেইমত আচরণ করতে হবে। শূদ্র অঙ্গ স্পর্শ করা চলবে না। অনুষ্ঠানের দিনে পুরুষের সাথে কথা বলাও নিষিদ্ধ। মীননাহক (অলস অঙ্গ পতনের মাহারীদের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবায়েত) এসে তাদের মন্দিরে নিয়ে যাবে। নৃত্যকালে নৃত্যশিল্পী ও গীতশিল্পী পরস্পরকে অসুবিধায় ফেলবে না। সুর ও তাল যথাযথ রক্ষা করতে হবে, ভঙ্গ করা চলবে না। পহপট, সরিমান, পরমেশ্বর, মালশ্রী, হুরচণ্ডী, চন্দনঝুলা, শ্রীমঙ্গল বচনিকা, ঝুটি আঠতালি—এই কটি তাল আশ্রয় করে নৃত্য করতে হবে, এবং গীতগোবিন্দের সঙ্গীত অনুসরণ করতে হবে।

রাজকীয় ফরমানের উপরোক্ত কঠিন বিধিনিষেধ থেকেই 'মাহারী' সম্প্রদায়ের নৃত্যপদ্ধতির প্রথমযুগের রক্ষণশীলতার সুন্দর ছবি পাওয়া যায়। অবশ্য পরবর্তীকালে রামচন্দ্রদেবের নির্দেশে রাজদরবারে

চিত্তবিনোদনের জন্য প্রযুক্ত হওয়ার পর থেকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে দেবদাসীদের মত উড়িয্যার মাহারী সম্প্রদায়ও ব্যভিচার ও কলুষতায় পর্যবসিত হয়। অথচ অতীতে উড়িয্যায় 'মাহারী' সম্প্রদায় সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের এমন কি রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরাও এই বৃত্তি গ্রহণ করত।

মাহারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছটি শ্রেণীবিভাগ ছিল। ভিতর গাউনি, বাহার গাউনি, নাচুনি, পটুয়ারী, রাজ অঙ্গিলা ও গাহন মাহারী। কর্মবিভাগ অনুযায়ী এই শ্রেণীবিভাগ নির্দিষ্ট হত। বৈশাখে চন্দন-যাত্রা, জগন্নাথদেবের নৌকায় দেবদাসী নৃত্য, স্নানযাত্রা উপলক্ষে নৃত্যগীতানুষ্ঠান, গহম বেদীপূজা, জন্মাষ্টমী, দুর্গামাধব পূজা, বিমলা-দেবীর পূজা, অভিষেক, বসন্ত পঞ্চমী উৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে নৃত্যগীতি অনুষ্ঠিত হত। এছাড়া নিত্যসেবার অঙ্গরূপে ভোগ ও শিঙার এর সময়ে দেবদাসীদের অনুষ্ঠান প্রচলিত।

গজপতি নারায়ণদেব রচিত 'সঙ্গীত নারায়ণ নৃত্যখণ্ড', রঘুনাথ রথ রচিত 'নৃত্যমনোরমা', মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত 'অভিনয়-চন্দ্রিকা', নারায়ণচন্দ্র মিশ্র রচিত 'দেবদাসী নৃত্য পদ্ধতি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবদাসী মুক্তা মাহারী রচিত 'নীলাদ্রি' গ্রন্থ দেবদাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে সব থেকে মূল্যবান তথ্য প্রদান করে। পরিতাপের বিষয় এই যে এই সব মূল্যবান গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ সংকলন করার ব্যবস্থা এখনও হয়নি। তার ফলে ওড়িষী নৃত্যধারার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করা এখনও সম্ভবপর হয়নি।

মাত্র কয়েক বছর আগেও এই নৃত্যধারার অস্তিত্বের কথা সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে কালীচরণ পট্টনায়ক, ধীরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক, সদাশিব রথশর্মা প্রভৃতি গবেষকদের প্রচেষ্টায় এই নৃত্যসম্পর্কে অনুসন্ধান সূচিত হয়।

ওড়িষী নৃত্যকলায় ভূমিপ্রণাম, বিঘ্নরাজ পূজা, বটুনৃত্য, ইষ্টদেব-বন্দনা, স্বরপল্লবী নৃত্য, সাভিনয় নৃত্য ও তরিঝম এই কয়টি প্রধান

অনুষ্ঠান। প্রথম অনুষ্ঠান ভূমিপ্রণাম হচ্ছে মঙ্গলাচরণ সূচক নৃত্য। এতে শিল্পী স্থায়ী ভঙ্গিতে (সমস্থানক) অনুষ্ঠান আরম্ভ করে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি আশ্রয় করে বন্দনাসূচক অভিনয় করে। এই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাই ওড়িষী নৃত্যের মূল ভঙ্গিমা। পরবর্তী অনুষ্ঠান বিঘ্নরাজপূজা রঙ্গবিঘ্নশান্তির জন্য ভাবাভিনয় সহযোগে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে অনুষ্ঠিত হয়। বটুকভৈরব-এর মহিমা প্রচারের জন্য বটুনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যে শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধ কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়। বিভিন্ন করণ, অঙ্গহার, পাদকর্ম, গতি প্রভৃতির প্রয়োগে এই নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের উৎকর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইষ্টদেবতা বন্দনা সাধারণত গীতগোবিন্দের সুমধুর পদ আশ্রয় করে ভাবাভিনয় সহযোগে প্রদর্শিত হয়। স্বরপল্লবী নৃত্য ওড়িষী নৃত্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এতে প্রথমে রাগ আলাপ করা হয় এবং শিল্পী প্রধানতঃ দৃষ্টিকর্মের সাহায্যে রাগটিকে বিধৃত করে এবং কয়েকটি ললিত ভঙ্গি আশ্রয় করে। আলাপ শেষ হবার পরে তাল সহযোগে শোভা-সম্পাদক নৃত্তাংশ। তারপরে ভাবাভিনয় সমৃদ্ধ অংশ। সমাপ্তিতে দ্রুতলয়ে নৃত্যসংগঠন এই অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য ও রঞ্জনা সৃষ্টি করে। সাভিনয় নৃত্য এই পর্যায়ে সাহিত্য, অভিনয় ও সঙ্গীতের সমন্বয়ের চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। শৃঙ্গার রসাত্মক লাস্যভাবযুক্ত নৃত্যে এর সূচনা, সমাপ্তি ভক্তিরসমার্গে। এই অপূর্ব নৃত্যকল্পনা সুচারু মুদ্রা ও জটিল পাদবিন্যাসের প্রয়োগে, শাস্ত্রীয় করণ ও অঙ্গহারের সমাবেশে রাগসঙ্গীতের শুদ্ধ মৌলিক রূপটিকে আলাপে ও বিস্তারে ছন্দিত করে। বনমালীদাস, উপেন্দ্রভঞ্জ, কবিসূর্য বলদেব, গোপালকৃষ্ণ পট্টনায়ক প্রভৃতি প্রখ্যাত উৎকল কবিদের রচিত সুমধুর গীতি এর সঙ্গীতাংশে পরবর্তীকালে ব্যবহার হয়েছে। পূর্বে "গীত-গোবিন্দ"ই কেবলমাত্র প্রযুক্ত হত।

তরিঝম নৃত্তপ্রধান অনুষ্ঠান। পহপট (চারমাত্রা) ও ঝুলা (ছয় মাত্রা) তালসংযোগে দ্রুতলয়ে এর নৃত্যসংগঠন। এই নৃত্যের

সময় বিভিন্ন বোল (উকুট্টা) আবৃত্তি করা হয়। এই অংশকে আনন্দ নৃত্য বা নাটাঙ্গী বলা হয়।

শৈবধর্মের প্রভাবসমৃদ্ধ তাণ্ডবভাব প্রধান "শব্দ স্বরপট" নৃত্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শিব শব্দ স্বরপট', 'গণেশ শব্দ স্বরপট' প্রভৃতি বিভিন্ন নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়।

ওড়িষী নৃত্যের আবহসঙ্গীতে উদম্বরী, ব্রহ্মবীণা, সারাঙ্গী, চিতিরি, হুঘিকা, মাহুরী, মৃহুকহলা, পারি, বিজয়কহলা, বংশী, গুণিত্রা, তালকাষ্ঠ, তোড়িরি, শিঙ্গা, মৃদঙ্গ, নাগেশ্বর, বীরবাদ্য, চংগু, কিঙ্কিনীদণ্ড, পট্টতালযন্ত্র, ঘন্টিতাল যন্ত্র, পাখোয়াজ, তম্বুরা, কাঁসর ডম্বরু, সুরতাল যন্ত্র প্রভৃতি বহু বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়।

মহেশ্বর মহাপাত্র রচিত 'অভিনয়-চন্দ্রিকা', যদুনাথ সিংহ কৃত 'অভিনয় দর্পন', রঘুনাথ রথ রচিত 'নাট্যমনোরমা', নারায়ণদাস গজপতি রচিত 'সঙ্গীত নারায়ণ', কৃষ্ণদাস রচিত 'গীত প্রকাশ' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থে ওড়িষী নৃত্যধারায় স্থান, মণ্ডল, চারী, করণ, অঙ্গহার, পাদকর্ম, দৃষ্টিকর্ম, গ্রীবাভেদ, মুদ্রা প্রভৃতির শাস্ত্রীয় প্রয়োগের অনুশাসনগুলি বিধিবদ্ধ আছে।

ওড়িষী নৃত্যে নাট্যশাস্ত্রোক্ত চব্বিশটি অসংযুক্ত হস্তের কুড়িটির প্রয়োগ দেখা যায়। সুখতুণ্ড, ভ্রমর, হংসাস্য ও তাম্রচূড় এই চারটি অসংযুক্ত হস্তের প্রয়োগ নেই। অভিনয়-দর্পণোক্ত সকল সংযুক্ত মুদ্রাগুলিই এই নৃত্যে প্রযুক্ত হয়।

ওড়িষী নৃত্যে প্রযুক্ত করণগুলিকে মামি বলে। নিবেদন, প্রণত, উত্তোলিত, বিরাজ, গোপন, অভিমান, কুঙ্গরবক্ত্র, অকুঞ্চন তরঙ্গ, নিকুঞ্চন, মর্দল, আরত্রিকা, লাহুনিয়া, অর্চক, নন্দাবর্ত, শ্রুতিকুল প্রভৃতি বিভিন্ন করণের প্রয়োগ দেখা যায়।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিই ওড়িষী নৃত্যে মূল স্থায়ী ভঙ্গিমা। এই ভঙ্গিমা আশ্রয় করে স্থায়ী, চৌকা, চির, লখি, নটবর, ও বৈঠি—এই ছয় পর্যায়ে দেহভঙ্গির বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস রচনা করা হয়।

চৌকা, মীনদণ্ডি, বর্তুল, ঘেরা ও দ্বিমুখ এই পাঁচটি ভূমি নির্দিষ্ট। গোহিথি, চাপুয়ানি, কড় ঘোষরা, থিয়াপুচি ও পুহনিয়া এই ছয়টি চালি প্রচলিত। স্তম্ভপদ, মহাপদ, ধেনুপদ, কুম্ভপদ, শায়কপদ, বিষমপদ, বীরাসনপদ প্রভৃতি পাদভেদ প্রচলিত।

ওড়িষী নৃত্যে পট্টশাড়ী, কঞ্চুল বা পুঁথি ও পাথর খচিত উজ্জ্বল রঙের ব্লাউজ, নীবিবন্ধ, ঝোবা এই পোশাক অভিনয় চন্দ্রিকা গ্রন্থে নির্দেশিত হয়েছে। কাকর, রাগড়, মাথামণি, কেতকী, কোরক, কাপা, নাগপাশ, বকুলকলিকা, ত্রিগণ্ডী কুণ্ডল, বীরবল্লী, চপসারিকা, সসর্পী, পাদকতিলকা, কিঙ্কিনী, চাপুয়ানী করকঙ্কন, পাহুরা প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কার ওড়িষী নৃত্যে ব্যবহার হয়। অভিনয় চন্দ্রিকা গ্রন্থে পুষ্পচূড়া, অর্ধবক্তক ও কটিবেনী এই তিন প্রকার কেশসজ্জার কথা পাওয়া যায়। এই নৃত্যকলায় সৌন্দর্য রচনার প্রসঙ্গে প্রায় সব নির্দেশই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারতীয় মার্গনৃত্যের মহৎগুণগুলি ওড়িষী নৃত্যধারায় বিদ্যমান। অবশ্য একথা সত্য যে ভরতনাট্যমের কুচিপুড়ি অংশের সাথে ওডিষীনৃত্যের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ওড়িষীনৃত্যের পুনরাবিস্কার নিঃসন্দেহে ভারতসংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ প্রবীনধারাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক, উদয়গিরির মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ কাব্যিক লাবণ্যময় রূপকর্মসমৃদ্ধ এই নৃত্যছন্দকে প্রাণবন্ত করে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করেছেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান। সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে মিনতি দাস, মায়াধর রাউথ, দেবপ্রসাদ দাস, পঙ্কজচরণ দাস, প্রিয়ম্বদা মোহান্তি, জয়ন্তী ঘোষ, সংযুক্তা মিশ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৭

নৃত্যলোকের রাজপুত্র

নৃত্যের মুক্তি ও নবজাগৃতির সূচনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। নৃত্যের আধুনিক ধারা প্রবর্তন করলেন শ্রীউদয়শঙ্কর। ভারতের নৃত্যকলায় আধুনিকতার অগ্রদূতের সম্মান নিঃসন্দেহে তাঁর প্রাপ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ছোট বড় সকল শিল্পীরই মূল্যায়ন হয়; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিভার অবদান সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী সমালোচকদের গবেষণা-ধর্মী সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় শিল্পীমানস ও দর্শকচেতনা সমৃদ্ধ হয়। আমাদের দেশে মাঝারি শিল্পীদের তো দূরের কথা, মহৎ শিল্পীর অবদানও যথাযথ আলোচিত হয় না। গভীর দুঃখের সাথে একথা স্মরণ করতে হয় যে আমাদের দেশে শ্রীউদয়শঙ্কর সম্পর্কে বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা ও মূল্যায়নের কোন প্রয়াস এখনও পর্য্যন্ত সূচিত হয়নি।

স্বদেশে আলোচিত না হলেও শঙ্করপ্রতিভা ও নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিদেশের সমালোচকরা আলোচনার প্রয়াস করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে "The Other Mind" একটি বিখ্যাত গ্রন্থ, লেখিকা শ্রীমতী জোয়েত। তিনি বলেছেন উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখে প্রাচ্যদেশীয় নৃত্যকলা সম্পর্কে তাঁর ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয় এবং তার ফলেই প্রচুর পরিশ্রম ও তথ্যসংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থরচনা করেন। এই উদাহরণ আমাদের দেশের সমালোচকদের শিক্ষণীয়।

উদয়শঙ্কর প্রবর্তিত নৃত্যশৈলী সম্পূর্ণ আধুনিক, অথচ ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক আদর্শ ও সত্যের চিরন্তন রূপপ্রকাশের ধারা থেকেও নৃত্যকল্পনা বিচ্যুত হয়নি। ইউরোপীয় নৃত্যপদ্ধতির রেখাবলী (কোরিওগ্রাফী) ও চিত্রধর্মীতা অনুসৃত হলেও ভারতীয় মানসের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য এই পদ্ধতি ভারতীয় নৃত্যের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

ভারতীয় মার্গনৃত্যের আঙ্গিকসর্বস্ব রক্ষণশীলতা অনেকক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিকর্মের প্রতিবন্ধক। নৃত্যকে এই বন্ধন থেকে মুক্ত করে সৃজনশীল শিল্পরূপে উদয়শঙ্কর প্রয়োগ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য : "আর্টকে যদি জীবন্ত রাখতে হয়, তাহলে তাকে গতিশীল জীবনের সঙ্গে এগিয়ে যেতে দিতে হবে ; তাকে অনড় ব্যাকরণের সূত্রের বন্ধনে বাঁধলেই তার মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠবে। Art must live with life".

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শের সার্থক সমন্বয়ে, তৎকালীন সময়ে উদয়শঙ্কর প্রযোজিত নৃত্যে নবসৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে সূচিত হল আধুনিক যুগ। শুধুমাত্র প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারার অনুকরণ ও অনুরণনের অবসাদের সমাপ্তিতে নবতর বোধের আস্বাদে সজীব হল নৃত্যকলা। নৃত্যকলায় সেই প্রথম সূচিত হল আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ—সর্বাভিমুখী জটিলতার মধ্যে সামগ্রিকতার অনুসন্ধান। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করলো বহু বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি। কথাকলির নাটকীয় বৃত্ত, ভরতনাট্যমের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপ্রসবিনী ইঙ্গিতময়তা, কত্থকনৃত্যের ক্ষিপ্রচটুল ছন্দ, মণিপুরী নৃত্যের গীতিধর্মী ব্যঞ্জনা ও লোকনৃত্যের স্বতস্ফূর্ত উৎপ্লাবন—এই বিভিন্ন রীতির সুষম সঙ্গত সমন্বয় বর্ণাঢ্য হল পাশ্চাত্য রীতির কোরিওগ্রাফীতে। নৃত্যকল্পনার শরীরে বহুচারী বিস্তারে বিভিন্ন আঙ্গিকের সংকেতকে সংমিশ্রিত করা ও ভাবব্যক্তিতে সৃজনশীল শিল্পীর বুদ্ধিদীপ্ত মননের গভীরতায় চারুতা ও রসরঞ্জনা সৃষ্টি করা—এই পদ্ধতি ভারতের

নৃত্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তন করলেন শ্রীউদয়শঙ্কর। এই বিচিত্র প্রয়াসেই ভারতের নৃত্যকলার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা।

উদয়শঙ্করের শিল্পকৃতির প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে হলে তাঁর শিল্পী-মানসের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। প্রথম জীবনে তিনি চিত্রকলার শিক্ষার্থী ছিলেন, সেজন্য তার শিল্পকর্মের একটি বিশিষ্ট সম্পদ হচ্ছে চিত্রধর্মীতা। চিত্রকলার মাধ্যমে শিল্পীমনের বিবক্ষু চেতনা রঙ, রেখা, বিভিন্ন জ্যামিতিক বিন্যাস ও বিচিত্র কারুকার্যে দর্শক মনে যেমন একটি রূপময় সঞ্চারী আধার সৃষ্টি করে; নৃত্যকল্পনার ক্ষেত্রেও উদয়শঙ্কর মঞ্চের ফ্রেমে শিল্পীমনের প্রকাশ-উন্মুখ রূপভাবনাকে চিত্রধর্মী পদ্ধতিতেই দর্শকমনে সহৃদয় করে তুলেছেন। তাঁর প্রযোজিত শিল্পকর্মের মৌলিকতা ও প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই চিত্রধর্মীতা। এই ক্ষেত্রে তিনি অনন্য।

নৃত্যকল্পনার ক্ষেত্রে বিমূর্ত চিত্ররীতির পরীক্ষার উজ্জ্বলতম নিদর্শন তাঁর প্রযোজিত 'আসাম' অনুষ্ঠান। এই চিত্রধর্মীতা কিভাবে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এ প্রসঙ্গে উদয়শঙ্কর বলেছেন: "গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ এক একটি নাচের ছবি তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে; দিবারাত্রি আমাকে কল্পনার রাজ্যে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে তাকে গতিশীল রূপদেবার জন্যে, তার গোড়া থেকে শুরু করে শেষপর্য্যন্ত একটি রসমূর্তি প্রকাশ করবার জন্যে। এইভাবেই আমি আমার বিভিন্ন নাচের জন্ম দিয়েছি।"

একথা স্মরণীয় যে তার স্বীকৃতি সূচিত হয় ইউরোপে। এবং তাঁর শিল্পীজীবনের বিকাশে রোদেনষ্টাইন, শ্রীমতী আনা পাভলোভা ও শ্রীমতী সিমকীর অবদান ও সহযোগিতা অবিস্মরণীয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীভেঙ্কটচলম-এর উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য: "Like Tagore, he was discovered first in Europe, Rothenstein spotted

his genious ; Pavlova fanned it to a bursting flame ; Simkie shared his first triumphs."

প্রয়োগনৈপুণ্য (Showmanship) ও ষ্টাইলের ক্ষেত্রে উদয়শঙ্কর শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ প্রয়োগশিল্পীর সমকক্ষ। তাঁর শিক্ষণ ও পরিচালন পদ্ধতি শিল্পীমানসের পূর্ণ প্রতিভাস সৃষ্টিকারী, নৃত্যকল্পনার উপস্থাপনার পদ্ধতি ও প্রকরণের সঙ্গে শিল্পীর রূপায়িত চরিত্রের সাথে একাত্ম হওয়ার পদ্ধতির সংমিশ্রণ। তাঁর পদ্ধতি শুধুমাত্র রূপাঙ্গ নয়, রূপের পরিমুক্ত প্রাণময় ছন্দ রচনা করে। উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ে শিল্পীরূপে এই পদ্ধতির সাথে পরিচিত হবার আমার সুযোগ ঘটেছিল এবং আমার শিল্পী-জীবনের উৎকর্ষ ও অভিজ্ঞতার এটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে আমি মনে করি। এই পদ্ধতির পূর্ণচিত্র দিতে গিয়ে রাইনহার্টের শিল্পাদর্শের কথাই মনে পড়ে ঃ "The methods of regisseur are all but unexplainable ; his way of employing not only the tangible materials like actors, lights, dialogue, movement and settings, but proportion, stress, pace,contrast, interval, variety etc. But one may visualise him as he brings the work to the stage through years of study, perhaps, and then through weeks and months of rehearsal ; getting it first to come to focus in his own minds eye, then setting out to obtain the right actors and to rig the right stage environment ; in rehearsal showing the pace here, hastening it there, struggling to bring so and so to the peak of the performance and the centre of attention—at the right moment, building up the sound sequence through one stretch, playing a silence against it at the end ; flowing colour over the

performance.” প্রয়োগবৈচিত্র্যের এই অপূর্ব নৈপুণ্য তাঁর প্রযোজিত শিল্পকর্মে এক রসস্নিগ্ধ মায়াজগৎ সৃষ্টি করে।

উদয়শঙ্কর সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে কোন কোন সমালোচক-ও মার্গনৃত্যের শিল্পীরা শাস্ত্রীয় নৃত্যে তাঁর দক্ষতায় সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি সমন্বয়ের শিল্পী, শাস্ত্রীয় নৃত্যের রূপ ও রীতি সম্পর্কে তাঁর পূর্ণজ্ঞানের অভাব ছিল না। তবে তিনিও নিজেকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সুদক্ষ শিল্পী বলে দাবী করেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ “আমি নিজেকে কোনদিনই ক্ল্যাসিকাল নৃত্যশিল্পী বলে জাহির করিনি। আমি চিরদিনই সৃষ্টিধর্মী ; তাই যেমন হরপার্বতী নৃত্যদ্বন্দ্ব ও সৃষ্টি করেছি,তেমনই সৃষ্টি করেছি ‘লেবার এ্যাণ্ড মেসিনারী’, সৃষ্টি করেছি ‘সামান্য ক্ষতি’। *** বহু নামকরা ক্লাসিকাল নৃত্যশিল্পী আমার গতিভঙ্গী তাঁদের বহুনাচেই ব্যবহার করেন, অথচ আমি যে একজন খাঁটি ক্ল্যাসিকাল নৃত্যশিল্পী নই, এ কথাও বলতে ছাড়েন না। কিন্তু ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা আছে, যাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা আছে, নিজস্ব ভঙ্গী সৃষ্টি করবার অধিকারও তাদের আছে।”

শিল্পপ্রযোজনার ক্ষেত্রে এই অনন্যপ্রতিভাকে সরকার উপাধিদানে স্বীকৃতি জানিয়েছেন একথা সত্য ; কিন্তু সৃজনশীল প্রতিভাকে সম্মানিত করার শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি উপাধিদান নয়। তাঁকে সম্মানিত করার জন্য শিল্পীর সৃজনকর্মের উপযোগী পরিবেশ তৈরী করে দেওয়া প্রয়োজন। আজও এই পরিণত বয়সে তাঁর শিল্পকৃতিগুলিকে জন সাধারণের কাছে উপস্থিত করার জন্য সরকারী প্রয়াস নেই ; শিল্পীর বহুদিনের আকাঙ্খিত কলাকেন্দ্র স্থাপন করে দেবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয় না। শতবার্ষিকী বৎসরের শ্রেষ্ঠতম নিবেদন ‘সামান্য ক্ষতি’র ব্যাপক প্রদর্শনের কোন আয়োজন হল না। ভবিষ্যৎকালের শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের জন্য তাঁর প্রযোজিত নৃত্যকল্পনাগুলিকে ফিল্ম করে সংরক্ষণ করার কোন প্রয়াসও নেই। এ বিষয়ে সরকারী প্রয়াস সূচিত হবে এই আশাই পোষণ করি।

উদয়শঙ্করের অনন্য প্রতিভার দীপ্তিকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েও (১৯২৯ সাল থেকে আরম্ভ করে 'সামান্য ক্ষতি' প্রযোজনাকাল পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে) এ কথা গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করতে হয় যে তাঁর কাছে জাতির সব প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। সূচনায় তাঁর শিল্পকৃতিতে যে ঐশ্বর্য ও অমেয় মুক্তির আবেগ নৃত্যকলায় নবদিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা এনেছিল; উদগ্র আত্মকেন্দ্রিকতা, জীবনবোধে আস্থাহীনতা ও নেতিবাদ পরবর্তীকালে সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ পরিণতির পথ অবরুদ্ধ করল। ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ হলে ও যে সব সত্য অধীত হলে শিল্পবোধ জীবনবোধের সাথে অন্তরঙ্গ হত; নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনায় মনের আকাশ প্রসারিত করা সম্ভব হত—আত্মকেন্দ্রিকতার আবর্তে তা তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল। ফলে দুর্নিবার প্রাণ প্রবাহের খরস্রোতে নামলো না নতুন সৃষ্টির উদ্দামতা; শিল্পকর্ম আবদ্ধ হল পুনরাবৃত্তির সঙ্কীর্ণ বৃত্তপরিধিতে। 'গৌতম বুদ্ধ' পরিকল্পনায় শিল্পীমানসের এই বিয়োগান্ত অবক্ষয় শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের ব্যথিত করেছে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে 'সামান্য ক্ষতি' পরিকল্পনায় এই মহৎ প্রতিভার শিখাটিকে আবার উজ্জ্বল হতে দেখে আমরা আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু অপূর্ণতার বেদনা আজও বহন করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতকালের কাছে এত বড় একটা মহৎ প্রতিভা কি শুধুমাত্র একটি নামের স্মৃতিতে পর্য্যবসিত হবে? তাঁর শিল্পচেতনার ও প্রয়োগকর্মের সম্পর্কে একটি গ্রন্থও নেই যা ভবিষ্যতকালের শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতীদের তাঁর পদ্ধতির সাথে পরিচিত করতে পারে। এ বিষয়ে শিল্পীকে সচেতন হতে নিবেদন জানাই।

বৈচিত্র্য ও সমন্বয়ের সাধনায় যে মহৎ শিল্পীর শিল্পকৃতিতে আমরা প্রথম নৃত্যকল্পনায় আধুনিক যুগের মনোগাহনে অবতরণ করতে পেরেছি; শিল্পীমানসের অবক্ষয়ের এই বিয়োগান্ত পরিণতিতে নৃত্যলোকের সেই রাজপুত্র আজ শিল্পলোকের অবসন্ন নিঃসঙ্গ নায়ক।

১৮

সংস্কৃতির ছন্দ

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের একশত বছর পরে আজ যদি নৃত্য-কলার প্রসারের ও বিকাশের হিসাব নিকাশ করা যায় তাহলে প্রথমেই একটি আপাত শুভলক্ষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলকাতা ও মফস্বল শহরের অলিতে গলিতে, পথে ঘাটে সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে নৃত্যশিক্ষার স্কুলের প্রাদুর্ভাবে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। সারা দেশ জুড়ে শহরে, গ্রামে অগণিত আসরে, জলসায়, সিনেমায়, থিয়েটারে ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সম্মেলনের মণ্ডপে নৃত্যকলা নিত্য প্রদর্শিত হচ্ছে। বহু বিচিত্র ও বিকৃত পদ্ধতিতে নৃত্যকলার প্রদর্শনের প্রবণতা ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করেছে। এই সব বাহ্যিক লক্ষণগুলি নৃত্যকলার বিপুল জনপ্রিয়তা ও আবেদনের সমাদর হয়তো প্রমাণ করে কিন্তু একটি গভীর আশঙ্কাও মনে জাগে। নৃত্যকলার এই ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলন কি এই অমূল্য সংস্কৃতি সম্পদের প্রকৃত ও সুসঙ্গত প্রসার ; অথবা কেবলমাত্র মনোবিনোদনের প্রকরণরূপে নৃত্যের সৌন্দর্যপ্রসবিনী রূপের নিছক প্রদর্শন বিলাসের সস্তা জনপ্রিয়তা।

একথা অনস্বীকার্য যে দেশের সাংস্কৃতিক পটভূমিতে সাম্প্রতিক কালে শিল্পরুচির নিম্নগামীতা ও সর্বগ্রাসী ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। নৃত্যকলা ও সংস্কৃতির এই নিম্নগামীতা সম্পর্কে শ্রীমতী

রুক্মিণী দেবী বলেছেন : "The concentration of cultural activities in the main cities tends to corrupt both the art and the artiste, by the imposed demands of fashion and frivolity, and the applause and adulation are all that matters." এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী উল্লেখযোগ্যঃ "সস্তা খেলো জিনিসকে কেউ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না, একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাঁহাদের সঙ্গতি তাহার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না—কিন্তু যখন সেই সকল লোকই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সরস্বতী সস্তাদামের কলের পুতুল হইয়া পড়েন।"

নৃত্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রেও শিল্পীরা অনেক সময়েই ভুলে যান যে, দৃশ্যমানতা ও দর্শন একবস্তু নয় ; দেহচাঞ্চল্যের সৌন্দর্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদনে নৃত্যের সূচনা হলেও সমাপ্তি ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিতে। দীর্ঘকাল ধরে ভারতের নৃত্যকলা ও তার চর্চা গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াসেই আবদ্ধ থেকেছে। শিল্পী ও আচার্যেরা বিভিন্ন আঙ্গিকে দক্ষ হলেও নৃত্যকলার আবয়বিক ও আন্তর রূপের বিশ্লেষণ, ইতিহাসের ধারা বা এর নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি। বরং অত্যন্ত কঠোর রক্ষণশীলতার সাথে নিজ নিজ বংশানুক্রমিক শিল্প ধারাটিকে সংরক্ষন করেছেন, যার ফলে এর প্রসার অবরুদ্ধ হয়েছে। শিক্ষিত সমাজ থেকে এই বিচ্ছিন্নতা ও সামগ্রিক চেতনার অভাবে নৃত্যশিল্পীরা অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের সাথে যোগ সূত্র হারিয়ে ফেলেছেন। নৃত্যচর্চা ছাড়াও সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি এগুলির সাথে পরিচিত না হওয়ার জন্য বিদগ্ধ সমাজের সাথে নৃত্যশিল্পীরা একাত্ম হতে পারেননি। যেজন্য বিংশশতাব্দীর এই দশকেও শিক্ষিত সমাজের একটি বিরাট অংশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলার ঐতিহ্য, রূপপরিকল্পনা ও ভাবরসের ঐশ্বর্যের স্বীকৃতিদানে দোলাচল চিত্তবৃত্তির পরিচয় দেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় নিঃসন্দেহে সংস্কৃতিচর্চার

নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। "আমি ভারতীয় সংস্কৃতির যে রূপটি কল্পনা করি তার কেন্দ্রস্থলে সংগীত এবং রূপকর্মকে সম্মানের বিশিষ্ট আসন দিতে হবে, কেবলমাত্র উপস্থিতিতে সম্মতির ইঙ্গিতমাত্র দিলে চলবে না"—রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে যে প্রয়াসের সূচনা করেছিলেন সেই ধারাটিকে বর্তমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতিতে রূপায়িত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। কারণ এই ঘটনায় শুধু মাত্র শিক্ষার সাথে শিল্পের যোগসূত্রই গ্রথিত হল না, শিল্পবোধ ও ইতিহাসচেতনা সমৃদ্ধ প্রকৃত শিক্ষিত শিল্পীবৃন্দের আবির্ভাবের সম্ভাবনা সূচিত হল।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে উপাচার্য মহাশয়ের ভাষণের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য: "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার জন্য যে নূতন পাঠক্রম প্রবর্তিত হল তা রচিত হয়েছে এই ভাবধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্যে ঐচ্ছিক বিষয়গুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। একটি শ্রেণীতে আছে মানবতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি, অপরটিতে আছে শিল্প সম্পর্কিত বিষয়গুলি, যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য। এখানে যে শিক্ষার্থী স্নাতক পাঠক্রম পড়তে আসবেন, তাঁকে দুই শ্রেণী হতেই বিষয় নির্বাচন করতে হবে এবং একটি ঐচ্ছিক বিষয় নৃত্য, সঙ্গীত ও নাট্য এই তিনটির একটি হতে হবে। অর্থাৎ এই পাঠক্রমের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল, প্রতি শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিবৃত্তির ভাষা ছাড়া একটি হৃদয়বৃত্তির ভাষাও আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের পাঠক্রমের এইটি হল প্রধান বৈশিষ্ট্য।"

এই প্রচেষ্টার সাথে শিল্পী ও সংস্কৃতিব্রতী সমাজের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও সহযোগিতা যুক্ত হওয়া উচিত। কারণ সম্যকরূপে কর্ষণ বা চর্চার দ্বারা বুদ্ধি, রুচি, নীতি, শিল্প, কলাবিদ্যা প্রভৃতির যে উৎকর্ষ অর্জন করা যায় তাই হচ্ছে প্রকৃত সংস্কৃতি। এবং এই কর্ষণ

বা চর্চার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় এই কর্ষণের যে পটভূমি রচিত হল তার ফলে আগামীকালের নৃত্যশিল্পীদের মনোভূমি সমৃদ্ধ হবে মানবমুখীনতা, ইতিহাসচেতনা, যুক্তিনিষ্ঠা ও চিন্তার স্বকীয় মূল্যবোধে। একথা বিশেষ করে নৃত্য শিল্পীদের সম্পর্কেই আমি উল্লেখ করছি। কারণ ব্যক্তিগতভাবে একজন নৃত্যশিল্পীরূপে আমি মনে করি আমাদের চিন্তার এই দৈন্য ও শিক্ষার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে কিছু কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়তো দেখা যাবে ; কিন্তু সামগ্রিক বিচারে শিল্পী ও আচার্য তালিকা অনুধাবন করলে বিংশশতাব্দীর এই দশকেও নৃত্যলোকের শিল্পীমানসের এই দৈন্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধিগত চর্চার এই দৈন্য সম্পর্কে শ্রীমতী রুক্মিণীদেবী বারবার শিল্পসমাজকে সতর্ক করেছেন।

এজন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাবকে আমি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নবপর্যায়ের সূচনারূপে চিহ্নিত করতে চাই। কারণ আমি বিশ্বাস করি—এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি, শুধুমাত্র প্রাচীন আঙ্গিক সর্বস্ব গুরুমুখী শিক্ষাপ্রয়াস, প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও নৃত্য-গুরুদের রক্ষণশীল অনুদার মনোবৃত্তি—নৃত্যকলার বিকাশের এই তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক নিঃসন্দেহে অপসারিত করবে। এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনের নৃত্যশিক্ষাপদ্ধতিকে যথাযথ পদ্ধতিতে পরিচালিত করবে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীকে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন হতে অনুরোধ জানাই।

এক। শিল্পপ্রকৃতির ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক এই দুই ধারারই চর্চার দিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তা না হলে শিল্পের আবয়বিক ও আন্তররূপের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুই। শিল্পকলার অনুশীলনের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই হল শিল্পীর সৃজনীশক্তিকে উদ্বোধিত করা ; সেজন্য এদিকেও বিশেষ জোর

দেওয়া দরকার। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োগরীতির বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ শিক্ষার্থীদের দেওয়া দরকার। তা না হলে ধ্রুপদী রীতির সাথে আধুনিক শিল্পনির্মাণ পদ্ধতির যোজনায় নতুন শিল্পরীতি গড়ে উঠবে না।

তিন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আঞ্চলিক নৃত্যধারা ও বিলুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ও গবেষণা সম্পর্কে উৎসাহিত ও বাধ্যতামূলক চর্চার প্রবর্তন করা দরকার। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির সময়ে অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই প্রয়াস সংস্কৃতির অনেক লুপ্তপ্রায়ধারাকে উদ্ধার করতে পারে।

চার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বছরের বিভিন্ন সময়ে নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতির অনুষ্ঠান সাধারণের জন্য পরিবেশিত হওয়া দরকার। এখানকার প্রযোজিত ও পরিবেশিত নাটক, নৃত্যনাট্য, সঙ্গীত যে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছে, সেই রূপটি সাধারণের গোচরে এলে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের সাথে সর্বসাধারণের যোগসূত্র রচিত হবে।

পাঁচ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিল্পকলা সম্পর্কে প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থগুলির বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন।

শিক্ষা ও বুদ্ধিগত চর্চার দীপ্তিতে, প্রাচীন ঐতিহ্য ও নব্যচিন্তার সমন্বয়ে নৃত্যকলার দার্শনিক সম্পদ আগামীকালের শিল্পকৃতিতে নতুন ঐশ্বর্য ও অমেয় মুক্তির প্রেরণায় সংস্কৃতির নবছন্দ রচনা করবে ও নিঃসন্দেহে ভারত-সংস্কৃতির অখণ্ডতা ও জাতীয় সংহতির শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনরূপে পরিচিত হবে।

। গ্রন্থপঞ্জী ।

Manomohan Ghosh

The Natyasastra ascribed to Bharata Muni

Nandikeshvara's Abhinayadarpanam

Ananda Coomaraswamy

The Mirror of Gesture

The Dance of Shiva

Faubion Bowers

The Dance in India

John Martin

Introduction to the Dance

Beryl De Zoete

The Other Mind

Guru Gopinath

Abhinayankuram

The Classical Dance Poses of India

Mulk Raj Anand

The Dancing Foot

Rukmini Devi

The Message of Beauty to civiliztion

Ragini Devi

Dances of India

E. L. Blackman

Religious Dances

Ram Gopal

Indian Dancing

R. Srinivasan

Indian Classical Dance

Kay Ambrose

Classical Dances and Costumes of India

G. R. S. Ayangar

Indian Dance

H. K. Sing

Manipuri Dances

K. B. Iyer

Kathakali

E. Krisha Iyer
Bharata Natya and other Dances of Tamilnad

Premkumar
The Language of Kathakali

G. Venkatachalam
Dance in India

Mulk Raj Anand (ED)
'Marg' publications on Indian Classical and folk dances

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র রচনাবলী

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সঙ্গীত ও সংস্কৃতি
রাগ ও রূপ

ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
সাংস্কৃতিকী

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাংলার লোকসাহিত্য

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য
এরিষ্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্য-তত্ত্ব
নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা

মনোমোহন ঘোষ
প্রাচীন ভারতে নাট্যকলা

গোপাল হালদার
সংস্কৃতির রূপান্তর

ক্ষিতিমোহন সেন
ভারতের সংস্কৃতি

প্রতিমা দেবী
নৃত্য

শান্তিদেব ঘোষ
রবীন্দ্র সঙ্গীত
গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য

অশোকনাথ শাস্ত্রী
নন্দিকেশ্বর কৃত অভিনয়দর্পণ

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য

মণিবর্ধন
বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র

নলিনীকুমার ভদ্র
বিচিত্র মণিপুর

সুরচান্দ শর্মা
মৈতৈ জগোই (মণিপুরী)

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
বাঘ ও অজন্তা

। শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ মুদ্রণ	শুদ্ধরূপ
২৩	২৭	broze	bronze
২৮	২৩	কঠউপনিষদ	কঠোপনিষদ
৩১	১৫	সদাশিব। -ভরত	সদাশিব-ভরত
৩৮	৭	বর্ধিত	বর্ণিত
৪৬	৫	যুদ্ধ	যুদ্ধ
৪৬	২৭	মূাত	মূর্তি
৭০	২০	সাচা	সাচী
৭২	৪	সূক্ষ	সূক্ষ্ম
৭৩	১০	চেখের	চোখের
৮২	৯	উৎস্যুক্য	ঔৎসুক্য
৯৬	ছবির পাদটীকায়	শুকতুন্ত	শুকতুণ্ড
১০২	১১	সংদশ	সন্দংশ
১১৫	১৪	ধান	প্রধান
১১৯	১৯	রোমশা	রোমশ
১২৪	৩	চলে	হলে
১৩৬	৩	মাত	মতি
১৩৯	৮	অয়োজন	আয়োজন
১৬১	১০	Nayacharyas	Natyacharyas
১৯৮	১৭	অছুবা ভঙ্গীপারেঙ।	অছুবা ভঙ্গীপারেঙ’
২১১	১	প্রত্নতান্ত্রিক	প্রত্নতাত্ত্বিক
২১১	২৩	তোয়য়েৎ	তোযয়েৎ
২৫৪	২০	গোষ্ঠজীবন	গোষ্ঠীজীবন
২৫৯	৯	ত্রয়	এর
২৭৬	২৪	অত্যান্ত	অত্যন্ত

ভারতের নৃত্যকলা বিশ্বসংস্কৃতি ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনতম ধারা নৃত্যকলা, উৎকর্ষে, রূপপরিকল্পনায় ও ভাবরসের ঐশ্বর্যে শিল্পকলা ও দর্শনের স্বভাবসুন্দর ছন্দোবদ্ধ পরম অভিব্যক্তি। নৃত্যলোকে শিল্পীর মুদ্রায় স্বর্গের ফুল ফোটে, দেহভঙ্গির সঙ্গীতে ছন্দিত হয় সিন্ধুতরঙ্গের হিল্লোল; গ্রীবাবিভঙ্গে বিচিত্ররঙ্গে মূর্ত হয় লীলাবিলাস, গর্ব ও আত্মনিবেদন; আঁখি-পল্লবের উন্মোচন ও পাতনে প্রতিবিম্বিত হয় প্রেম, প্রতীক্ষা ও সংশয়; ললিতছন্দে শরীরী হয়ে ওঠে স্থাপত্যের সচলব্যঞ্জনা।

প্রথিতযশা শিল্পী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের গভীর শিল্পজ্ঞান ও শিল্পীজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই অনন্য গ্রন্থ নিঃসন্দেহে বাংলাসাহিত্যে নৃত্যকলার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য সংযোজন।